পরিবর্ধিত সংস্করণ

বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর

তারেক শামসুর রেহমান



বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর গ্রন্থটি মূলত বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে সংঘটিত হওয়া ঘটনাবলির একটি সংকলন। বিংশ শতাব্দীর যে বিষয়গুলো বিশ্ব রাজনীতিতে আলোড়ন তুলেছিল, তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। বিশেষ করে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। চীনের সংস্কার কর্মসূচিও আলোচনা থেকে বাদ যায়নি। গ্রন্থটির দুটো উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হচ্ছে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যা। বিংশ শতাব্দীতে এই দুটো বিষয় বিশ্ব রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভূমিকা, বাণিজ্যজোট হিসেবে এদেশের ভূমিকা সঙ্গত কারণেই তাই আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যা শীর্ষক অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে বিশ্বের উষ্ণতারোধ সংক্রান্ত কিয়োটো চুক্তি থেকে শুরু করে সর্বশেষ প্যারিস সম্মেলনের বিষয়টি পর্যন্ত। বাংলাদেশের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি আলোচনা করা হয়েছে। 'সভ্যতার সংকট' বিশ্ব শতাব্দীর শেষ দিনগুলোতে আলোচনার ঝড় তুলেছিল। এটা বিবেচনায় নিয়েই উনবিংশ অধ্যায়ে 'সভ্যতার সংকট' ও নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে প্রচুর সারণি ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে পাঠকরা ওইসব উপাত্ত ও তথ্য নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করতে পারবেন। গ্রন্থটি মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রদের জন্য একটি রেফারেন্স বই। একই সাথে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা গ্রন্থটি পাঠ করে উপকৃত হবেন। সাধারণ পাঠকরাও বইটি পড়ে বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন।



ড. তারেক শামসুর রেহমান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সদস্য। তিনি বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান। অধ্যাপক রেহমান গত দু'দশক ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতি নিয়ে গবেষণা করছেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি এসব বিষয়ে বেশ ক'টি গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রির অধিকারী ড. রেহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তুলনামূলক রাজনীতি তার আরেকটি গবেষণার বিষয়। এ বিষয় নিয়েও তার বেশ ক'টি গ্রন্থ রয়েছে। অধ্যাপনার পাশাপাশি ড. রেহমান নিয়মিত কলাম লেখেন। প্রায় প্রতিটি জাতীয় দৈনিকে তার কলাম নিয়মিত ছাপা হয়। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে ইরাক যুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনীতি, গণতন্ত্রের শত্রু-মিত্র, নয়া বিশ্বব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশ্ব রাজনীতির চালচিত্র, উপআঞ্চলিক জোট, ট্রানজিট ইস্যু ও গ্যাস রফতানি প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ; রাষ্ট্র ও রাজনীতি, বাংলাদেশ : রাজনীতির ২৫ বছর, গঙ্গার পানি চুক্তি : প্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা, সোভিয়েত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ইত্যাদি। ড. রেহমান তার গবেষণার কাজে পৃথিবীর অনেক দেশ সফর করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের আইভিপি ফেলো।

বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর

বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর

তারেক শামসুর রেহমান

শোভা প্রকাশ ॥ ঢাকা

প্রকাশকাল
পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৬
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ : জুলাই ২০১৬
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রকাশক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
শোভা প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট,
তৃতীয় তলা ঢাকা-১১০০

বর্ণবিন্যাস
এ্যাপেলটক কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
ধ্রুবএষ

মুদ্রণ
জে.এম. প্রিন্টার্স

দাম
৩০০ টাকা

ISBN : 984 70084 0034 7

Bisso Rajnitir aksho Bochor, by: Tareque Shamsur Rehman. Published by: Mohammad Mizanur Rahman, Shova Prokash, 38/4 Banglabazar, Mannan Market, Dhaka-1100, Price : 300.00

উ ৎ স র্গ

সোমা জাহিদকে
প্রিয়বোন আমার

পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রশ্নে কিছু কথা

বিশ্বরাজনীতির ১০০ বছর গ্রন্থটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হলো। পরিবর্ধিত সংস্করণে আমরা তেমন কোনো পরিবর্তন আনিনি। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্য সংযোজন করেছি। যেহেতু গ্রন্থটি বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি নিয়ে আলোচিত হয়েছে, সে কারণে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি ২০০০ সাল পর্যন্ত। কিন্তু যেহেতু এর মধ্যে আরো ১৬ বছর পার হয়েছে, সেটা বিবেচনায় নিয়েই আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বশেষ তথ্য সংযোজন করেছি। জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, ভিয়েতনাম কিংবা কিউবার ক্ষেত্রে নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। ইতিহাসের ঘটনাবলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পরিবর্তন করা যায় না। শুধু এর সাথে তথ্য সংযোজন করা যায়। আমরা এমনটিই করেছি। যাতে করে পাঠক সর্বশেষ ঘটনাবলিও জানতে পারেন। কিউবা নিয়ে সংকটের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কিউবা বিপ্লবের কথা বলা হয়নি। আমরা এই সংস্করণে কিউবার বিপ্লবের প্রেক্ষাপটের কথা বলেছি। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিশ্বপরিবেশগত সমস্যার সমাধানে সর্বশেষ প্যারিস সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তাও উল্লেখ করে দিলাম। এতেকরে পাঠক একটা ভালো ধারণা পাবেন। দশম অধ্যায়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা আছে। এখানে মে মাসে (২০১৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ওবামার ভিয়েতনাম সফর ও ভিয়েতনাম-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে আমাদের মূল্যায়ন আমরা সংযোজন করেছি। এতেকরে পাঠকরা বর্তমান ভিয়েতনামকে দেখতে ও বুঝতে পারবেন। মনে রাখতে হবে, একুশ শতকে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে, যা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ কম। আমরা ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে একুশ শতকের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি নিয়েও আগামিতে আলোচনা করতে পারি।

আমাদের বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলিই আমাদের আলোচনার বিষয়। এটা বিবেচনায় নিয়েই আমরা কিছু কিছু তথ্য সংযোজন করেছি মাত্র।

জুন, ২০১৬

প্রফেসর ড. তারেক শামসুর রেহমান
সাবেক সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও
সাবেক চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূ মি কা

We must plan our civilization or we must perish.
Harold Laski, 1945

বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর মূলত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসনির্ভর একটি গ্রন্থ। বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে যেসব ঘটনা ঘটেছে এবং যা বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছিল, তা আলোচনা করা হয়েছে মোট উনিশটি অধ্যায়ে। এখানে মূল্যায়ন করা হয়েছে তুলনামূলকভাবে কম। কেননা, ইতিহাসনির্ভর ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করা যায়, মূল্যায়ন করার সুযোগ থাকে না। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস নিয়ে অন্যত্র আলোচনা হয়েছে সত্য, তবে পার্থক্য এখানেই যে বর্তমান গ্রন্থটি ২০০৭ সালে লিখিত হয়েছে। একুশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এসে আমি দেখার চেষ্টা করেছি বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলি। প্রায় ক্ষেত্রেই ঘটনাবলি ও আলোচনা ২০০০ সাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখেছি। কেননা, বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি নিয়েই গ্রন্থটি রচিত। দু'একটি ক্ষেত্রে আলোচনার সর্বশেষ তথ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ কারণেই যে এতে করে ওই ঘটনার ধারাবাহিকতা বুঝতে সহজ হবে। যেমন বিশ্বপরিবেশগত সমস্যা অষ্টাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিবেশগত সমস্যা একুশ শতকের অন্যতম আলোচিত একটি বিষয়। গেল নভেম্বরে (২০০৭) বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' আঘাত হানে। এই ঘূর্ণিঝড় বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনেরই ফল। 'সিডর'-এর বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। প্রায় একই সময় ইউএনডিপি'র একটি প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে, জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে। এই বিষয়গুলো গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাতে করে পাঠক বুঝতে পারবেন বিশ্বপরিবেশগত সমস্যা বিংশ শতাব্দীর একটি সমস্যা হলেও, এর ব্যাপকতা ও সচেতনতা একুশ শতকে এসে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণেই সর্বশেষ তথ্যটি দিয়ে আমি পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছি। একই কথা প্রযোজ্য নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও। এই বিষয়টি সপ্তদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে এটা ছিল অন্যতম আলোচিত বিষয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানানো হলেও, দেখা গেছে ওই সময়ে যে ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছিল, তাতে ধনী ও গরিব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ব্যবধান বেড়েছিল। একুশ শতকেও এটা হবে অন্যতম আলোচিত বিষয়। সুতরাং বিকশিত এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান কী হবে, আমরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব, তা সর্বশেষ তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর অপর একটি অন্যতম আলোচিত বিষয় হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন। বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ষোড়শ

অধ্যায়ে। এখানে এই বিষয়টি নিয়ে অন্যান্য গ্রন্থের সাথে পার্থক্য এই যে, প্রচুর উপাত্ত এবং তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, কেন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটল আর কেনই বা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেল।

গ্রন্থটিতে মোট উনিশটি অধ্যায় রয়েছে। এই উনিশটি অধ্যায়েই বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত আঠারোটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অন্যান্য গ্রন্থের মতো ধারাবাহিকভাবে বছর অনুযায়ী ঘটনাগুলো আলোচনা করা হয়নি। তবে মূলবিষয়গুলো নির্ধারণ করে এবং আলাদা আলাদা অধ্যায়ে ভাগ করে অন্যান্য ছোটখাটো ঘটনা মূল অধ্যায়ের সাথে যোগ করা হয়েছে। যেমন বলা যেতে পারে, কোরিয়া ও কিউবা সংকটের কথা। এই দুটো বিষয়কে স্নায়ুযুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায়ে (সপ্তম অধ্যায়ে) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা, আমি মনে করি কিউবা সংকট তো বটেই, কোরিয়া উপদ্বীপের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্নায়ুযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য ন্যাটোর জন্ম ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার গঠন সংক্রান্ত বিষয়টি। বিংশ শতাব্দীতে গ্যাট নিয়ে বারে বারে আলোচনা হয়েছে এবং গ্যাট আলোচনার সফল সমাপ্তির পর ১৯৯৫ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন সবার দৃষ্টি ছিল ওই সংস্থাটির দিকে। কী ভাবে ডব্লিউটিও উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থরক্ষা করবে, এটা বিংশ শতাব্দীর শেষ দিনগুলোতে যত বেশি না আলোচিত হয়েছে, তার চাইতে বেশি আলোচনা হচ্ছে একুশ শতকে এসে। আমি তাই সপ্তদশ অধ্যায়ে গ্যাট আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ ও বাংলাদেশ কীভাবে আগামিতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সে ব্যাপারে আলোচনা করেছি।

নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়েছে, তা একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। এটা বিবেচনায় নিয়ে সপ্তদশ অধ্যায়ে এপেক ও নাফটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই বিবেচনায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) গঠন কাঠামো ও এর ভূমিকা এই অধ্যায়ে আলোচনা হতে পারত। কিন্তু ইইউ সম্পর্কিত আলোচনা আমি পঞ্চম অধ্যায়ে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপীয় রাজনীতি) অন্তর্ভুক্ত করেছি। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের রাজনীতি বুঝতে হলে ইসি বা ইইউ'র রাজনীতি বুঝতে হবে। এ কারণে ন্যাটো গঠন, এর পটভূমি, একই সাথে ইইউ'র গঠন কাঠামো এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মধ্য এশিয়ার রাজনীতি একুশ শতকে বারবার আলোচনায় আসছে। বিশেষ করে মধ্য এশিয়ায় মুসলমান প্রধান ছয়টি দেশ প্রধানত দুটি কারণে বারবার সংবাদের শিরোনাম হচ্ছে। প্রথমটি হচ্ছে, এই অঞ্চলের প্রচুর জ্বালানি সম্পদ ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইসলামী মৌলবাদী রাজনীতির বিকাশ। বিংশ শতাব্দীতে এই বিষয় দুটো তথা মধ্য এশিয়ার রাজনীতি নিয়ে তেমন একটা আলোচনা হয়নি। এই দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার প্রাক্কালে সিআইএস বা *কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটস'*-এর ব্যানারে একত্র হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে সিআইএস-এর ভূমিকা তেমন একটা নেই। যেহেতু মধ্য এশিয়ার ঘটনাবলি বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, সে কারণে গ্রন্থে এই বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোচনা করিনি। তবে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যের সংকট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সংকট

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। চীনে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও চীনের সংস্কার কর্মসূচি আলাদা আলাদা অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, আমি মনে করি চীনের সংস্কার আন্দোলনের একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে কারণে চীন একুশ শতকে বারে বারে আলোচিত হতে থাকবে। একই কথা প্রযোজ্য সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে। রুশ বিপ্লব আর গরবাচেভের সংস্কার এক অধ্যায়ে দেখানো ঠিক হবে না। দুটো ঘটনার মধ্যে সময়সীমার পার্থক্য ৭০ বছরের উপরে। আর চীনের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য ছিল ৩০ বছরের উপর। এটা বিবেচনায় নিয়েই বিংশ শতাব্দীর এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো আলাদা আলাদা অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি রচনা করতে প্রচুর গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি অধ্যায় শেষে সহায়ক গ্রন্থের তালিকা দেবার, যাতে করে পাঠক ওইসব গ্রন্থ থেকে আরো বিস্তারিত জানতে পারেন। প্রথম অধ্যায়ে আমি খুব সংক্ষেপে উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলির একটি বিবরণ দিয়েছি। এর ফলে পাঠকদের বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত ঘটনাবলি বুঝতে সহজ হবে। সর্বশেষ অধ্যায়ে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সভ্যতার সংকট। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সভ্যতার সংকট নিয়ে বড় ধরনের বিতর্কের জন্ম হয়। ওই বিতর্কের রেশ একুশ শতকের প্রথমভাগে এসে এখনও রয়ে গেছে। বিষয়বস্তুর গভীরতা বিবেচনা করে সর্বশেষ অধ্যায়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচিত বিষয়গুলো সবই পুরনো। কিন্তু সেই পুরনো বিষয়ই নতুন করে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠক একুশ শতকে এসে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির আলোকে সেই পুরনো বিষয়গুলোই নতুন আঙ্গিকে জানতে পারবেন। পুরনো ইতিহাস না জানলে নতুন ইতিহাসও জানা যাবে না। গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারে আমাকে মাঝে মধ্যে সহযোগিতা করেছে আমার ছাত্র মুসা ও শরীফ। গত দুবছর ধরেই আমি গ্রন্থটি নিয়ে কাজ করছি। মাঝখানে কিছুদিন আমার নিজের পেশাগত ব্যস্ততার কারণে লেখায় হাত দিতে পারিনি। তবে গ্রন্থটি প্রকাশের সবটুকু কৃতিত্ব শোভা প্রকাশের মিজানুর রহমানের। মিজান দীর্ঘদিন ধরেই আমাকে উৎসাহ যুগিয়ে এসেছেন গ্রন্থটি শেষ করার। গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখার পুরো কৃতিত্ব তাই তাঁকেই দিতে হয়।

ইতোমধ্যে বইটির প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে গেছে। এটা দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণে বেশ কিছু বানান ভুল ছিল। এগুলো আমরা শুদ্ধ করেছি। গ্রন্থটিতে নতুন কিছু সংযোজন করার সুযোগ নেই। কেননা, গ্রন্থটি বিগত বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিয়ে লেখা। এ কারণেই একুশ শতকের শুরুতে বিশ্ব রাজনীতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন আসলেও আমাদের আলোচনায় আমরা তা সংগতকারণেই নিয়ে আসিনি।

সাভার, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

প্রফেসর ড. তারেক শামসুর রেহমান
সাবেক সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও
সাবেক চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সারণি তালিকা

স্‌ চি প ত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্‌কথন : ঊনবিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

History is not, of course a cookbook offering pretested recipes. It teaches by analogy, not by maxims. It can illuminate the consequences of actions in comparable situations, Yet each generation must discover for itself what situations are in fact comparable.

Henry Kissinger

বিংশ শতাব্দীতে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, যা কিনা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত ঘটনাবলিরই প্রতিফলন। বিশেষ করে বিভিন্ন মহাদেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবিস্তার, ইউরোপে ব্যাপক শিল্পায়ন, শ্রমিক আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিস্তার, কট্টর জাতীয়তাবাদী নীতি ইত্যাদি নানা কারণ পরবর্তী শতাব্দীর ঘটনাপ্রবাহের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং বিংশ শতাব্দীতে যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে, তা বুঝতে হলে ঊনবিংশ শতাব্দী সম্পর্কেও আমাদের ধারণা থাকতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের বিস্তার। ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড, স্পেন ও পর্তুগাল ওইসময় তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি, শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ এশিয়া তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ল্যাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকাতে তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিল। যে কারণে ১৮৭০ সাল থেকে ১৯১৪ সালের সময়সীমাকে বলা হয় Age of Imperialism অথবা 'সাম্রাজ্যবাদের যুগ'। ধর্ম প্রচারকরা ওই সময় একটি বড় ভূমিকা পালন করেন। আফ্রিকায় ধর্ম প্রচারকে তারা বিবেচনা করতেন একটি মহান কাজ হিসেবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কিছুদিন পর্যন্ত ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের সাম্রাজ্যবিস্তার অব্যাহত রেখেছে এশিয়া ও আফ্রিকাতে। ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৭৬৩ সালে ইংরেজদের কাছে কর্নাটকের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফ্রান্স ভারত সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আর ১৭৬৩ সালের পর পুরো ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদে জয়যাত্রা শুরু হয়। ১৮৪০-৪২ সালে চীনে 'আফিম যুদ্ধ'-এর মধ্য দিয়ে সেখানে সাম্রাজ্যবাদীর শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আফ্রিকাকে

একসময় বলা হতো Dark Continent বা অন্ধকার মহাদেশ। প্রথম দিকে (১৫৬২) দাস ব্যবসার কারণে আফ্রিকাতে ইউরোপীয় শক্তির আগমন ঘটেছিল। ১৮০০ সাল পর্যন্ত দুটি ঔপনিবেশিক শক্তি (হল্যান্ড ও পর্তুগাল) আফ্রিকাতে তাদের উপনিবেশ গড়েছিল। পরে ফ্রান্স ও ব্রিটেন এই অঞ্চলে আসে। ইতালি এই অঞ্চলে এসেছিল অনেক পরে (ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, সোমালিল্যান্ড)। আর জার্মানির উপনিবেশ ছিল সীমিত (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, টোগো, ক্যামেরুন)। অন্যদিকে বেলজিয়াম কঙ্গো উপত্যকা দখল করে ওই অঞ্চলে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাম্রাজ্যবিস্তারের কারণে খোদ ইউরোপে ধীরে ধীরে উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর রাজনীতির উত্থান-পতনে যথেষ্ট প্রভাব খাটায়।

চীনে বক্সার বিদ্রোহের (১৯০০) সুযোগ নিয়ে চীনের বিনা অনুমতিতে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করে। আর এভাবেই রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হয় (১৯০৪-০৫)। ওই যুদ্ধকে ইউরোপীয় যুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয় না। মূলত, ১৮৭১-১৯১৪ সাল পর্যন্ত সময় ছিল ইউরোপে সামরিক প্রস্তুতির যুগ। ১৮৭০-৭১ সালে অনুষ্ঠিত সেডানের যুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে সংঘটিত ওই সেডানের যুদ্ধ পরবর্তীতে গোটা ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল। সেডানের যুদ্ধ ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে চরম শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং ফ্রান্স ওই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। ফলে, জার্মানির রাজধানী বার্লিন ইউরোপের রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। ওই সময়ে জার্মানির চ্যান্সেলর বিসমার্ক (১৮৭০-১৮৯০) কেবল ফ্রান্সকে পরাজিতই করেননি বরং গোটা ইউরোপের রাজনীতি থেকে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। ইংল্যান্ড ওইসময় নিজেকে ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য নিসঙ্গতার নীতি গ্রহণ করেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিসমার্ক ইউরোপের অপর দুই বৃহৎ শক্তি রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার সাথে মৈত্রীব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৯০ সালে বিসমার্কের পতন ঘটলে তাঁর মৈত্রীব্যবস্থারও ইতি ঘটে এবং ফ্রান্সের বিচ্ছিন্নতারও অবসান ঘটে। ফ্রান্স ওই সময় রাশিয়ার সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

১৮৯৭ সাল থেকে জার্মানির পররাষ্ট্রনীতির যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তাতে দেখা যায় যে, বিশ্বরাজনীতিতে জবরদস্ত শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা এবং জার্মানির আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে ঔপনিবেশিক নীতি গ্রহণে জার্মানি গভীরভাবে আগ্রহী ছিল। এছাড়াও জার্মানি তার নৌশক্তি সম্প্রসারণে যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাতে ইংল্যান্ড যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফলে ইংল্যান্ড দীর্ঘদিনের নিসঙ্গতা নীতি পরিহার করে ফ্রান্সের সাথে "আঁতাত কর্ডিয়েল" (১৯০৪) বা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন সম্পাদিত হয়। এভাবে "আঁতাত কর্ডিয়েল" এবং ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনের মাধ্যমে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও রাশিয়া পরস্পরের যে কাছাকাছি এসেছিল তাই "ট্রিপল আঁতাত" নামে পরিচিত। রাজনীতিতে এই "ট্রিপল আঁতাত"-এর পাশাপাশি ইউরোপে ব্যাপক শিল্পায়ন ও শিল্পায়নের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা এবং সেই সঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবোধ বিংশ শতাব্দীর রাজনীতিকে পুরোপুরিভাবে পাল্টে দেয়।

অধ্যাপক রিচার্ড গফ (Richard Goof), ওয়াল্টার মস (Walter Moss), জেনিস টেরী (Janice Terry) এবং অধ্যাপক জিউ হুয়া উপসুর (Jiu-Hwa-Upshur) তাঁদের গ্রন্থ *The Twentieth Century A Brief Global History*-তে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যা বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকে পরিচালিত করেছিল। ওই পাঁচটি ঘটনা হচ্ছে, রাইট ভাইদের এরোপ্লেন আবিষ্কার, ভারতে দুর্ভিক্ষ (১৮৯৯-১৯০০), প্যারিসে এম্মা গোল্ডম্যানের কর্মকাণ্ড ও তার দর্শন, চীনে বক্সার বিদ্রোহ এবং জার্মান দার্শনিক নিৎসের মৃত্যু (পৃষ্ঠা ৫)। চীনে ১৯০০ সালে 'মুষ্টিযোদ্ধা' (Boxer) ভ্রাতৃসংঘের দ্বারা যে সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল, তা ইতিহাসে 'বক্সার বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। ওই বিদ্রোহ মূলত পরিচালিত হয়েছিল বিদেশি আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে এবং তা ছিল দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনারই প্রতিফলন। ওই বিদ্রোহ 'ব্যর্থ' হলেও তা ক্ষমতাসীনদের বাধ্য করেছিল সংস্কারের পথে যেতে। চীনে ১৯১১ সালে সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে যে গণবিপ্লব (জাতীয়তাবাদী আদর্শ, গণতান্ত্রিক চেতনা ও জনগণের জীবনের মান উন্নয়ন) অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার পেছনে 'বক্সার বিদ্রোহ' ছিল একটি অনুপ্রেরণা। অন্যদিকে, মিস গোল্ডম্যান ছিলেন নৈরাজ্যবাদী। তিনি নিজেকে মনে করতেন সকল নির্যাতিত মানুষের মুখপাত্র হিসেবে। একইসাথে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড নারীবাদী। তাঁর লেখনীতে তিনি বারবার নারী স্বাধীনতার কথা বলেছেন। এম্মা গোল্ডম্যান যুক্তি দেখাতেন 'a woman had the right to support herself; to live for herself; to love whomever she pleases, or as many as she please' (Alice Wexler, Emma Goldman An Intimate Life, New York, 1984, P. 94)। নৈরাজ্যবাদ এবং নারীবাদই পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীতে একটি মতাদর্শ হিসেবে বিকশিত হয়।

অধ্যাপক গফ, মস, টেরী ও উপসুর বলার চেষ্টা করেছেন যে, ভারতে ১৮৯৯-১৯০০ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যা ছিল বিংশ শতাব্দীর রাজনীতির বিকাশে অন্যতম একটি ফ্যাক্টর। আর নিৎসের দর্শন ছিল তাঁর আমলের 'ধর্মীয় অনুশাসনের' বিরুদ্ধে একটি বড় প্রতিবাদ। তিনি পশ্চিমা সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে ধর্মকে যখন ব্যবহার করা হচ্ছিল, যখন আফ্রিকার 'কালো মানুষ' 'শিক্ষিত' করার 'মহান দায়িত্ব' নিয়ে ধর্ম প্রচারকরা আফ্রিকায় তাদের কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন, তখন জার্মান দার্শনিক নিৎসের (Nietzsche) লেখনীতে এর সমালোচনা করা হয়েছিল। নিৎসে তথাকথিত গণতন্ত্রকে ঘৃণা করতেন। গণতন্ত্রে যে সমতার কথা বলা হয়, তা তাঁর পছন্দ ছিল না। তিনি ভবিষ্যতে এক ধরনের অনিশ্চয়তা, বিপ্লব, যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মোটকথা, উনবিংশ শতাব্দীর নানা ঘটনাবলি, নানা দর্শন বিংশ শতাব্দীতে এসে বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলিকে প্রভাবিত করে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. অতুল চন্দ্র রায়, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৯৫

২. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইউরোপ, কলিকাতা, ২০০৪

৩. Richard Goff, Walter Moss, Janice Terry, Jiu-Hwa-Upshur. The Twentieth Century : A Brief Global History. Boston-New York. 1998.

বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১৯০০	চীনে বক্সার বিদ্রোহ।
১৯০১	ফিলিপাইনে বিদ্রোহ।
১৯০৪	রুশ-জাপান যুদ্ধ।
১৯০৫	সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন।
১৯০৭	ত্রিদেশীয় আঁতাত।
১৯০৮	দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বশাসন। অস্ট্রিয়া কর্তৃক বসনিয়া হারজেগোভিনা দখল।
১৯১০	জাপান কর্তৃক কোরিয়া দখল।
১৯১১	চীনে মাঞ্চু রাজবংশের পতন।
১৯১২	ফ্রান্স মরক্কোয় উপনিবেশ স্থাপন করে। বলকান যুদ্ধ।
১৯১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার লাভ।
১৯১৪-১৯১৮	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রুশ বিপ্লব (১৯১৭)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান (১৯১৭)।
১৯১৮-১৯২০	মিত্র শক্তির সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে হস্তক্ষেপ। লীগ অফ নেশন্স-এর জন্ম (১৯১৯)। তুরস্কে আর্তাতুর্কের উত্থান (১৯২০)।
১৯২১-১৯৩২	ভারতে গান্ধীর অহিংস আন্দোলন (১৯২০-৪০)। লেনিনের মৃত্যু (১৯২৪)। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩১)।
১৯৩৩	যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি।
১৯৩৯-১৯৪৫	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ (১৯৪৫)।
১৯৪৬	চার্চিলের ঐতিহাসিক ভাষণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপারে হুঁশিয়ারী. বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।
১৯৪৭	ট্রুম্যান ডকট্রিন ও মার্শাল পরিকল্পনা পেশ, পাক-ভারত দেশ বিভাগ।
১৯৪৭-১৯৮৯	স্নায়ুযুদ্ধ। আওয়ামী লীগ গঠন।
১৯৪৭-১৯৪৯	বার্লিন সংকট ও অবরুদ্ধ বার্লিনে বিমান থেকে খাদ্য নিক্ষেপ
১৯৪৯	চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ন্যাটোর জন্ম।
১৯৫০-১৯৫৩	সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক বোমার অধিকারী। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি জার্মান রাষ্ট্রের জন্ম। কোরীয় যুদ্ধ। বাংলায় ভাষা আন্দোলন।
১৯৫৪	পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন।
১৯৫৬	হাঙ্গেরীর গণঅসন্তোষ ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক গণ অসন্তোষ দমন।
১৯৫৮	দ্বিতীয় বার্লিন সংকট-এর জন্ম।
১৯৫৯	কিউবাতে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ।
১৯৬১	কিউবার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কচ্ছেদ। 'বে অফ পিগস'-এ ব্যর্থ অভিযান বার্লিন দেয়াল তৈরি সম্পন্ন।

১৯৬২	কিউবান মিসাইল সংকট।
১৯৬৩-১৯৭৫	ভিয়েতনাম যুদ্ধ।
১৯৭২	চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ।
১৯৭৯	যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন।
১৯৮১	পোল্যান্ডে *'সলিডারেটি'* আন্দোলনের জন্ম।
১৯৮৫	সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে গরবাচেভের ক্ষমতা গ্রহণ।
১৯৮৯	সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে বহুদলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন। পূর্ব ইউরোপের সর্বত্র সমাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন ও সেখানে সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতন। বার্লিন দেয়ালের পতন। চীনে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে ট্যাংক ব্যবহার।
১৯৯০	সাবেক সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির একক কর্তৃত্ব হ্রাস। গরবাচেভের অত্যধিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল। সৌদি আরবে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী প্রেরণ।
১৯৯১	রাশিয়া ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বরিস ইয়েলৎসিনের বিজয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে গরবাচেভের পদত্যাগ। সোভিয়েত ইউনিয়নের রিপাবলিকগুলোকে নিয়ে *'কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটস'* গঠন। কুয়েত শত্রুমুক্ত করতে ইরাকের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সেনা অভিযান।
১৯৯২	ব্রাজিলের রিও ডি জিনেরিওতে প্রথম বিশ্বধরিত্রী সম্মেলন।
১৯৯৩	রাশিয়াতে কমিউনিস্টদের ব্যর্থ অভ্যুত্থান।
১৯৯৬	বসনিয়ায় ন্যাটোবাহিনীর হস্তক্ষেপ। বরিস ইয়েলৎসিন দ্বিতীয় মেয়াদে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।
১৯৯৭	কিয়োটোতে বিশ্বের উষ্ণতারোধকল্পে জাতিসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত একটি পরিবেশ সম্মেলনে কিয়োটো চুক্তি স্বাক্ষর। নিউইয়র্কে দ্বিতীয় পরিবেশ শীর্ষ সম্মেলন। হংকং চীনের কাছে প্রত্যর্পণ। জায়ারে 'মবুতু' সরকারের পতন।
১৯৯৮	ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক পরপর কয়েকটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ। ওয়াশিংটনে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনীদের মধ্যে 'উই রিভার' চুক্তি স্বাক্ষর। উত্তর আয়ারল্যান্ডে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর।
১৯৯৯	চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন। পূর্ব তিমুরে স্বাধীনতার পক্ষে গণভোট। পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান। পোল্যান্ড, চেক রিপাবলিক ও হাঙ্গেরির ন্যাটোতে যোগদান। রাশিয়ায় ইয়েলৎসিনের পদত্যাগ।
২০০০	নিউইয়র্কে সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত। রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পুতিনের বিজয়। যুগোস্লাভিয়ায় নির্বাচনে মিলোসেভিচের পরাজয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ। আফগানিস্তানে তালেবানদের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলীয় জোট গঠন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

The great questions of the day are not decided by speeches and majority votes, but by blood and iron.

Otto Von Bismark

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই প্রথম বিশ্ব প্রত্যক্ষ করল সর্বাত্মক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পৃথিবীর প্রতিটি জাতি-উপজাতি জড়িয়ে পড়ে এবং এর ব্যাপকতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রথমবারের মতো এই যুদ্ধে ব্যাপক সমরাস্ত্র, বিশেষ করে ট্যাঙ্ক, বড় কামান, ডুবোজাহাজ, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। জার্মানির উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও সমরনীতি এই যুদ্ধকে উস্‌কে দিয়েছিল। অতীতে এ রকমটি কখনো দেখা যায়নি যে একটি জাতি তার উগ্রজাতীয়তাবোধ নিয়ে অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করতে চাইছে। এই যুদ্ধের ভয়াবহতা ছিল সবচেয়ে বেশি। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৭৯০ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত বিশ্বে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যেমন, নেপোলিয়ান যুদ্ধ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইত্যাদি এবং তাতে যত লোক মারা গিয়েছিল, তার চাইতে দ্বিগুণ লোক মারা গিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী এই যুদ্ধের আওতায় এসেছিল। এই যুদ্ধে সামরিক লোকজনের তুলনায় বেসামরিক লোকজনের মৃত্যু ছিল বেশি। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো ইউরোপে ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে যে ব্যাপক শিল্প কারখানাগুলো সেখানে গড়ে উঠেছিল, তা যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। আর এর অবসান ঘটে ১৯১৮ সালে। মনে রাখতে হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এমন একটি সময় যখন ইউরোপে ব্যাপক শিল্পায়ন হয়েছে। আর এই শিল্পায়নের কারণেই সেখানে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সেই সাথে শিল্প মালিকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য বাজারও খুঁজছিল। এমনকি, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনেরও জন্ম হয়েছিল ওই সময়। একইসাথে জন্ম হয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের। এসব ঘটনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফার্ডিন্যান্ড, বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে আততায়ীর হাতে নিহত হবার ঘটনার মধ্য দিয়ে। এর আগে অস্ট্রিয়ার সাথে সার্বিয়ার শত্রুতা চরম আকার ধারণ করেছিল। ধারণা করা হয়েছিল সার্বিয়ার নেতৃবৃন্দ এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে অস্ট্রিয়া কিছু শর্তসহ চরমপত্র দেয়। কিন্তু সার্বিয়া ওইসব শর্ত (অস্ট্রিয়া বিরোধী সকল প্রচারণা বন্ধ, হত্যাকাণ্ডের তদন্তে রাজকর্মচারিদের সুযোগ দেয়া, অস্ট্রিয়াবিরোধী সকল সার্বীয় কর্মচারি ও স্কুল শিক্ষকদের চাকুরিচ্যুতি) না মানলে অস্ট্রিয়া ও জার্মান সেনাবাহিনী সারায়েভোতে অভিযান চালায়। রাশিয়া, ফ্রান্স সার্বিয়ার পাশে এসে দাঁড়ায়। ফলে জার্মানি ফ্রান্স ও রাশিয়া আক্রমণ করে। আর এভাবেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের মধ্য দিয়েই জন্ম হয় কেন্দ্রীয় শক্তিজোট (জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও তুরস্ক) ও মিত্রশক্তি জোটের (রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, সার্বিয়া, বেলজিয়াম)। এখানে বলা ভালো যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই রাশিয়াতে ১৯১৭ সালে বিশ্বের বুকে প্রথমবারের মতো বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং ১৯১৭ সালেই যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 'মনরো ডকট্রিন' (ইউরোপীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা) এর ধারণা পরিত্যাগ করে। যুদ্ধচলাকালীন রাশিয়া জার্মানির সাথে ব্রেস্ট লিটোভস্ক (Treaty of Brest Litovsk) চুক্তি করে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায় ও রুশ অধিকৃত জার্মানির পশ্চিম প্রদেশগুলো প্রত্যর্পণ করল। বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়াতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে এই চুক্তি করা ছাড়া রাশিয়ার কোনো বিকল্প ছিল না। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি জাহাজ জার্মান টর্পেডোর আঘাতে বিনষ্ট হলে যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে হয়। এর ফলে যুদ্ধের গতিবেগ পাল্টে গেল। মিত্রশক্তি জোট একের পর এক সাফল্য পেতে লাগল। তুরস্ক, বুলগেরিয়া ও অস্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটল। খোদ জার্মানিতে ঘটল নৌ-বিদ্রোহ। যুদ্ধে সম্ভাব্য পরাজয় আঁচ করতে পেরে ১৯১৮ সালের ৯ নভেম্বর জার্মানির কাইজার বা রাজা হল্যান্ডে পালিয়ে গেলেন। জার্মানি সাধারণতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হলো এবং শেষ পর্যন্ত জার্মানি ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। আর এভাবেই সমাপ্তি ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নিঃসন্দেহে জার্মানির উচ্চাভিলাষ এই বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল, তবে সেই সাথে এটাও সত্য ওই সময় বহু রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত চলছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগেই ইউরোপ দুই সামরিক শিবিরে বিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল ত্রি-শক্তি রাষ্ট্রজোট (জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালি), অপরদিকে ছিল দ্বি-শক্তি রাষ্ট্রজোট (রাশিয়া ও ফ্রান্স) যা পরিবর্তীকালে ট্রিপল আঁতাত-এ (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ও রাশিয়া) পরিণত হয়। এই ট্রিপল আঁতাত জার্মানির জন্য ছিল বিপজ্জনক। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এই আঁতাতও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রতিফলিত হয়েছিল।

খুব সংক্ষেপে আমরা যদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করি, তাহলে নিম্নলিখিত কারণগুলো উল্লেখ করা যায়

১. **উগ্র-জাতীয়তাবাদ :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হলো ইতালি ও জার্মানিতে উগ্র-জাতীয়তাবাদ রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব শক্তির সঞ্চার করে। উগ্র-জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই জার্মানি ও ব্রিটেনের মধ্যে তীব্র নৌ ও সামরিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এই উগ্র-জাতীয়তাবাদই এশিয়া, আফ্রিকা ও বলকান অঞ্চলে ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে রাজ্যলাভের জন্য তীব্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। এসব পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

২. **পরস্পর বিরোধী শক্তিজোট :** দ্বিতীয় কারণ হলো, ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উগ্র-সমরবাদ ও পরস্পর বিরোধী সামরিক জোট। এর মূলে ছিল বিসমার্কের ফ্রান্স-বিরোধী মনোভাব। বিসমার্ক উপলব্ধি করেছিলেন যে, ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়া যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি ফ্রান্স কখনো বিস্মৃত হতে পারেনি এবং একারণে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হতে জার্মানির নিরাপত্তার জন্যে বিসমার্ক সামরিক শক্তিজোটের সূত্রপাত করেন। ফলে, সমগ্র ইউরোপ দুটি পরস্পর-বিরোধী সামরিক শক্তিতে বিভক্ত হয়। একদিকে ত্রি-শক্তি মৈত্রী (জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালি), অপরদিকে ত্রি-শক্তি আঁতাত (ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যান্ড)। ১৯০৬-১৯১৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটের সময়ে এই দুই শক্তিজোট পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। মরক্কোর ব্যাপারে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছে জার্মানি অপদস্থ হয় এবং জার্মানি ও তার মিত্রবর্গ অস্ট্রিয়া ও ইতালি তাতে বিস্মৃত হয়নি। কিন্তু ১৯০৮ সালে বলকান সংকটে অস্ট্রো-জার্মানগোষ্ঠী জয়লাভ করে এবং রাশিয়া অপদস্থ হয়। এই ঘাত-প্রতিঘাত বৃহত্তর যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

৩. **সামরিক প্রতিযোগিতা :** বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় অন্যতম কারণ সামরিক প্রতিযোগিতা। ১৯১৩ সালে জার্মানির সেনাসংখ্যা দাঁড়ায় ৮,৭০,০০০। এর প্রত্যুত্তরে ফ্রান্সে বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরির মেয়াদ ৩ বছর করা হয়। রাশিয়াও সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করে। ব্রিটেনও তার নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করে।

৪. **অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা** উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্ব-ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পগত ও বাণিজ্যগত সংগ্রাম ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়াস। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ব্রিটেন ও জার্মানির মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত করে। এটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটনের অন্যতম কারণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বা এর-গুরুত্ব এমন ব্যাপক যে তা নিরূপণ করা অসম্ভব প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে একটি পরিবর্তনকারী বিপ্লব বলে অভিহিত করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের মধ্য দিয়ে ইউরোপ তথা বিশ্বরাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক, এমনকি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তন ইউরোপের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমত, যুদ্ধপূর্ব

চারটি বড় শক্তির (অস্ট্রো-হাঙ্গেরী, তুরস্ক, রাশিয়া ও জার্মানি) পতন ঘটে। এর ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লাভিয়া, যুগোশ্লাভাকিয়ার ন্যায় ন্যূনতম ১২টি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় ইউরোপে। দ্বিতীয়ত, জার্মানিতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্ম হয়। *'ভাইমার রিপাবলিকের'* জন্মের মধ্য দিয়ে জার্মানিতে গণতান্ত্রিক কাঠামো বিনির্মাণের একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়। তৃতীয়ত, ভারত, মিসর ও পূর্ব আফ্রিকায় স্বাধীনতা আন্দোলন নতুনরূপে বিকাশ লাভ করে। চতুর্থত, জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করে এবং এক ভাষাভাষী ও এক জাতিগোষ্ঠীর ভিত্তিতে ইউরোপের পুনর্গঠন করা হয়। পঞ্চমত, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বিকাশ লাভ করলেও চূড়ান্ত বিচারে ইউরোপে আবারো উগ্র-জাতীয়তাবাদী রাজনীতি তথা একনায়কতন্ত্রের জন্ম হয়। ষষ্ঠত, ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্যারিস সম্মেলন (১৯১৯ সালের ১৮ জানুয়ারি) ও ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও (১৯১৯ সালের ২৮ জুন) তা চূড়ান্ত বিচারে জার্মানিতে উগ্রজাতীয়তাবাদী রাজনীতির জন্ম দিয়েছিল। প্যারিস সম্মেলনে জার্মানিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি এবং ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানির শক্তি যথেষ্ট খর্ব করা হয়। বলা হয় ভার্সাই চুক্তিতে অপর একটি যুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। সপ্তমত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (১৯১৩-১৯২১, ডেমোক্রেট) যে ১৪ দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন (মার্কিন কংগ্রেসে ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি), তাতে একটি বিশ্বসংস্থা (লীগ অব নেশন্স) গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। অষ্টমত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়, নিম্নভাতা আইন চালু হয়। নবমত, মতবাদ হিসেবে দুটি মতবাদ বিকশিত হয়, জার্মানিতে নাজিবাদ ও রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র। কিন্তু দুটো মতবাদই বিংশ শতাব্দীতে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

সারণি : ১

বিভিন্ন যুদ্ধের খরচ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	৩৮০ বিলিয়ন ডলার
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	৩.১ ট্রিলিয়ন ডলার
কোরিয়া যুদ্ধ	২৬৫ মিলিয়ন ডলার
ভিয়েতনাম যুদ্ধ	৫৭০ বিলিয়ন ডলার

সূত্র: কংগ্রেসনাল রিসার্স সার্ভিস এর তথ্য উল্লেখ করে Conway W. Henderson, International Relation Conflict and Cooperation at the Turn of the 21st Century, New York, 1998, P. 145

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সামরিক দিক দিয়ে জার্মানি ছিল শ্রেষ্ঠ। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে জার্মানি এ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে। প্রথমত, জার্মানির পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স উপনিবেশগুলো থেকে অর্থ ও লোকবল সংগ্রহ করে যুদ্ধকে বিলম্বিত করে। দ্বিতীয়ত, সেনা পরিচালনা করার দিক থেকে জার্মানির অসুবিধা ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে জার্মানিকে সেনা সমাবেশ করতে হয়েছিল– ফলে জার্মান সেনাবাহিনী দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, যা তাদের যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম কারণ। তৃতীয়ত, রাশিয়ার বিপুল সেনাবাহিনীর সামনে জার্মানির ভূ-খণ্ডে জার্মানির পক্ষে এক রণাঙ্গন হতে অপর রণাঙ্গনে সেনা স্থানান্তরিত করা অসম্ভব ছিল। চারদিক হতে মিত্রপক্ষ জার্মানির সীমান্তে চাপ সৃষ্টি করলে জার্মানির বিপর্যয় ঘটে। চতুর্থত, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার নৌ-বাহিনীর তুলনায় জার্মান নৌ-বাহিনী ছিল দুর্বল। যা তাদের যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে স্বীকৃত। পঞ্চমত, সমুদ্রের উপর বৃটিশ নৌ-শক্তির প্রাধান্য জার্মানির অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। এছাড়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব ও অপুষ্টির ফলে জার্মানদের প্রতিরোধব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সর্বোপরি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ।

এসব কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি হেরে যায়। কিন্তু যে উগ্রবাদ জার্মানিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সেই উগ্রবাদিতার কারণেই জার্মানি পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল।

সহায়ক গ্রন্থ

১. E. Eyck, Bismarck and the German Empire.
২. A.S.P. Taylor, Bismarck, the Man and the Statesman.
৩. অতুল চন্দ্র রায়, আধুনিক ইওরোপের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৯৫
৪. জয়ন্ত কুমার রায় ও প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তী, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮৫
৫. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, ঢাকা, ২০০২

তৃতীয় অধ্যায়

রুশ বিপ্লব

Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, luild-master, and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary reconstitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes.

Marx and Engels
(The Communist Manifesto in
Frederick L. Bender, ed. Karl
Marx : The Essential Writings, 1986)

পৃথিবীর ইতিহাসে 'রুশ বিপ্লব' এক যুগান্তকারী ঘটনা। 'রুশ বিপ্লব' বা অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য মানবসমাজের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। রাশিয়ায় প্রকৃতপক্ষে তিনটি বিপ্লব ঘটেছিল। এই তিনটি বিপ্লবের শেষ ধাপে বলশেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৯০৫ সালে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম বিপ্লব ঘোষিত হয়, এরপর ১৯১৭ সালে মার্চ মাসের বিপ্লবে ডুমা বা রুশ পার্লামেন্টের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। জার ও অভিজাততন্ত্রের পতন ঘটে, রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ। এরপর ১৯১৭ সালের অক্টোবরে (বর্তমান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নভেম্বরে) বলশেভিকরা বুর্জোয়াদের বিতাড়িত করে শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। বিশ্বে প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠিত হয় এক সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, যার পুরোটা জুড়েই ছিল শ্রমিকদের কৃতিত্ব।

রুশ বিপ্লব উপনিবেশবাদ, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জাল ভেঙে পৃথিবীর একটি বিরাট অংশে শ্রমিক-কৃষকদের অধিকার ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে, যার নেতা ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। রুশ বিপ্লবের ফলেই জন্ম হয় সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার ও পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের। এই সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রায় ৭৩ বছর। পুরো বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের যে যাত্রা অব্যাহত ছিল তা রুশ বিপ্লবের কারণেই সম্ভবপর হয়েছিল

বিপ্লব সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের বিশ্লেষণ

ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে কার্ল মার্কস তার বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র-এর ধারণা দ্বারা সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। মূলত, তাঁর সেই ভাবনারই বাস্তব ফলাফল ছিল রুশ বিপ্লব। কার্ল মার্কস সমাজের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছিলেন পুঁজিবাদের পতনের পর প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র। মার্কসের মতে ইতিহাসের নিয়ম হচ্ছে, কোনো শাসকশ্রেণীই চিরকাল টিকতে পারে না। মানবসভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর আধিপত্যের ইতিহাস। মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই শোষণের অন্যতম কারণ। প্রথম পর্যায়ে যে শ্রমিকশ্রেণী ছিল বিচ্ছিন্ন, অধিকার বর্জিত ও শোষিত তারাই একপর্যায়ে অধিকার আদায়ের জন্য শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পপতিদের একমাত্র লক্ষ থাকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। তারা বৃহৎ শিল্প কারখানা স্থাপন করে এবং প্রয়োজনে শ্রমিকের পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্রাদি দ্বারা উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু করে। এই প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে ক্ষুদ্রশিল্পপতিরা জনসাধারণের কাতারে মিশে যায় এবং এর ফলে প্রলেতারিয়েত বা শোষকশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, শিল্পপতির সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পায়। শেষপর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রলেতারিয়েতদের চাপে তাদের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই বিপ্লবকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার উপর একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখার জন্য শিল্পপতিরা চরম উৎপীড়নের পথ বেছে নেয়। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে প্রলেতারিয়েতদের আন্দোলন ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে এবং পুঁজিপতিদের পতন ঘটে আর সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কসের মতে, এই পর্যায়ে সমাজে শ্রেণী সম্পর্কের অস্তিত্ব থাকবে না ফলে শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্নও দেখা দেবে না।

রাশিয়ায় ১৯০৫ সালে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, সেটাই রাশিয়ার ইতিহাসে প্রথম বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ছিল না। সপ্তম দশকের শেষে এবং অষ্টম দশকের শুরুতে রাশিয়ায় 'নারোদনিক' বা জনবাদী দল গঠিত হয়েছিল। ওই সময়কার বিপ্লবী আন্দোলনে ওই দলগুলোর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এরা ছিল আমাদের দেশের 'ক্ষুদিরাম', 'সূর্যসেন' প্রমুখ অগ্নিপুরুষদের মতো সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা ভাবতেন ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের মাধ্যমে জার এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের হত্যা করে ফেললে যখন অরাজকতার সৃষ্টি হবে, সেই সুযোগে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়ে বিপ্লব সফল করা যাবে। মার্কস ও এঙ্গেলস এইসব বিপ্লবীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা 'নারোদনিক'দের পদ্ধতিকে ভুল প্রমাণ করেছেন। তাঁদের মতে, শোষক বা অত্যাচারীর পরিবর্তন করলেই অত্যাচার শেষ হয়ে যায় না। অত্যাচার শেষ করতে হলে অত্যাচার বা জুলুম প্রথার অবসান চাই। বর্তমানে যে সমাজব্যবস্থার উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এই জুলুম আর অত্যাচার ভেঙে চুরমার করে গড়ে তুলতে হবে এক নতুন সমাজব্যবস্থা।

শ্রমিকদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য বা কৌশল সম্পর্কে তাদের (শ্রমিকদের) নিজস্ব কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবে শ্রমিকরা এই পাশবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ দুর্বার সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত। এর ফলে শ্রমিকদের নিজস্ব স্বাধীন সংগঠন গড়ে ওঠে। যেমন, দক্ষিণ রুশ শ্রমিক ইউনিয়ন (১৮৭৫), উত্তর রুশ শ্রমিক ইউনিয়ন (১৮৭৮)। এভাবেই শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বিকাশের সাথে সাথে শ্রমিকরা তাদের বিপ্লবী দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। শ্রমিকদের এই মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে দরকার ছিল ধনিকশ্রেণীর প্রভাবমুক্ত নিজস্ব স্বাধীন আদর্শ, নিজস্ব রাজনৈতিক দল এবং কর্মসূচি, সেই সাথে শ্রেণীস্বার্থ এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। সবরকম শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে চাই শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব অস্ত্র। রাশিয়ার শ্রমিকরা একদিন খুঁজে পেল সেই অস্ত্র, যার নাম মার্কসবাদ। এভাবে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিপ্লব সম্পর্কে উৎসাহী হয়েছিল রাশিয়ার নির্যাতিত শ্রমিকশ্রেণী। যার সফল ফলাফল ছিল রুশ বিপ্লব।

রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট

মানবসমাজের ইতিহাসে রয়েছে শ্রেণী সংগ্রামের সুদীর্ঘ সংঘাতময় ইতিহাস। নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে বারবার। নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিদ্রোহ আর বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে নির্যাতিত শ্রেণী। ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর (বর্তমান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৭ নভেম্বর) রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এক নবযুগের সূচনা হয়। হাজার বছরের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে শোষকশ্রেণীর (জার ও ভূস্বামী) বিরুদ্ধে। আদায় করে নেয় নিজেদের অধিকার। পৃথিবীর ইতিহাসে রুশ বিপ্লবই সর্বপ্রথম বিপ্লব যার ফলে মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিরা অধিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্র ক্ষমতায়। শ্রেণী শোষণের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রুশ বিপ্লব মানবসমাজের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল। রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস হাজার বছরের শ্রেণী শোষণের। বিশাল দেশ রাশিয়া ছিল অনেকগুলো অঞ্চল নিয়ে গঠিত বিরাট এক রুশ সাম্রাজ্য। পৃথিবীর গোটা স্থলভাগের ছয় ভাগের একভাগ, ইউরোপের প্রায় অর্ধেক এবং এশিয়ার এক বিশাল অংশ জুড়ে ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ রাশিয়া। ইউরোপের বিপ্লবী আন্দোলনের চেয়ে রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন ছিল সুগঠিত ও তীব্র। রুশ সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শ রাশিয়ার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

ভূমিদাস প্রথা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় ছিল সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র। এই প্রথায় ভাঙন ধরলেও জার ও রাজা ভূমিদাস প্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। সেই সময় ভূমিদাসের উপর জমিদারি শোষণ চরমে পৌঁছেছিল। কৃষকদের উপর ছিল অমানবিক অত্যাচার। ইচ্ছামতো অবাধ্য কৃষকদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসন, বেগার খাটা,

খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে শারীরিক অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এইসব অন্যায় অবিচার আর জুলুমের জন্য কৃষক চাষাবাদে কোনো উৎসাহ পেত না। ফলে উৎপাদন হতো খুব কম। ভূমিদাস প্রথা রুশসমাজের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে তখনকার তরুণ বুদ্ধিজীবীরা এই ভূমিদাস প্রথার অবসান চাইতেন। আবার ফরাসি বিপ্লব ইউরোপ মহাদেশে বিপ্লবের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল। সেই জোয়ারেরই তরঙ্গাঘাতে দেশে দেশে সামন্তসমাজ ভেঙে গিয়ে ধনতন্ত্র বিস্তৃত হতে থাকে। দেরি করে হলেও এই বিপ্লবের ঢেউ রাশিয়াতে এসে লেগেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সেখানে নানারকম গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে এবং কিছু ব্যর্থ ও খণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু ওইসব বিদ্রোহ প্রকাশের ফলে বৃদ্ধি পায় জারের অত্যাচার। বিদ্রোহীদের ফাঁসি ও নির্বাসনসহ অত্যাচার বাড়িয়ে দেয়া হয়। ১৮৫০ সালে কৃষক বিদ্রোহ ব্যাপকতা লাভ করে। এর উপর ১৮৫৩-৫৬ সালের ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ধনতান্ত্রিক ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সাথে রাশিয়ার পরাজয় ভূমিদাস প্রথার অবসানের প্রয়োজনীয়তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। এরপর ১৮৬৩ সালে পোল্যান্ড বিদ্রোহ এবং সেই সাথে বেলারুশ ও লিথুনিয়ায় কৃষকবিদ্রোহ শুরু হয়। অবশেষে ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথার অবসানের পথ খুলে যায় এবং ভূমিদাস প্রথার পতনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করে।

পুঁজিবাদের বিকাশ

পুঁজিবাদ দ্রুতবিকাশ লাভ করার সাথে সাথে যন্ত্রচালিত কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। জন্ম নেয় এক নতুন শ্রেণী– "সর্বহারা মজুর শ্রেণী"। সবরকম শোষণের অবসান ঘটিয়ে, শ্রেণীহীন, শোষণহীন সুখি সমাজ কায়েম করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়ে এলো এই সর্বহারা মজুর শ্রেণী। লক্ষ লক্ষ মজুরের উপর নির্মম শোষণ চালিয়ে তাদের হাড় আর রক্ত মাংসের উপর গড়ে উঠেছিল পুঁজিবাদ। লক্ষ লক্ষ মজুরের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব ও মৃত্যুর বিনিময়ে গড়ে উঠল ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মেরুদণ্ড শিল্পকারখানা, শিল্পাঞ্চল, নগর, বন্দর। নামমাত্র মজুরিতে দৈনিক ১২ কিংবা ১৩ ঘণ্টা খাটিয়ে নেয়া হতো শ্রমিকদের। এই অল্প মজুরিতেই জীবনধারণের জন্য মালিকের দোকান থেকেই চড়ামূল্যে কিনতে হতো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। এভাবেই ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে অসন্তোষ এবং ফলাফল হিসেবে দেখা দেয় বিদ্রোহ।

জার সরকারের রক্ষণশীলতা ও স্বৈরতন্ত্র

রুশ বিপ্লবের কারণ ও প্রেক্ষাপট আলোচনায় জার সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উনবিংশ শতকে ইউরোপে পরিবর্তনের স্রোত বইতে আরম্ভ করে। কিন্তু জার সরকার যুগের গতি অগ্রাহ্য করে স্রোতের বিপরীতে চলতে থাকে। ইউরোপে যখন পুরাতন সমাজকাঠামো ভেঙে উদারতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি ঘটছিল, তখন রাশিয়ায় জার সরকারের স্বৈরতন্ত্র অব্যাহত থাকে। সর্বশেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাসও তাঁর পিতার ন্যায় দমননীতিতে বিশ্বাস করতেন। গুপ্তচর ও পুলিশ দ্বারা তিনি জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দমন করেন। এই ব্যাপক দমননীতির

ফলে রাশিয়ায় বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। জার সরকারের বৈদেশিকনীতির ব্যর্থতা জারতন্ত্রের পতনকে আরো ত্বরান্বিত করে। রুশ জনগণের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার সরকারের যোগদান ছিল গভীর অদূরদর্শিতার ফল। এর ফলে রাশিয়ার অর্থনীতি একেবারেই ভেঙে যায়, রাশিয়ার সাধারণ জনগণ হয়ে ওঠে বিপ্লবী।

ধর্ম ও শিক্ষায় বৈষম্য

রাশিয়া বহুজাতি ও ধর্মাবলম্বীর দেশ। খ্রিস্টান, ইহুদি, মুসলমান--বহু ধর্মের লোক সে দেশে বাস করে। পোলিশ, রুশ, তাতার, উজবেক, আর্মেনিয়ান প্রভৃতি ছোটবড় প্রায় ১৪৫টি জাতি সে দেশে বাস করত। তাদের ভাষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক জীবনধারা সবই ছিল আলাদা। বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় তাদের স্বাধীনতা ছিল না। একমাত্র রুশ জাতিই ভোগ করত সকল সুযোগ সুবিধা। আর বাকি জাতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ গড়ে তুলেছিল জার শাসকরা। রুশরা অন্যান্য অরুশ জাতিকে ঘৃণা করতে শেখাত। তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, যাতে শোষিত শ্রেণী নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিদ্রোহী হয়ে না ওঠে। ধর্ম যাজকগণ ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে জারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করত। তারা বলত– "জার ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তিনি কখনও অন্যায় করতে পারেন না। তারা বোঝাত ইহকালে যদি তোমরা বিনা প্রতিবাদে সব রকম অত্যাচার জোর, জুলুম সহ্য করে চলতে পারো, তবে পরকালে তোমরা স্বর্গসুখে জীবনযাপন করতে পারবে।" পরকালে স্বর্গসুখের আশা দিয়ে তারা ক্ষুধিত নিপীড়িত মানুষকে আন্দোলন করতে নিষেধ করত। আর সেই সুযোগে জার ও তার সাথীরা নিরীহ জনসাধারণকে শোষণ করত এবং গড়ে তুলেছিল সুখের স্বর্গরাজ্য।

রুশ বিপ্লবের ঘটনাবলি

রুশ বিপ্লবের ঘটনাগুলোকে আমরা দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করতে পারি। যথা: ১. প্রথম পর্যায় মার্চ বিপ্লব; ২. দ্বিতীয় পর্যায় অক্টোবর বিপ্লব। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সংঘটিত হয়। প্রথম বিপ্লব স্বৈরতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটায়। একই বছরের নভেম্বর মাসে সংঘটিত হয় রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় যা বলশেভিক বিপ্লব নামে পরিচিত। কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে মার্চ বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। এর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখে অনুমান করা যায় যে রাশিয়ার বিপ্লবী সংস্থাগুলো ওই সময় বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। খাদ্যের অভাবই ছিল জনগণের প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের কারণ। রুটির দোকানের সম্মুখে ক্রেতাদের লাইন ও ভিড়, ধর্মঘট ও গোলযোগের সূত্রপাত ঘটে, যা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরোধী ও রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। একদিকে জনগণের আর্থিক সংকট ও অন্যদিকে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে জার শাসকদের ব্যর্থতা জনগণকে যারপরনাই মারমুখী করে তোলে। ১৯১৭ সালের ৮ মার্চ প্রেট্রোগ্রাডে সুতারকলে মহিলা শ্রমিকরা রুটির দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাদের স্লোগান ছিল "যুদ্ধ নিপাত যাক" ও "স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক"। তারা ধর্মঘটের ডাক দেয়। তৃতীয় দিনে সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট

পালিত হয়। সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা বিপ্লবীদের উৎসাহিত করে। সেনাবাহিনী প্রথমে নিষ্ক্রিয় থাকলেও পরবর্তীকালে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয়। এরমধ্যে জার পেট্রোগ্রাডে আসার চেষ্টা চালালে রেললাইন তুলে ফেলে তাকে বাধা দেয়া হয়। জারের সেনাপতি আইভানভ পেট্রোগ্রাড পুনরাধিকার করতে ব্যর্থ হলে জার দ্বিতীয় নিকোলাস নিরুপায় হয়ে দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু জনগণের দাবি ছিল জারের সিংহাসন ত্যাগ। অবশেষে জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এইভাবে রাশিয়ায় প্রাচীন রোমানভ রাজবংশের অবসান ঘটে এবং রুশ বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় সম্পন্ন হয়। ডুমা বা জাতীয় পরিষদ একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করে। ওই সরকার ছিল মূলত বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন নরমপন্থী দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে ওই সরকার গঠিত হয়েছিল। তাঁরা উদ্যোগ নিলেন রাশিয়াতে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার। তাঁরা ভূমি সংস্কারেরও উদ্যোগ নিলেন। ধর্ম, সংবাদপত্র ও বাক-স্বাধীনতা তাঁরা নিশ্চিত করলেন। এমনকি জার্মানির সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবারও তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন। ওই সময় রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু 'সোভিয়েত' বা মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রমিক ও যুদ্ধ ফেরত সৈনিকরা ওইসব 'সোভিয়েত' পরিচালনা করতেন। ওই সময় লেনিন সুইজারল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে আসেন। তিনি ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর বিখ্যাত এপ্রিল থিসিস ঘোষণা করেন। ওই থিসিসে লেনিন উল্লেখ করেছিলেন যে, ১. মার্চ বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণীর জয় হয়েছে, এতে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই; ২. বুর্জোয়া শাসনের তথাকথিত সংকটের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। বুর্জোয়া বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব একসাথে চলবে এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করবে; ৩. শ্রমিকের স্বার্থে ক্ষমতা এখন দখল করতে হবে; ৪. বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী সরকার জার্মানির সাথে যে যুদ্ধ চালাচ্ছে, তাতে রুশ জনগণ সহযোগিতা করবে না; ৫. রুশ সেনাদল ও শ্রমিকদের এই বিপ্লবে যোগ দিতে হবে।

লেনিনের লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজবাদী বিপ্লবেরূপান্তরিত করা এবং জমিদার ও পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ সম্পূর্ণ করা। এদিকে কৃষকরা জমি বিতরণের দাবিতে আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। রুশ সেনারাও ছিলেন শান্তির জন্য উদগ্রীব। কিন্তু অস্থায়ী সরকার ওইসব দাবি-দাওয়া পূরণে ব্যর্থ হলে কৃষকরা দলে দলে জমিদারদের খেত-খামার লুট করে, তাদের ভূ-সম্পত্তি দখল করে এবং সরকারি কর্মচারিদের হত্যা করে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ওই পরিস্থিতিকে 'কৃষি সন্ত্রাস' বলতেও দ্বিধা করেননি (Lipson, Europe in the 19th and 20th Centuries)। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গেল যে শ্রমিকরাও দলে দলে কৃষকদের সাথে যোগ দিতে লাগল। সেনা সদস্যরাও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে ওই আন্দোলনে যোগ দিলেন। ফলে অস্থায়ী সরকার পুরোপুরিভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগ মেনশেভিক, অর্থাৎ সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠরা আলেকজান্ডার কেরেনস্কির নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে। মেনশেভিকরা ছিলেন নরমপন্থী সমাজতন্ত্রী। উল্লেখ্য, ১৮৯৮ সালে পিটার্সবুর্গে 'সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' গঠিত হয়েছিল। ওই

পার্টির ভেতরেই দুটি ধারা সৃষ্টি হয়েছিল– বলশেভিক আর মেনশেভিক। মেনশেভিকরা ছিলেন নরমপন্থি এবং সমাজ উন্নয়নে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করতেন। কিন্তু বলশেভিকরা ছিলেন কট্টর। তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কেরেনস্কি ক্ষমতা গ্রহণ করে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে রুশ সেনাবাহিনীর পরাজয় ও জার্মানবাহিনী কর্তৃক রিগা দখল করার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়। বলশেভিকরা (১৯১৮ সালের পর তারা কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে) রুশ সেনাবাহিনীর যে অংশ নিয়ন্ত্রণ করত, তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। বিভিন্ন স্থানে 'সোভিয়েত' গঠিত হয়। এমনি এক পরিস্থিতিতে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর বলশেভিকরা বিদ্রোহী হয়ে রেলস্টেশন, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও অন্যান্য সরকারি ভবন দখল করে নেয়। পতন ঘটে কেরেনস্কি সরকারের। আর এভাবেই রুশ বিপ্লব সম্পন্ন হয়। সুতরাং তিন স্টেজে পরিচালিত এই বিপ্লবে প্রথম স্টেজে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে ও একটি বুর্জোয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় স্টেজে বিপ্লবীদের একটা অংশ ক্ষমতা দখল করলেও তারা শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করতে পারেনি। তৃতীয় স্টেজে বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করে ও রাশিয়ায় একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

রুশ বিপ্লবের কারণ

রুশ বিপ্লব বিংশ শতাব্দীতে তো বটেই, বিশ্বের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ওই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এমন একটি সময়, যখন পশ্চিম ইউরোপ ফ্যাসিবাদের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করছে এবং একটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে নিয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লবের পর (১৭৮৯-১৮৫১) রুশ বিপ্লবই (১৯১৭) সম্ভবত দ্বিতীয় ঘটনা যেখানে বড় ধরনের সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। রুশ বিপ্লব শুধু রাশিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের সর্বত্র। নিচে রুশ বিপ্লবের কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, রাশিয়ার জার শাসকরা ছিলেন স্বৈরতান্ত্রিক। তাদের অত্যাচার, নিপীড়ন এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, সাধারণ মানুষের অসন্তোষই সেখানে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। উপরন্তু তাদের অযোগ্যতার কারণে রাশিয়া একাধিক যুদ্ধে, বিশেষ করে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, জাপানের সাথে যুদ্ধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে রাশিয়ার বিপর্যয় সাধারণ সৈনিকদের মাঝে জারবিরোধী একটা শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি, যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা ও বিপ্লবীদের দলে যোগদান ছিল শাসকদের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ। তাদের এই প্রতিবাদই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল।

দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার ওই সময়ের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। কৃষি জমির মালিকানা ছিল জমিদার তথা অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে। কৃষকরা ওইসব জমিদারের হাতে অত্যাচারিত হতো। তাদের কোনো অধিকার ছিল না। কৃষকরা বাধ্যতামূলকভাবে জমি চাষ করত। তারা ছিল ভূমিদাস। সার্ফ বা ভূমিদাসদের সংখ্যা রাশিয়ার মোট

জনসংখ্যার অর্ধেক ছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার (১৮৫৫-৮১) এই সার্ফ প্রথা প্রথমে বিলোপ করলেও (অর্থাৎ তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া, নাগরিক অধিকার দেয়া) 'মীর' নামে একটি গ্রামীণ সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে তাদের রাখা হয়েছিল। কার্যত দেখা গেল তারা জমিদারদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও, 'মীর'-এর দাসত্বে পরিণত হয়েছিল। ফলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। অন্যদিকে, অভিজাত সম্প্রদায় ছিল রাজার প্রতিনিধি এবং রাজতন্ত্রের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা জড়িত ছিল। সুতরাং অভিজাত তথা জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্বেষ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল।

তৃতীয়ত, কৃষকদের পাশাপাশি শ্রমিকরাও ছিল অসন্তুষ্ট। বিপ্লবের প্রাক্কালে তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ধর্মঘট বা ট্রেড ইউনিয়ন করার তাদের কোনো অধিকার ছিল না। তারা মনে করেছিলেন বিপ্লব সংঘটিত হলে তারা তাদের অধিকার ফিরে পাবে ও তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

পঞ্চমত, লেখকদের স্বৈরাচারবিরোধী ভূমিকা বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। টলস্টয়, দস্তোয়ভস্কির মতো লেখকরা জার দ্বিতীয় নিকোলাসের (১৮৯৪-১৯১৭) নির্যাতন ও দমননীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন। ওইসব লেখকরা তাদের লেখনীতে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় বিপ্লবের প্রাক্কালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশকে কারাগারে ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছিল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র তথা বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের সহযোগিতা করেছিল।

ষষ্ঠত, জার নিকোলাস ব্যাপক 'রুশীকরণ' পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন। রাশিয়াতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বাস থাকলেও, একমাত্র রুশ জাতিগোষ্ঠীর লোকেরাই সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল শাসকরা। শিক্ষাক্ষেত্রে তারা বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। ওই সময় রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত ফিনল্যান্ড এক ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করলেও, জার নিকোলাস ফিনদের ওই অধিকার বাতিল করে দিয়েছিলেন। এজন্যই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী একটি পরিবর্তন চাচ্ছিলেন।

সপ্তমত, ধর্মযাজকগণ ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে জারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। ধর্ম প্রচারকরা বলতেন, 'জার' ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাকে সাহায্য করলে পরকালে ভালো ফল পাওয়া যাবে। সাধারণ মানুষ ধর্ম প্রচারকদের এই ভূমিকা ভালো চোখে দেখেনি।

অষ্টমত, রুশ বিপ্লবে মার্কসবাদীদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। ওই সময়ের পরিস্থিতিকে মার্কসবাদীরা তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। লেনিন মার্কসের দর্শনকে রাশিয়ার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করতেন। রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, কৃষক-শ্রমিক তথা সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের কাছে মার্কসবাদ ছিল এক ধরনের 'মুক্তির সনদ'। তারা বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তনকেই সমর্থন করলেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় তারা আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। জার নিকোলাসের আমলে প্রথম ডুমা (সংসদ) ১৯০৬ সালে গঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডুমা (১৯০৭) ও চতুর্থ ডুমা (১৯১২) গঠিত

হলেও একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তা গড়ে উঠতে পারেনি। যে কারণে কেরেনস্কির নেতৃত্বাধীন মেনশেভিকরা ক্ষমতা পেয়ে ডুমার মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সংস্কার আনতে চাইলেও জনসাধারণের সমর্থন তাতে ছিল না। ফলে নভেম্বর বিপ্লব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

উপসংহার

রুশ বিপ্লবের সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল মেহনতি মানুষের সমর্থন। রুশ বিপ্লব রাশিয়ার জনসাধারণকে দীর্ঘদিনের শোষণ আর নির্যাতন থেকে মুক্ত করেছিল। শোষণ প্রথার চির অবসান ঘটেছিল। এই বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাতে বিশ্ব পুঁজিবাদীব্যবস্থা কেঁপে উঠেছিল। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভাঙন ধরে গড়ে উঠেছিল সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী ধাপ হিসেবে পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে রুশ বিপ্লব প্রথম বিপ্লব যার হাত ধরে কৃষক মজুরদের প্রতিনিধিরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছিল। এর মাধ্যমেই মানব শোষণের শ্রেণীভিত্তিক বিভেদের অবসান ঘটে এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। পুঁজিবাদের পতন, উপনিবেশবাদ রোধ এবং বিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বিশাল পরিবর্তন আনে রুশ বিপ্লব। সমাজতন্ত্রের জয় হয়।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব সারা বিশ্বে যে আবেদন সৃষ্টি করেছিল, একসময় সেই আবেদন আর থাকেনি। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নও একসময় 'সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র' অর্জন করে। তাদের মধ্যেও 'আধিপত্যবাদী' নীতি প্রকট হয়ে ওঠে। সেখানেও সমাজতন্ত্রের নামে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল। চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯৪৯) রুশ বিপ্লব দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও, ষাটের দশকে দুটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিশ্বসমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিভক্ত করেছিল। রুশ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যে রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল ১৯১৭ সালে, সেই রাষ্ট্রটি ও সেই সমাজব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটেছিল ৭৩ বছর পর ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে। এটাই বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির অন্যতম সমাজতন্ত্রের উত্থান ও পতন। তবে রুশ বিপ্লব বিশ্বইতিহাসের অংশ। ইতিহাসের এই অনিবার্যতা অস্বীকার করা যাবে না।

সহায়ক গ্রন্থ

১. সৈয়দ মকসুদ আলী, ফরাসি বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রচিন্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ঢাকা।
২. জন রীড, দুনিয়া কাঁপানো দশদিন, মস্কো।
৩. মনজুরুল আহসান, রুশ বিপ্লবের ইতিহাস, ঢাকা।
৪. Alexander Werth, Russia at War, 1941-1945, New York, 1964
৫. Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution, 1917-32, 1994
৬. Christopher Read, From Tsar to Soviets The Russian People and their Revolution, 1917-1921, 1996
৭. Lipson, Europe in the 19th and 20th centuries.

চতুর্থ অধ্যায়

লীগ অফ নেশন্‌স

Unfortunately, the League faltered in the 1930s as several revisionist states pursued their radical goals by acts of aggression.

Conway W. Henderson
(International Relation Conflict
and Cooperation at the Turn of
the 21st Century, 1998

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি বিশ্বসংস্থা *'লীগ অফ নেশনস্'*-এর জন্ম যেমনি ওই সময় বিশ্ববাসীকে আশার আলো দেখিয়েছিল, ঠিক তেমনি মাত্র কয়েকবছরের মধ্যে সংস্থাটির অবলুপ্তি বিশ্ববাসীকে নিমজ্জিত করেছিল হতাশার সাগরে। ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্ব পরিস্থিতিকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এটি ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর ব্যাপকতা ও ধ্বংসযজ্ঞ সমগ্র বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। এমতাবস্থায় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভাবতে থাকেন কিভাবে যুদ্ধের সম্ভাবনা বন্ধ করে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থায়ী করা যায়। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধ বেঁধে যাওয়া যে কোনো সময় সম্ভব ছিল, এই বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য বল প্রয়োগের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ পন্থা গ্রহণের জন্যও চিন্তাভাবনা করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা এই চিন্তাধারাকে প্রবল করে। পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট ১৯১৭ সালে আর যুদ্ধ না করে আপোস ও আলোচনার দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধ মেটাবার আহ্বান জানান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ১৯১৭ সালের ২ এপ্রিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে শান্তি স্থাপনের জন্য তার ১৪ দফা নীতি ঘোষণা করেন। ওই চতুর্দশ নীতির ১৪নং ধারায় বলা হয়েছিল, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করতে হবে। উইলসন বলেছিলেন, An evident principle runs through the whole programme I have outlined. It is the principle of justice to all people and nationalities and their right to live on equal terms of liberty and safety with one another, where they be strong or weak. প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে (১৯১৯) উইলসনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে ১৯

সদস্যের এক কমিটিকে লীগ অফ নেশনসের গঠনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। উইলসন ওই সমিতির প্রধান ছিলেন। এই সমিতি *লীগ অফ নেশনস* গঠনের জন্য একটি খসড়া সংবিধান রচনা করে। প্যারিসের সম্মেলনে খসড়াটি অনুমোদিত হয় এবং ভার্সাই সন্ধির প্রথম খণ্ডে এই খসড়া গৃহীত হয়। এর ফলে লীগ অফ নেশনস গঠিত হয়। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা সম্প্রসারিত হয়। এতে করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থারও আবির্ভাব হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক, বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়, এছাড়াও ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছু সমিতি সেই সময়ে গঠিত হয়। আন্তর্জাতিক সংগঠনের পদ্ধতি এবং কৌশলগত দিক থেকে বেশ কয়েকটি চুক্তি ও কমিশন যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। এগুলোর মধ্যে ১৮১৪ সালের ভিয়েনা চুক্তি, ১৮৭৪ সালের ইউনির্ভাসেল পোস্টাল ইউনিয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অতঃপর ১৮৯৯ সালের প্রথম হেগ সম্মেলন, এবং ১৯০৭ সালের দ্বিতীয় হেগ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। ওই দুটো সম্মেলনেই যৌথ নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন থেকেই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আন্তর্জাতিক স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠার দাবিতে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় নেতৃবৃন্দ দাবি উত্থাপন করেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ যুদ্ধের শুরুতেই শান্তি রক্ষাকল্পে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিকল্পনা গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আমেরিকার সাবেক রাষ্ট্রপতি ট্যাফটের (১৯০৯-১৯১৩) নেতৃত্বে ইতোমধ্যে “শান্তির জন্য লীগ” প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রেসিডেন্ট উডরো উইলসন (১৯১৩-১৯২১) এবং রুজভেল্টও (১৯০১-১৯০৯) এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এদিকে ১৯১৭ সালে পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট সালিসির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালের ২৮ এপ্রিল প্যারিস শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে ৩২টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। আর এতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট উডরো উইলসন। প্রতিনিধিবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে একটি চুক্তির মুসাবিদা রচনা করেন। ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্বের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে *লীগ অফ নেশনস*-এর কাজ শুরু হয়। এই *লীগ অফ নেশনসের* প্রথম মহাসচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন স্যার এ্যরিক ড্রম। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, যে প্রত্যাশা নিয়ে লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই প্রত্যাশা লীগ পূরণ করতে পারেনি। লীগের কাউন্সিলের আগ্রাসী রাষ্ট্র বা শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা থাকলেও কোনো আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়নি। ফলে লীগ অফ নেশনস অকার্যকর হয়ে পড়ে ও আপনা আপনি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

লীগ অব নেশনস্‌-এর গঠন

লীগ অব নেশনস্‌-এর পরিচালনার জন্য পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশ নিয়ে একটি পরিষদ বা কাউন্সিল গঠিত হয়। ওই পরিষদে চারটি অস্থায়ী সদস্য থাকবে তাও স্থির হয়।

পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র ছিল ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ অফ নেশনস্-এ যোগদান না করায় স্থায়ী সদস্য পদে মাত্র ৪টি দেশ থাকে। যে সব মিত্রশক্তি *লীগ অফ নেশনস্*-এর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল তারা হলো এর প্রথম পর্যায়ের সদস্য। এই সংখ্যা ছিল ৪০। আর বিজিত শক্তিসমূহের মধ্য থেকে যারা পরবর্তীকালে *লীগ অফ নেশনসে* যোগ দিয়েছিল তারা হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের সদস্য। এই সংখ্যা ছিল ৫০-এর উপরে। *লীগ অফ নেশনস* তিনটি প্রধান শাখা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ১. সাধারণ সভা (Assembly); ২. কাউন্সিল (Council); ৩. সচিবালয় (Secretariat).

সাধারণ সভা

সাধারণ সভা *লীগ অফ নেশনস্*-এর সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। এতে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র তিনজন করে সদস্য প্রেরণ করত। তবে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটি মাত্র ভোটো দেয়ার অধিকার স্বীকৃত ছিল। এতে একজন সভাপতি এবং আটজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হতেন। সাধারণ সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ৬টি স্থায়ী কমিটি ছিল। এগুলো হলো ১. সাংগঠনিক ও আইন সংক্রান্ত কমিটি; ২. প্রযুক্তি সংক্রান্ত কমিটি; ৩. আয় ব্যয় সংক্রান্ত কমিটি; ৪. অস্ত্রশস্ত্র সংক্রান্ত কমিটি; ৫. সামাজিক ও সাধারণ বিষয়ক কমিটি ও ৬. রাজনীতি বিষয়ক কমিটি। প্রতিটি কমিটির একজন নির্বাচিত সভাপতি ছিল।

সাধারণ সভার কার্যাবলি ছিল নিম্নরূপ ১. *লীগ অফ নেশনসের* মহাসচিব নির্ধারণ করা; ২. লীগের বাৎসরিক বাজেট আলোচনা করা; ৩. লীগ পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন করা; ৪. আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারক নির্ধারণ করা; ৫. যে কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে সুপারিশ আকারে সিদ্ধান্ত প্রদান করা ও ৬. বিশ্বশান্তির জন্য অপরিহার্য যে কোনো প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করা। *লীগ অফ নেশনস্*-এর কোনো সাধারণ সভার সকল সদস্যদের সম্মতির প্রয়োজন ছিল। শুধু কোনো নতুন রাষ্ট্রের সদস্য পদ প্রদানের বেলায় দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের প্রয়োজন হতো। প্রতি বছর জেনেভায় সাধারণ সভার অধিবেশন বসত। লীগ অব নেশনস্-এর সমগ্র কার্যকলাপের মধ্যে সর্বমোট ২০টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কাউন্সিল

কাউন্সিল ছিল *লীগ অফ নেশনস্*-এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখা। লীগ চুক্তিপত্রের প্রণেতাগণ এ মনোভাব নিয়েই এটি গঠন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কনসার্ট অব ইউরোপের ধারণা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কাউন্সিলে ছিল দু ধরনের সদস্য, যথা: স্থায়ী ও অস্থায়ী। স্থায়ী সদস্য ছিল ৫, যথা ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্য ছিল ৪ এবং তারা অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে নির্বাচিত হতো। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র *লীগ অফ নেশনস্*-এ যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানালে এর সদস্য সংখ্যা ৮ এসে দাঁড়ায়। ১৯২৬ সালে জার্মানি এবং ১৯৩৪ সালে রাশিয়া কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে। এভাবে ১৯৩৬ সাল নাগাদ এর সদস্য

সংখ্যা ১১-তে উন্নীত হয়। এই কাউন্সিলের অধিবেশন বছরে তিনবার বসত। এছাড়া প্রয়োজনবোধে মধ্যে মধ্যে এর বিশেষ অধিবেশনও বসত। লীগ চুক্তিপত্রে এই কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নে দেয়া হলো :

১. বিশ্বশান্তি রক্ষার বিষয়াদি আলোচনা করা; ২. অস্ত্র উৎপাদন ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; ৩. বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করা; ৪. সংখ্যালঘু সমস্যার যথাযথ মীমাংসা করা; ৫. সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা; ৬. সকল প্রকার আগ্রাসন রহিত করা; ৭. চুক্তি ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ৮. লীগ সচিবালয়ের বিভিন্ন নিয়োগ অনুমোদন করা; ৯. লীগের সাধারণ সভাকে বিভিন্ন সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করা; ১০. বিভিন্ন কমিশনের নানাবিধ সুপারিশ কার্যকর করা। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই কাউন্সিল ছিল যথেষ্ট দায়িত্ববান ও শক্তিশালী।

সচিবালয়

লীগ অফ নেশনস্-এর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছিল সচিবালয়। এটি লীগের মহাসচিবের অধীনে স্থাপন করা হয়েছিল। লীগ পরিষদের অনুমোদনক্রমে সচিবালয়ের কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব মহাসচিবের ওপর অর্পিত হয়। মহাসচিবের অধীনে কয়েকশত কর্মচারী, দুইজন ডেপুটি সেক্রেটারি, এবং দুইজন আন্ডার সেক্রেটারি কর্মরত ছিলেন। সচিবালয়ের উপরে নিম্নেবর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হয়। আর তা হলো :

১. লীগের সাধারণ সভা ও কাউন্সিলের নির্দেশসমূহ কার্যকর করা; ২. লীগের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সংরক্ষণ করা; ৩. লীগের সাধারণ সভা ও কাউন্সিলের কার্যসূচি প্রণয়ন করা; ৪. লীগের কার্যাবলি সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনা করা; ৫. আন্তর্জাতিক সংযোগ রক্ষা করা; ৬. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খবরাখবর সংগ্রহ করা এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচারমূলক পুস্তিকা প্রকাশ করা; ৭. লীগের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি ও সমস্যা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা এবং সে সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করা; ৮. নীতি নির্ধারণ করা; ৯. কোনো বাদী ও বিবাদী পক্ষের অভিযোগ পরিষদের নিকট প্রেরিত হলে পরে মহাসচিব তার অনুসন্ধান ও বিবেচনার ব্যবস্থা করতেন; ১০. একটি স্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে লীগের সংস্থাসমূহের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা। বস্তুত, *লীগ অফ নেশনস্*-এর সকল বিভাগই সচিবালয়ের উপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল ছিল। প্রকৃতপক্ষে সচিবালয় *লীগ অফ নেশনস্*-এর মধ্যমণিতে পরিণত হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়

লীগ অফ নেশনস্-এর চুক্তিপত্রে একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। চুক্তির ১৪নং ধারায় বর্ণনা করা হয়েছিল যে, লীগ একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠনের পর তা অনুমোদনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের নিকট পেশ করবে। ১৫ জন বিচারক নিয়ে ওই বিচারালয় গঠিত হতো। তাদের কার্যকালের

মেয়াদ ছিল ৯ বছর। বিচারপতিগণ সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে এ বিচারালয় স্থাপিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কার্যাবলি ও দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপ

১. আন্তর্জাতিক বিচারালয় আন্তর্জাতিক সমস্যাদির ক্ষেত্রে বিচারকার্য পরিচালনা করা; ২. আন্তর্জাতিক বিচারালয় আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করা; ৩. আন্তর্জাতিক বিচারালয় আইনের ব্যাখ্যা করা; ৪. আন্তর্জাতিক বিচারালয় আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তিসমূহ লংঘনের বিচার করতে পারবে এবং ৫. আন্তর্জাতিক বিচারালয় লীগের সাধারণ সভা অথবা পরিষদ কর্তৃক অনুরোধপ্রাপ্ত হয়ে যে কোনো বিরোধ বা প্রশ্নে উপদেশ প্রদান করতে পারবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা

লীগ চুক্তিপত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কোনো উল্লেখ না থাকলেও এর ২৩নং ধারায় নারী পুরুষ ও শিশুদের শ্রমদানের মানবিক পরিবেশ সৃষ্টি করার দায় দায়িত্ব এর ওপর বর্তায়। লীগের সকল সদস্যই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য ছিল। তবে লীগের সদস্য ছাড়াও এই সংস্থার সদস্য হওয়া যেত। যেমন, ১৯২৬ সালের পূর্বে জার্মানি লীগের সদস্য না হয়েও এর সদস্য ছিল। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র থেকে চারজন জনপ্রতিনিধি এর অধিবেশনে যোগদান করতে পারতেন। এদের মধ্যে একজন শ্রমিক, ২ জন মালিক এবং ২ জন সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাধারণ বৈঠকে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে যে কোনো সুপারিশ করা যেত। মাসে অন্তত একবার বৈঠক বসবে বলে স্থির করা হয়। পরিচালকমণ্ডলিতে ৩২ জন সদস্য ছিল, তার মধ্যে ৮ জন শ্রমিক পক্ষের, ৮ জন মালিক পক্ষের এবং ১৬ জন সরকার পক্ষের। পরিচালকমণ্ডলির পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার দফতর পরিচালনার জন্য মহাপরিচালক নিযুক্ত হতেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কার্যাবলি ও দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপ

১. শ্রমিকদের জন্য শ্রমনীতি নির্ধারণ করা; ২. শ্রমিকদের জন্য কল্যাণকর আইনকানুন প্রণয়ন এবং প্রথা প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা; ৩. সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা; ৪. বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ করা; ৫. শ্রমিকদের বেতন ও ভাতাদি বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; ৬. শ্রম সংক্রান্ত আইনের বিষয়ে সব সময় বিভিন্ন প্রতিবেদন পেশ করা। এই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কেন্দ্রীয় দফতর ও সচিবালয় জেনেভায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

লীগ অফ নেশনস-এর ব্যর্থতার কারণ

লীগ অফ নেশন্স-এর ব্যর্থতার কারণসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **বৃহৎ শক্তির অনুপস্থিতি :** মার্কিন রাষ্ট্রপতি উডরো উইলসন লীগ অফ নেশনস্-এর প্রধান প্রেরণাদাতা ছিলেন। কিন্তু মার্কিন সিনেট ভার্সাই চুক্তি অনুমোদন না করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র *লীগ অফ নেশনস্*-এ যোগ দিতে পারেনি। লীগের চুক্তিপত্র ভার্সাই

সন্ধির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। সুতরাং ভার্সাই চুক্তি অনুমোদন না করার অর্থ হলো *লীগ অফ নেশনস্‌*-এ যোগদানের সম্ভাবনা বাতিল করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতি ছিল লীগ অফ নেশনস্‌-এর ওপর প্রচণ্ড আঘাতস্বরূপ।

২. **মতানৈক্য** বিজয়ী ও বিজিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মতানৈক্য এবং জার্মানিকে সর্বতোভাবে পঙ্গু করে রাখার চেষ্টা লীগের মতো এক আন্তর্জাতিক সংস্থার সাফল্যের প্রধান অন্তরায় ছিল।

৩. **জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য** জাতীয় স্বার্থের ধারণার দ্বারা তখন রাষ্ট্রগুলো অতি মাত্রায় প্রভাবিত ছিল। ফলে লীগের প্রতি তাদের অখণ্ড আনুগত্য জন্মায়নি। আন্তর্জাতিক স্বার্থের খাতিরে জাতীয় স্বার্থ ত্যাগ করার মনোবৃত্তি তখন কোনো দেশেরই ছিল না। এই কারণে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থের খাতিরে লীগের নীতি ও শর্তকে উপেক্ষা করতে কোনো সময়ই দ্বিধাবোধ করেনি।

৪. **সামরিক বাহিনীর অনুপস্থিতি :** আন্তর্জাতিক শান্তি এবং যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন ছিল আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনীর। লীগ আক্রমণ বন্ধের জন্য কেবল প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারত। সেই প্রস্তাব কার্যকর করার মতো কোনো সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা তার ছিল না। এর ফলে আক্রমণকারী কর্তৃক নির্দেশ লংঘনের ক্ষেত্রে লীগের পক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা সম্ভব হতো না।

৫. **সদস্যপদ প্রত্যাহারের প্রবণতা :** *লীগ অফ নেশনস* সদস্যপদ প্রত্যাহারের সুযোগ রেখেছিল। ফলে এই সুযোগে সামান্যতম অজুহাতে বহুদেশ তাদের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এতে সদস্য সংখ্যা ৬৬ থেকে কমে ৪৯ দাঁড়িয়েছিল। সদস্যপদ প্রত্যাহারের এই প্রবণতা লীগের পতনের পথ প্রশস্ত করে।

৬. **সমরাস্ত্র হ্রাসে ব্যর্থতা :** লীগের সনদে অস্ত্র হ্রাসের বিষয় উল্লেখ ছিল। কিন্তু ওই সময় হিটলার ক্ষমতায় আসার পর জার্মানি নতুন করে নিজেকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতালি এবং জাপানও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। লীগ এ ক্ষেত্রেও তার সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

৭. **তোষণ নীতি :** প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেন ও ফ্রান্স লীগের ওপর কর্তৃত্ব করত। কিন্তু এ দু দেশের জার্মানির প্রতি তোষণনীতির কারণে জার্মানির আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লীগ কোনো কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এটাও লীগের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল।

লীগ অফ নেশনস্‌-এর বিলুপ্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যেই একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে লীগ অফ নেশনস্‌-এর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু যে আশা নিয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে লীগ অফ নেশনস্‌-এর জন্ম হয়েছিল, সে আশা পূরণে লীগ ব্যর্থ হয়েছিল। এর অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যায় বৃহৎ শক্তিগুলোর অনুপস্থিতি। এছাড়া ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ছিল লীগ অফ নেশনস্‌-এর অন্যতম চালিকাশক্তি, অনেক ক্ষেত্রে এদের মন যুগিয়ে অন্যদের চলতে হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় জার্মানিতে যখন হিটলার ক্ষমতায় এলেন তখন জার্মানি পুনরায় নতুন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে

থাকে। কিন্তু লীগ এর বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। তাছাড়া লীগের গঠনতন্ত্র এবং কাজকর্মে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। লীগের সাধারণ সভার হাতে কার্যত কোনো ক্ষমতাই ছিল না। লীগের অনেক কর্মকাণ্ডের কারণে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর ক্লাব বলে আখ্যায়িত করেছিল। প্রভৃতি নানা কারণে লীগ অফ নেশনস্-এর বিলুপ্তি ঘটে।

উপসংহার

মূলত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে *লীগ অফ নেশনস্*-এর জন্ম হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সমগ্র বিশ্বের মানুষ এর ভয়াবহতা সম্পর্কে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল, ঠিক তখনই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর ফলে আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে *লীগ অফ নেশনস্* আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু যে স্বপ্ন, প্রত্যাশা এবং উদ্যম নিয়ে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা বাস্তবায়ন করা লীগ অফ নেশনস-এর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিশ্ব থেকে যুদ্ধভীতি দূর করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা লীগ অফ নেশনস্-এর পক্ষে সম্ভব হয়নি। লীগ অফ নেশনসের সবচেয়ে বড় ঘাটতি ছিল এর নিজস্ব কোনো বাহিনী ছিল না। এটা এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত না। লীগ অফ নেশনস বিশ্বকে পুরোপুরি নিরস্ত্রীকরণ করতে সক্ষম হয়নি। এর বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে জার্মানি। লীগ অফ নেশনস্-এর সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা আস্তে আস্তে কমতে থাকায় এটা কার্যক্ষেত্রে গুরুত্বহীন হয়ে পড়তে থাকে। এই লীগ অফ নেশনস্-এর ব্যর্থতার পর মনে করা হয়েছিল পৃথিবীর বুকে আর কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠন হয়তো সফলতা লাভ করতে পারবে না। কিন্তু এর বিলুপ্তির মধ্য দিয়েই জাতিসংঘের আবির্ভাব ঘটে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. শাহ আলম, আন্তর্জাতিক সংগঠন, ঢাকা, ১৯৯৬
২. আবদুল লতিফ খান, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বিষয়াবলি, ঢাকা, ১৯৯৫
৩. অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৯৯.
৪. Langsam, The World Since 1919.

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ইউরোপীয় রাজনীতি

A fight for freedom had begun, mighter than the earth had ever seen, for once Destiny had begun its course, the conviction dawned on even the broad masses that this time not the fate of Serbia or Austria was involved, but whether the German nation was to be or not to be.

Adolf Hitler
(Mein kampf, 1943)

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত ও দুঃখজনক ঘটনা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। বিশ্ব যখন সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে নতুনভাবে শান্তির স্লোগান নিয়ে উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেছিল তখনই শান্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল নতুন সাম্রাজ্যবাদীদের উগ্র মানসিকতা আর যুদ্ধংদেহী মনোভাব। জার্মানিসহ অন্য উগ্র-জাতীয়তাবাদী দেশগুলোর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে বিশ্বযুদ্ধ নামে একটা নতুন মহাসমর বিশ্ববাসীকে নাড়া দিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্বের বিবেককে নাড়া দিয়েছিল। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষগুলো বুঝতে পেরেছিল একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করতে না পারলে শান্তি আসবে না। সেই সংস্থা গঠিত হয়েছিল। কিন্তু লীগ অফ নেশন্স বিশ্ববাসীর সেই আশা পূরণ করতে পারেনি। ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত শক্তিগুলোকে যেভাবে দমন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে সকল রাষ্ট্রকে আগের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর করে তুলেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়ী ব্রিটেন, ফ্রান্স, পরাজিত জার্মানি, তুরস্ক যেন আর কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেজন্য তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল অনেক অন্যায়মূলক শর্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে অস্ত্র প্রতিযোগিতা লক্ষ করা গিয়েছিল। এর ফলে, সারাবিশ্বে এক ধরনের নৈরাজ্যবাদ লক্ষ করা যায়। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে তৎকালীন শক্তিশালী দেশগুলো সারা বিশ্বকে তাদের বাজারে পরিণত করে রেখেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সারাবিশ্বে আক্রমণাত্মক

সাম্রাজ্যবাদীনীতি লক্ষ করা যায়। ১৯৩১ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল, ১৯৩৭ সালে ইতালির ইথিওপিয়া দখল, স্পেনের গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে ওই সময় জটিল করে তুলেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জার্মানজাতি তাদের পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারেনি। ইতালিতে মুসোলিনি কর্তৃক ফ্যাসিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেখানে একটি যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত যে সময়সীমা, সেই সময়সীমা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা ওই সময়সীমায় উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যা কি না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। প্রথমেই বলতে হয় দাওয়েস প্লান (The Dawes Plan) ও ইয়াং প্লানের (Young Plan) কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণের সমস্যার সমাধানের জন্য ১৯২৪ সালে দাওয়েসকে নিয়ে একটি কমিটি এবং ওই কমিটি ব্যর্থ হলে ১৯২৯ সালে জনৈক ইয়াংকে নিয়ে আরেকটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। ইয়ং পরিকল্পনায় জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে (প্রায় ১০ কোটি পাউন্ড) বাধ্য করা হয়েছিল। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও অপরাপর বিজয়ী রাষ্ট্রের ন্যায় ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কটি চুক্তি ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯২২ সালে অনুষ্ঠিত ওয়াশিংটন নৌ-সম্মেলনে জার্মানি ও তার মিত্রবাহিনীর নৌ বাহিনীর ক্ষমতা সীমিত করা হয়। অপরদিকে, ১৯৩১ সালের লন্ডন নৌ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জাপানের মারণাস্ত্র সীমিত করার জন্য ছবছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অন্যদিকে, ১৯২৫ সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল লোকার্নো চুক্তিসমূহ (Locarno Treaties) (মোট ৭টি)। ওইসব চুক্তিতে জার্মানিকে লীগের স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা, জার্মানিকে আলসেস-লরেন ছেড়ে দেয়া, ফ্রান্সকে তার সম্প্রসারণনীতি পরিত্যাগ করা ও রাইনকে একটি 'বাফার অঞ্চল'-এ পরিণত করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ১৯২৮ সালে প্যারিসে কেলগ-ব্রিয়ান্ড চুক্তি (Kellog-Briand Pact) স্বাক্ষরিত হয়। তাতে "যুদ্ধকে জাতীয় নীতির প্রধান অঙ্গ" হিসেবে গণ্য না করার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৩৫ সালে নৌ-নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও, জাপান ওই সম্মেলন ত্যাগ করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে রাজতন্ত্রের অবসান ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯১৯ সালে সেখানকার সোসাল ডেমোক্রেট পার্টির নেতা এর্বার্টের নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের অবসান হয় ও দেশটিকে সাধারণতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ভাইমার নামক স্থানে জার্মান প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন (প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে ৭ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন ও দুকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট)। ইতিহাসে এটা *'ভাইমার রিপাবলিক'* হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এই *'ভাইমার সাধারণতন্ত্র'* টিকে থাকতে পারেনি মূলত উগ্র ডান ও উগ্র বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধ, স্থিতিশীলতার অভাব, বিত্তশালী শিল্পপতিদের অসহযোগিতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিফলতা ইত্যাদি নানা কারণে। এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই জার্মানিতে হিটলারের উত্থান ঘটে। ১৯৩৩ সালে জার্মান পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের

নির্বাচনে ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টি (নাৎসি পার্টি) ৬৪৭টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন পেয়েছিল। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গ ভন প্যাপেনের পরিবর্তে হিটলারকে চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ দেন (১৯৩৩)। হিন্ডেনবার্গের মৃত্যুর পর ১৯৩৪ সালে হিটলার নিজেকে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবে একইসাথে তিনি প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ক্ষমতা দখল করে তিনি ভাইমার সংবিধান বাতিল করেন ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। হিটলার ১৯৩৫ সালে ভার্সাই চুক্তি ও লুকার্নো চুক্তিগুলোর শর্তাবলি মানতে অস্বীকৃতি জানান। একই সাথে তিনি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে পূর্ণমাত্রায় সমরাস্ত্র নির্মাণে উদ্যোগী হন। হিটলার রাইন অঞ্চল দখল করলে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে।

হিটলার ক্ষমতাসীন হয়ে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণ সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হন। ওই সময় হিটলার স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন করেন। ১৯৩৬ সালে জার্মানি জাপানের সাথে কমিনটার্ন বিরোধী একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৯৩৭ সালে ইতালি ওই চুক্তিতে যোগ দিলে জার্মানি, জাপান ও ইতালির মধ্যে রোম-বার্লিন টোকিও অক্ষচুক্তি সম্পাদিত হয়। এটি ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়াবিরোধী একটি চুক্তি। হিটলার চেকোস্লাভাকিয়ার সাথে একটি চুক্তি করে চেকোস্লাভাকিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করেন। এবং লিথুনিয়ার কাছ থেকে মোমেল বন্দরটি বলপূর্বক আদায় করেন। একই সাথে তিনি পোল্যান্ডের ডানজিগ বন্দরটিও দখলে নেন। আর এভাবেই ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিনি পোল্যান্ড আক্রমণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেন। এই যুদ্ধ দীর্ঘ ছবছর স্থায়ী ছিল (১৯৩৯-৪৫)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও পৃথিবীর ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অক্ষশক্তির প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত মিত্রশক্তি। রাশিয়াও ছিল এই দলে। যুদ্ধে একের পর এক জার্মানির পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে জার্মানি ও ইতালি মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। হিটলার আত্মহত্যা করেন, আর মুসোলিনিকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে, ১৯৪৫ সালের ২ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও রাশিয়া পটাসডাম সম্মেলনে জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বললে জাপান তা প্রত্যাখ্যান করে। পরে ৬ ও ৯ আগস্ট হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমাবর্ষণ করা হয়। ফলে ১৪ আগস্ট (১৯৪৫) জাপান শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করে।

এখানে একটা কথা বলা ভালো আর তা হচ্ছে, জাপান কর্তৃক পার্ল হারবারে হামলা। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর হাওয়াই-এর ওয়াহু দ্বীপে অবস্থিত পার্ল হারবারে মার্কিন নৌ ও বিমান ঘাঁটিতে জাপান বিমান হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করে দেয়। জাপানি বিমান হামলায় মার্কিনীদের চোখ খুলে যায়। তারা সিদ্ধান্ত নিল জাপানে মারণাস্ত্রের আঘাত হানার। তারা পারমাণবিক বোমা তৈরির পরিকল্পনা হাতে নিল। ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে যুক্তরাষ্ট্র সাফল্যজনকভাবে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ঠিক তিন সপ্তাহ পর হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমাবর্ষণ করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিল আণবিক বোমার ভয়াবহতা। বিংশ শতাব্দীতে এই ঘটনা পরবর্তী বিশ্বরাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেললেও, বৃহৎ শক্তিগুলো কখনো মারণাস্ত্র তৈরি, উৎপাদন ও পরীক্ষা থেকে পিছপা হয়নি। বিংশ শতাব্দী প্রত্যক্ষ করেছে ৮টি দেশের উত্থান, যারা নিজেদেরকে পারমাণবিক শক্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে। নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অগ্রগতি হলেও (এনপিটি চুক্তি ও সিটিবিটি চুক্তি স্বাক্ষর), বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকা বরাবরই প্রশ্নের মধ্যে ছিল। পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার ও উৎপাদন বন্ধের ব্যাপারে তারা কখনো আন্তরিক ছিল না। এমনকি জাতিসংঘও এ ব্যাপারে তেমন কোনো বড় ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীতে এটা ছিল একটা বড় ব্যর্থতা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেও সভ্যসমাজ মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

এক কথায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো

১. **ভার্সাই চুক্তি** ভার্সাই চুক্তির ফলে জার্মানি তার যাবতীয় উপনিবেশ হাতছাড়া করল। শুধু তাই নয়, উপনিবেশে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ লগ্নি করা হয়েছিল, তাও বিফলে গেল। আর জার্মানি হারিয়েছিল কৃষিযোগ্য জমির শতকরা সাড়ে পনের ভাগ, উৎপাদন শিল্পের শতকরা দশ ভাগ, মজুত কয়লার দুই-পঞ্চমাংশ, খনিজ লোহার দুই-তৃতীয়াংশ। এছাড়া জার্মানির নৌ-বাহিনী, স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনীর উল্লেখযোগ্য অংশ হ্রাস করা হয়েছিল। এককথায় সব দিক থেকে জার্মানিকে দুর্বল করাই ছিল ভার্সাই চুক্তির অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে জার্মানি চুক্তির শর্ত মনেপ্রাণে স্বীকার করে নেবে না। কার্যক্ষেত্রে তাই ঘটল। চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পরই জার্মানি তৈরি হতে থাকল পরবর্তী যুদ্ধের জন্য।

২. **দীর্ঘ যুদ্ধবিরতি** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে শান্তি, নিরাপত্তা ও গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো তখন দেখা গেল গণতন্ত্র, নিরাপত্তা ও শান্তি কোনোটাই নিরাপদ নয়। সেই জন্য দুই মহাযুদ্ধের মধ্যখানের সময়টাকে শান্তিপূর্ণ সময় না বলে দীর্ঘযুদ্ধবিরতি বলা হয়। গণতন্ত্র, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সবাই আগ্রহী হয়ে পড়েছিল। আর এই আগ্রহ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভেবেছিল গণতন্ত্র ও শান্তি সংকটের মুখে, আবার জার্মানি ভেবেছিল বৃহৎ শক্তির মুখে তার নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই।

৩. **অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ** ভার্সাই চুক্তি জার্মানিকে নিঃস্ব করেছিল। চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর জার্মানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে কোনো প্রকারে যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়া। জাপান ও ইতালি মনে করেছিল যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সব রকম সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত, তাই অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকে তারা অপরিহার্য বলে মনে করেছিল। সারা বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না

পারলে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এই মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে জার্মানি, জাপান ও ইতালি যুদ্ধের উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল।

৪. **আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য :** আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যকে অনেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। *'লীগ অফ নেশনস্'* যৌথ নিরাপত্তাব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় লীগের সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য রাষ্ট্র শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সনাতন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল এবং এই পদ্ধতি হলো জোট তৈরি করা। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ অথবা ইতালির ইথিওপিয়া আক্রমণ কোনো ক্ষেত্রেই লীগ যৌথ নিরাপত্তাকে কাজে লাগিয়ে আগ্রাসী শক্তিকে শাস্তি দিতে পারেনি। সেইজন্য লীগের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সবার মনেই সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। লীগের উপর এই সর্বব্যাপী অনাস্থা আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যকে সুনিশ্চিত করে তুলেছিল। অনেকের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে লীগের সফল হওয়া মানে যুদ্ধের সম্ভাবনা কমে যাওয়া, আর ব্যর্থতা মানে যুদ্ধ অনিবার্য।

৫. **নিরস্ত্রীকরণে ব্যর্থতা :** *লীগ অফ নেশনস্*-এর প্রণেতাগণ মনে করেছিলেন শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে নিরস্ত্রীকরণ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু এই সদিচ্ছাকে ফলপ্রসূ করতে হলে বৃহৎ শক্তিবর্গের যে পরিমাণ সহযোগিতা ও লীগ কর্তৃপক্ষের দৃঢ়তা প্রয়োজন তার কোনোটাই ছিল না। বৃহৎ শক্তিবর্গ অস্ত্র উৎপাদনের অশুভ প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে নিমজ্জিত করেছিল। অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ না হওয়ায় তা যুদ্ধের জন্ম দিয়েছিল।

৬. **উগ্রজাতীয়তাবাদ** হিটলারের ধারণা ছিল জার্মানজাতি পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠজাতি, অন্যরা নিকৃষ্ট। অতএব নিকৃষ্টের উপর শ্রেষ্ঠের কর্তৃত্ব থাকা খুবই স্বাভাবিক। জার্মানজাতি গোটা ইউরোপের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এই স্বপ্নে হিটলার বিভোর ছিলেন। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করতে গিয়ে তিনি এক সর্বধ্বংসী যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

৭. **সর্বাত্মকবাদ :** হিটলার ও মুসোলিনি উভয়েই গণতন্ত্রকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন, তাঁরা গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে সর্বাত্মকবাদ বা Totalitarianism-এর পথকে সর্বোৎকৃষ্ট পথ বলে মেনে নিয়েছিলেন। হিটলার ও মুসোলিনী মনে করতেন গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, দেশের দ্রুত বিকাশ সাধনের জন্য সর্বাত্মকবাদ ছাড়া উপায় নেই। হিটলার ও মুসোলিনি জঙ্গী জাতীয়তাবাদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে গোটা ইউরোপের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে উদ্যত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে মানবসভ্যতা, বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিকবাদ ইত্যাদি একেবারে মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। জার্মানি, জাপান ও ইতালির কাছে নিজেদের সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ ছাড়া অন্য কোনো মূল্যবোধ যথাযথ মর্যাদা পায়নি।

৮. **অন্যান্য কারণ** এ ছাড়া লোকার্নো চুক্তি, ওয়াশিংটন নৌ-সম্মেলনসহ কেলগ-ব্রিয়ান্ড চুক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বরাজনীতিতে একটি সদূরপ্রসারী ফলাফল আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই ফলাফল নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **পরস্পর বিরোধী দুই মতাদর্শের বিকাশ :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপ। পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদ তথা সংসদীয় গণতন্ত্রের আরো বিকাশ ঘটে, অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ধাঁচের সমাজতন্ত্র বিকশিত হয়। এই দুই মতাদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে দুটি সামরিক জোট ন্যাটো ও ওয়ারশ।

২. **জার্মানির বিভক্তি :** হিটলারের পতনের পর জার্মানি দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। ১৯৪৯ সালের ২৩ মে পশ্চিম জার্মানির আত্মপ্রকাশ ঘটে, আর পূর্ব জার্মানির জন্ম হয় ৭ অক্টোবর (১৯৪৯)। জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়। নাৎসি দল নিষিদ্ধ হয় ও সকল প্রকার ঘৃণ্য আইন-কানুন বাতিল হয়। ডানজিগ পুনরায় পোল্যান্ডকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। নুরেনবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়।

৩. **বিশ্বরাজনীতিতে বৃহৎ শক্তি হিসেবে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পতন :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন বিশ্বব্যাপী তার সাম্রাজ্য হারায়। ব্রিটেনের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, বিশ্বের বাজারে ব্রিটিশ পণ্য রপ্তানি বন্ধ হয়। কৃষিক্ষেত্রগুলো অনাবাদী হয়ে পড়ে থাকে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে যুদ্ধ ফেরত সেনাদের ভাতা প্রদান ও পুনর্বাসনের সমস্যা দেখা দেয়। ব্রিটেনকে বাধ্য হয়ে তার স্থল ও নৌ-বহর হ্রাস করতে হয়। ব্রিটেনের সামরিকশক্তি খর্ব হয়। ফলে বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রভাব কমতে থাকে। ফ্রান্সের অবস্থা ছিল ব্রিটেনের চাইতে বহুগুণ খারাপ। সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কম থাকায় তিনি স্থায়ী সরকার গঠনে অক্ষম হন। ১৯৪৬-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ১৪ জন প্রধানমন্ত্রী একে একে ক্ষমতায় এসে চলে যেতে বাধ্য হন। এদিকে ফ্রান্সের শিল্প ও অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও ধর্মঘটে ফ্রান্স ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়। ফলে ধীরে ধীরে বিশ্বরাজনীতিতে ফ্রান্সের গুরুত্ব কমতে থাকে।

৪. **বৃহৎ শক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছিল বৃহৎ শক্তি। কিন্তু যুদ্ধের পরেই বিশ্বরাজনীতির চেহারা ও বৃহৎ শক্তির কাঠামো দুইই ব্যাপকভাবে বদলে যায়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তাদের পক্ষে সামলে ওঠা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে তার প্রভাব বিস্তার করে বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এর পশ্চাতে কারণ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও সামরিক খাতে ব্যয় করার মতো প্রচুর অর্থ। এই কারণে আমেরিকা তার প্রভাব বিস্তার করে।

৫. **সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে শক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থানের পশ্চাতে মূল কারণ ছিল দেশটির বিপুল সামরিক শক্তি ও সম্পদের প্রাচুর্য।

৬. **স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা** বিশ্বযুদ্ধের পরে গোটা বিশ্বে মেরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজ নিজ প্রভাব বলয় সৃষ্টি করে, দুই পরাশক্তি পারমাণবিক ও অন্যান্য বিধ্বংসী অস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলে। আক্রমণ করার বাসনা উভয়ের মনে দানা বাঁধে। কিন্তু বিধ্বংসী অস্ত্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে দুই রাষ্ট্রই আতঙ্কবোধ করে। ফলে দেখা দেয় এক ধরনের 'যুদ্ধের', যা কিনা ইতিহাসে স্নায়ুযুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে এই দুই পরাশক্তির মাঝে কোনো যুদ্ধ হয়নি বটে। কিন্তু একাধিকবার যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই স্নায়ুযুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

৭. **জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা** ১৯৪১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে আগস্টা যুদ্ধ জাহাজে মিলিত হয়ে আটলান্টিক সনদপত্র স্বাক্ষর করেন। ওই সনদে একটি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের ইঙ্গিত দেয়া হয়। আটলান্টিক সনদে বলা হয় যে, ১. সনদে যোগদানকারী সকল দেশ সমান মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী হবে; ২. সকল প্রকার বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি হবে; এবং ৩. প্রতি দেশের জনগণ তাদের ইচ্ছামতো শাসনতন্ত্র তৈরি করার অধিকার পাবে। ১৯৪২ সালে ২৬টি দেশ আটলান্টিক সনদের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করে। এই ২৬ জাতির সম্মেলনে সর্বপ্রথম জাতিসংঘ বা United Nations কথাটি ব্যবহার করা হয়। ১৯৪৩ সালে মস্কো সম্মেলনে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এই ঘোষণাপত্রের চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, "আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বের ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা চার শক্তি স্বীকার করছে।" ১৯৪৫ সালে সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে জাতিসংঘের সনদ গৃহীত হয়। ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ জাতিসংঘ সনদ চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

৮. **ফ্যাসিবাদের ধ্বংস :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়ী হওয়ায় ফ্যাসিবাদ চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

মূল্যায়ন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মূলে ছিলেন জার্মানির একনায়ক হিটলার। এছাড়া ইতালি, জাপান ও জার্মানির মতো দেশ সারাবিশ্বে তাদের প্রাধান্য বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যা বিশ্বকে শুধু ক্ষতিগ্রস্তই করেনি, করেছিল বাকরুদ্ধ। মাত্র বিশ বছরের ব্যবধানে বিশ্বকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল এক ভয়ঙ্কর জীবননাশী যুদ্ধের। যুদ্ধের প্রথম দিকে অক্ষশক্তি বিশ্বের বেশিরভাগ অংশ দখল করলেও শেষের দিকে একে একে পতন ঘটে জার্মানি, ইতালি ও জাপানের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি মোড় নেয় নতুন দিকে। জন্ম নেয় দুই পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। বিশ্ব থেকে পতন ঘটে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের।

নাৎসিবাদ

'নাৎসিবাদ' বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। পৃথিবীর সর্বকালের সেরা একনায়ক উগ্রজাতীয়তাবাদী জার্মান নেতা হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিতে যে নাৎসিবাদের জন্ম হয়েছিল, তার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। নাৎসি জার্মানির জন্ম একদিনে হয়নি। দীর্ঘদিনের সাধনা আর পরিশ্রমের মাধ্যমে অস্থিতিশীল নাৎসি জার্মানির বিশ্বআসরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে জন্ম হয়েছিল।

বিসমার্কের (১৮৬২-১৮৯০) নেতৃত্বে আধুনিক জার্মানি যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল তার অবসান ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের মাধ্যমে। ভাইমার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে কোনো রাজনৈতিক দল সমর্থন না দেয়ায় জার্মানিতে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। তাছাড়া সরকারি কর্মচারীদের অসহনশীল মনোভাব ও অসহযোগিতা, প্রজাতন্ত্রের বিরোধীদের সাথে সেনাবাহিনীর যোগাযোগ, অর্থনৈতিক মন্দা, বেকার সমস্যা– এই সকল কারণে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের নেতা ফ্রেডেরিক এর্বার্টের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক সময়কার প্রভাবশালী জার্মান সাম্রাজ্যকে পরিচালনা করা। অপরদিকে, এইসকল অভিযোগে জনগণের সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে জার্মানিকে তার হৃতগৌরব ফিরিয়ে দেয়ার স্বপ্ন দেখাল নাৎসি দল, যার নেতৃত্বে ছিলেন হিটলারের মতো একজন উগ্রজাতীয়তাবাদী নেতা।

বিংশ শতাব্দীতে জার্মানিতে যে 'নাৎসিবাদের' জন্ম হয় তা হিটলার কিংবা নাৎসিনেতাদের মৌলিক কোনো মতবাদ নয়, পুরনো কিছু মতবাদের বিরোধিতা এবং অন্য কতকগুলো মতের সমর্থনকেই নাৎসিবাদের মূল সঞ্চালক শক্তিরূপে গণ্য করা যায়। নাৎসিবাদ যে সকল মতবাদের বিরোধী ছিল, সেগুলো হলো, উদারতাবাদ, যুক্তিবাদ এবং মার্কসবাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জার্মানি আর অস্ট্রিয়ায় এক ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল যার লক্ষ্য ছিল একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, এবং যার ভিত্তি হবে আর্যরক্ত, ভাষা হবে জার্মান এবং যা হবে সকল ধর্মীয় বিশ্বাসমুক্ত।

নাৎসিবাদ এই সকল মতবাদ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। নাৎসিবাদ সম্পর্কে The World Book of Encyclopedia- তে বলা হয় Nazism was a part of the fascist movement, One of the aims of the Nazi Party was to strengthend German military power and to extend German control throughout the world. The Nazis believed in extreme nationalism and in the superiority of the white people of northern Europe over all other peoples. অন্যদিকে International Encyclophedia of Social Sciences বইয়ে বলা হয়েছে– Nazism is the name given to the beliefs and practices of the National Socialist German Workers Party, once led by Adolf Hitler. The term Nazi is an abbreviation of the German name for the party- National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partie. থেকে, ইংরেজিতে যাকে বলা হয়– National Socialist

German Workers Party। এই নাৎসিদের মূল চেতনা ছিল– আর্য রক্তে জার্মানরাই ইউরোপের তথা বিশ্বের সেরাজাতি। সুতরাং তারাই সারা বিশ্বকে শাসন করবে। আর এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই নাৎসি নেতা হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করে এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণহানি ঘটায়।

হিটলার তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মাইন ক্যাম্ফ'-এ (Mein Kampf) নাৎসি দলের ইশতেহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন ১৯২০ সালে জার্মান শ্রমিক সংঘ এক জনসভার আয়োজন করে। উক্ত জনসভায় পঁচিশ দফা সম্বলিত নাৎসি পার্টির এক ইশতেহারও প্রকাশ করা হয়। ওই ইশতেহারটি ছিল নিম্নরূপ

১. আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে এবং বৃহত্তর জার্মানির অধীনে সমস্ত জার্মানজাতিগুলো একত্র করা;
২. অন্যান্য জাতির সঙ্গে কাজ করার বেলায় জার্মানজাতির সমমর্যাদা দাবি করা;
৩. জনসাধারণের লালন পালনের জন্য এবং বাড়তি জনসংখ্যার আবাসিক সমস্যার সমাধানের জন্য বাড়তি ভূমি ও উপনিবেশ তৈরি করা;
৪. জার্মান না হয়ে কেউ জার্মানি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দাবি করতে পারবে না, আর জার্মান রক্তের অধিকারী না হলে কেউ জার্মানজাতির সদস্য বলে দাবি করতে পারবে না। তাই কোনো ইহুদিই জার্মানজাতির অন্তর্ভুক্ত নহে;
৫. কেউ যদি জার্মানি রাষ্ট্রের নাগরিক না হয় তাহলে তাকে অতিথি হিসেবে জার্মানিতে বাস করতে দেয়া যেতে পারে এবং সবসময়ই বিদেশি আইনের আওতায় থাকবে;
৬. সরকার ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেবল রাষ্ট্রের নাগরিকদেরই ভোটাধিকার থাকবে;
৭. রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জীবিকা অর্জন ও শিল্পের উন্নতির ব্যাপারে নজর দেয়াকে প্রথম কর্তব্য হিসেবে নেবে। যদি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের লালন পালন করা সম্ভব না হয় তবে সকল বিদেশিকে অবশ্যই বহিষ্কার করতে হবে;
৮. যারা জার্মান নয়, তাদের জার্মানিতে যে কোনো প্রকার প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। যে সমস্ত অনার্য ১৯১৮ সালের ২ আগস্টের পরে জার্মানিতে ঢুকেছে তাদেরকে রাইখ অর্থাৎ রাষ্ট্র থেকে পাততাড়ি গুটাতে হবে;
৯. অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সব নাগরিককেই সমান গণ্য করতে হবে;
১০. রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকেরই সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে শারীরিক বা মানসিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা;
১১. কাজ ছাড়া যেসব আয় হবে তার উচ্ছেদ;

১২. প্রত্যেকটা যুদ্ধজাতির কাছে জান ও মালের চেয়ে বিপুল কোরবানির দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের বদৌলতে ব্যক্তিগত ধনস্ফীতিকে জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। তাই যুদ্ধের সব মুনাফা বাজেয়াপ্ত করতে হবে;

১৩. এ পর্যন্ত কোম্পানির আকারে যেসব ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে; তা জাতীয়করণ করতে হবে;

১৪. পাইকারি ব্যবসার সব মুনাফা বণ্টন করে দিতে হবে;

১৫. বৃদ্ধদের অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি করতে হবে;

১৬. একটি সুস্থ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সৃষ্টি ও পরিপোষণ এবং অবিলম্বে পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রের সামাজিকীকরণ করা হোক ও তাদেরকে অল্প দামে ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের কাছে লীজ দেয়া হোক। সেই সাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দোকানদারদের প্রতি পূর্ণ নজর দেয়া হোক;

১৭. জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভূমিসংস্কার এবং সমাজের স্বার্থে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ভূমি বাজেয়াপ্ত করা, কৃষিঋণ থেকে সুদ উৎখাত করা ও জমির ব্যাপারে সব ফটকাবাজি বন্ধ করার জন্য একটি আইন পাস করা হোক;

১৮. যাদের কাজকর্ম সাধারণ স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর তাদের নির্মম শাস্তি দেয়া হোক;

১৯. রোমান আইনের পরিবর্তে সমগ্র জার্মানির জন্য একটা নতুন আইন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে;

২০. প্রগতির স্বার্থে প্রত্যেকটি সমর্থ এবং পরিশ্রমী জার্মানের জন্যে উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রকে জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে;

২১. রাষ্ট্রকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে জাতীয় স্বার্থের মান উন্নত হয় এবং এ জন্য তাকে মা ও শিশুর স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুশ্রম বন্ধ করে দিতে হবে, বাধ্যতামূলক খেলাধুলা ও বাধ্যতামূলক ব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক দক্ষতা বাড়াতে হবে। শুধু তাই নয় যুবক যুবতীদের শারীরিক উন্নতির জন্য দেশে যে সমস্ত ক্লাব রয়েছে তাদেরকে ব্যাপক সাহায্য দিতে হবে;

২২. বেতনভোগী সেনাবাহিনীর পরিবর্তে একটা জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করা হোক;

২৩. একটি জার্মান জাতীয় প্রেস সৃষ্টি করতে হবে। জার্মান ভাষায় যেসব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় তাদের সম্পাদক ও অন্যান্য সহকারীদের জার্মানজাতির সদস্য হতে হবে। জার্মান নয় এই ধরনের পত্রপত্রিকা প্রকাশের পূর্বে রাষ্ট্রের বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। যারা জার্মান নয় তাদেরকে আইনের মাধ্যমে অর্থানুকূল্য প্রদর্শন এবং সেই সূত্রে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করা থেকে বিরত রাখতে হবে। এই আইন অমান্যের শাস্তি

হবে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার বিলুপ্তি এবং এ ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তির দেশান্তর। জাতীয় কল্যাণে সহযোগিতা করবে না এ ধরনের পত্রপত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে হবে।

২৪. জার্মানজাতির নৈতিক অনুভূতির বিপক্ষে নয় এবং রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর নয় এই শর্তসাপেক্ষে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই স্বাধীনতা দিতে হবে;

২৫. উপরে যা বলা হলো তার বাস্তবায়নের জন্যে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই ইশতেহারটি তৎকালীন জার্মানির অস্থিতিশীল রাজনীতিতে নতুন আশার সঞ্চার করে। জার্মানির যুব সম্প্রদায় হিটলারকে তাদের স্বপ্নপুরুষ মনে করে নাৎসি দলের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। নাৎসি পার্টিতে হিটলারের প্রভাব চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায়, যা তাকে পরবর্তীকালে পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত করে তোলে।

২৫ দফা ইশতেহার ঘোষণার পর নাৎসি পার্টিতে হিটলারের প্রভাব এত বৃদ্ধি পায় যে সেনাবাহিনীর চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি পার্টির সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এখানে বলা প্রয়োজন হিটলারের জন্ম অস্ট্রিয়ায়। নিজেকে তিনি একজন ভাস্কর হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাস্কর হতে তিনি পারেননি। পরবর্তীকালে তিনি জার্মানির মিউনিখ শহরে যান ও ব্যাভেরিয়ার (জার্মানির একটি প্রদেশ) সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে তিনি বেশ নামও করেন। ১৯২৩ সালে তিনি লুডেনডর্ফের সহযোগিতায় দেশের শাসনভার গ্রহণের চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়ে তিনি অতঃপর জেলে যান। জেলে বসেই Mein Kampf গ্রন্থটি রচনা করেন, যা ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রচণ্ড ইহুদি ও সাম্যবাদবিরোধী হিটলার সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের বিরোধী ছিলেন এবং জার্মানির জন্য যে 'গণতন্ত্র' প্রত্যাশা করেছিলেন, তা ছিল একনায়কতান্ত্রিক। তিনি বিশ্বাস করতেন জার্মানজাতির জন্য একজন 'শক্তিশালী নেতা' দরকার।

এটা সত্য হিটলার তাঁর নীতি ও আদর্শ নিয়ে জার্মান পার্লামেন্টে বিজয়ী হয়েছিলেন এবং চ্যান্সেলরও হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা ও পররাজ্য গ্রাসের কারণেই তিনি বিশ্বব্যাপী বিতর্কিত হয়েছিলেন। তিনি পরিণত হয়েছিলেন এক গণনায়কে। তাঁর রাজনীতিতে নেতিবাচক দিকটি বেশি থাকলেও দেশের জন্য কিছু কিছু ইতিবাচক দিকও ছিল। যেমন ১. ১৯৩৬ সালে জার্মানিতে উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল; ২. প্রতি নাগরিকের মোট আয় শতকরা ১৫ ভাগ বেড়ে গিয়েছিল; ৩. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্য বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গৃহীত হলে জার্মানিতে কর্মচাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল।

হিটলারের এই অর্থনৈতিক সাফল্যে তার নেতিবাচক দিকগুলো চাপা পড়ে গিয়েছিল। যেমন ১. ট্রেড ইউনিয়নগুলো ভেঙে দিয়ে লেবার ফ্রন্টের সাহায্যে হিটলার শ্রমিকদের একই বেতনে অনেক ঘণ্টা করে কাজ করাতেন; ২. শ্রমিকদের ঘণ্টাপিছু বেতন কমে গিয়েছিল; ৩. খাদ্যদ্রব্যের মূল্য আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল; ৪. নাৎসি দল কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বিনাবেতনে শ্রম দিতে বাধ্য করেছিল;

৫. বিদ্যালয়ে সৎ এবং নিরপেক্ষ শিক্ষার স্থলে নাৎসি শিক্ষা দেয়া হতো; ৬. বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নাৎসিবাদের দ্বারা মগজ ধোলাই করে তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল; ৭. ন্যায্য প্রতিবাদকে সন্ত্রাস দ্বারা দমন করায় কেউই প্রতিবাদ জানানোর সাহস পায়নি; ৮. জার্মানির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আসলে ভালো হয়নি। প্রচার দ্বারা জালিয়াতির আওতায় নেয়া হয়েছিল মাত্র। এভাবে হিটলার তার সর্বাত্মক রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস, ভাইমার রিপাবলিকের (১৯১৯-১৯৩৩) মূল স্পিরিট ছিল জার্মানিতে একটি সংসদীয় রাজনীতি প্রবর্তন করা। জনসাধারণের ভোটাধিকার ও একটি পার্লামেন্ট সেখানে গঠিতও হয়েছিল। কিন্তু হিটলার তা ব্যবহার করেছিলেন তাঁর নিজ স্বার্থে। তাঁর মৃত্যুর পরই জার্মানিতে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র বিকশিত হয়। যদিও সেখানে যুক্তরাষ্ট্রসহ মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর উপস্থিতি (পশ্চিম জার্মানি) ছিল, যা এখনও আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী জার্মানিতে গণতন্ত্র বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে।

যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ

যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের রাজনীতি যদি আলোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে ১৯৪৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত যে সময়সীমা তাতে দু'দুটো ঘটনা ইউরোপের বিকাশমান রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এর একটি হচ্ছে, ১৯৪৯ সালে ন্যাটোর জন্ম ও ১৯৫০ সালে ইউরোপীয় কমিউনিটির গোড়াপত্তন। ন্যাটোর ইতোমধ্যে সম্প্রসারণ হয়েছে, আর ইউরোপীয় কমিউনিটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটি অভিন্ন ইউরোপ এখন আর কল্পনা নয়, বাস্তব। অভিন্ন ইউরোপ বিংশ শতাব্দীতে যেভাবে আলোচিত হয়েছিল, একুশ শতকেও তেমনি আলোচিত হতে থাকবে এবং নয়া বিশ্বব্যবস্থা বিকাশে পালন করবে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা।

ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত কমিউনিটিকে কেন্দ্র করেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের ধারণা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছিল। ১৯৫০ সালে ইউরোপীয় কমিউনিটির গোড়াপত্তন হয়েছিল। ইউরোপীয় কমিউনিটির যাত্রা শুরু হয়েছিল মাত্র ৬টি দেশ নিয়ে, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যান্ড। এই ৬টি দেশ ১৯৫১ সালে নিজ নিজ দেশের সমরাস্ত্র তৈরির শিল্পকারখানাগুলোকে ইউরোপীয় কয়লা, ইস্পাত কমিউনিটি সাথে নিবন্ধন করে। রোম চুক্তির পথ ধরেই ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিউনিটি (ই.ই.সি) ও আণবিক শক্তি কমিউনিটি এই দুই সংগঠনে রূপ নেয়। এক পর্যায়ে ইইসি-কে একটি অর্থনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে ভাবা হলেও নব্বই-এর দশকে এর একটি রাজনৈতিক চরিত্র উন্মোচিত হয়। ইইসির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো জাতিগতভাবে বিভক্ত হলেও, একটি অখণ্ড ইউরোপ গঠনের ব্যাপারে তাদের মধ্যে তেমন বড় ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি। ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর থেকেই ইইসি ইউরোপীয় ইউনিয়ন নাম ধারণ করে।

অভিন্ন ইউরোপ ও ম্যাসট্রিচট চুক্তি

অভিন্ন ইউরোপ গঠনের প্রশ্নে ম্যাসট্রিচট চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না। তৎকালীন ১২ সদস্যবিশিষ্ট ইউরোপীয় গোষ্ঠী হল্যান্ডের ম্যাসট্রিচট শহরে ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছিল, তা ম্যাসট্রিচট চুক্তি নামে পরিচিত। ওই চুক্তিটি ছিল অভিন্ন ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ। ওই চুক্তিতে অভিন্ন বৈদেশিকনীতি ও এক মুদ্রার ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা এক হয়েছিলেন। চুক্তিতে বলা হয়েছিল, একটি অভিন্ন প্রতিরক্ষানীতি ইসিভুক্ত দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য হবে এবং তা ১৯৯৬ সালে প্রণীত ও কার্যকর হবে। একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠনের প্রশ্নেও তারা একমত হয়েছিলেন যা জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট শহরে ১৯৯৯ সাল থেকে কাজ করছে। তবে এখানে সমস্যা ছিল। বলা হয়েছিল ইসিভুক্ত প্রতিটি দেশ যদি এই চুক্তি অনুমোদন না করে, তাহলে ওই চুক্তি তার কার্যকারিতা হারাবে। ডেনমার্কে ১৯৯২ সালের গণভোটে চুক্তিটি বাতিল হয়েছিল। ১৯৯৩ সালের ২৮ জুন পরবর্তীকালে যে গণভোট হয় তাতে চুক্তিটি অনুমোদিত হয়।

অন্যদিকে, ব্রিটেনেও এই চুক্তির ব্যাপারে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছিল। তৎকালীন ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভদের একটা বড় অংশ এই চুক্তির বিরোধী ছিলেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার বরাবরই অভিন্ন ইউরোপের প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করে আসছিলেন। এক ইউরোপীয় মুদ্রার ব্যাপারেও তাঁর বড় ধরনের রিজার্ভেশন ছিল। মার্গারেট থ্যাচারের বিরোধিতার প্রধান কারণ ছিল, এই চুক্তির ফলে ব্রিটেন তার স্বার্থ হারাবে। থ্যাচারের বরাবরই ভয় ছিল জার্মানিকে নিয়ে। অভিন্ন ইউরোপ গঠিত হলে, তার নেতৃত্ব চলে যাবে জার্মানির হাতে। কেননা অর্থনৈতিকভাবে জার্মানি অত্যন্ত শক্তিশালী। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে জার্মানি অভিন্ন ইউরোপের কাঠামোয় প্রভাব বিস্তার করতে চাইতে পারে। ম্যাগি থ্যাচার এজন্যই ব্রিটেনসহ অন্যান্য ছোট ছোট দেশের জন্য বিশেষ সুবিধা দাবি করেছিলেন। ম্যাগি থ্যাচারের এই ভূমিকাও ইসিতে কম বিতর্কিত ছিল না। খোদ কনজারভেটিভ পার্টির মধ্যেও তিনি বিতর্কিত ছিলেন। যে কারণে পার্টির বিরোধিতার মুখে তাঁকে পার্টির নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে হয়েছিল। জন মেজর অবশ্য থ্যাচারের বিরোধিতা করে ম্যাসট্রিচট চুক্তির পক্ষে কথা বলেছিলেন এবং কনজারভেটিভদের একটা বড় অংশ এখন এই চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে। লেবার পার্টির ভূমিকাও অভিন্ন ইউরোপের পক্ষে ছিল। তবে ম্যাসট্রিচট চুক্তি নিয়ে আশঙ্কা ছিল। যখন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তখন ইউরোপের পরিস্থিতি অত খারাপ ছিল না। জার্মানিসহ অন্যান্য দেশের অর্থনীতিতে গতি ছিল। কিন্তু সেই পরিস্থিতি পরে পুরোপুরি বদলে যায়। পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতি 'রিসেশনের' পর্যায়ে অর্থাৎ মন্দার দিকে ছিল। ব্রিটেনের অর্থনীতিতে মন্দাভাব শুরু হয়েছিল সেই ম্যাগি থ্যাচারের সময় থেকেই। ম্যাগি থ্যাচার এবং জন মেজর বিদায় নিলেও, অর্থনীতি তার মন্দাভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বেকারত্ব সেখানে দিনে দিনে বাড়ছিল। ইউরোপের প্রতি ৬ জন লোকের মধ্যে একজন দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছিল। পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাট এ তথ্য আমাদের জানিয়েছিল। আয় বিতরণের উপর পরিচালিত

এই প্যান-ইউরোপীয়ান সমীক্ষায় বলা হয়েছিল যে, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে দারিদ্র্যের হার অবিশ্বাস্যভাবে বাড়ছে। সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ৫ কোটি ৭০ লাখ ইউরোপীয় অর্থাৎ ইউরোপের মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার মধ্যে বসবাস করছে। এই সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ৩ কোটি ৬৪ লাখ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ১৩.৮ শতাংশ লোক দরিদ্র। ইউরোস্ট্যাটের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ইউরোপের উপরের তলার ২০ শতাংশ লোকের আয় এত বেশি যে তা সমাজের নিচের স্তরে অবস্থানকারী ২০ শতাংশ লোকের চেয়ে ৭ গুণ বেশি। আয়ের এই বৈষম্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছিল। অন্যদিকে, জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ২০ শতাংশ লোকের আয় নিচের দিকে অবস্থানকারী ২০ শতাংশ লোকের চেয়ে ৯ গুণ বেশি। ইউরোপীয় কমিশনের (ইসি) কর্মকর্তারা দারিদ্র্যের এই হারকে উদ্বেগজনক বলে অভিহিত করেছিলেন। ডেনমার্কে ব্যাপক সমাজকল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে সেখানে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের হার যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল এবং তা ৬ শতাংশে নেমে এসেছিল। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তাহীন ইউরোপীয় দেশগুলোতে এই হার অনেক বেশি। পর্তুগালে দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি– ২৬ শতাংশ। এরপরে রয়েছে ব্রিটেন ও গ্রীস। এ দুটি দেশে দারিদ্র্যের হার হচ্ছে ২২ শতাংশ।

সমগ্র ইউরোপে গড় বেকারত্বের হার ছিল ১১ শতাংশ। মোট দরিদ্র লোকের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ পরিবার আছে যেখানে অন্তত প্রতি পরিবারের একজন করে লোক কাজ করে। আবার এক-তৃতীয়াংশ দরিদ্র রয়েছে, যারা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এছাড়া মোট সংখ্যার ১৩ শতাংশ হচ্ছে বেকার এবং ১৯ শতাংশ হচ্ছে অকর্মণ্য। দেশে যাদের আয় জাতীয় মাথাপিছু আয়ের অর্ধেকের নিচে, সমীক্ষায় তাদেরকেই দরিদ্র হিসেবে ধরা হয়েছে। ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলোর চেয়ে উত্তরের ধনাঢ্য দেশগুলোতে দারিদ্র্যের হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বেকারত্বের হার জার্মানিতে ১১ শতাংশ, নেদারল্যান্ড ও বেলজিয়ামে ১৩ শতাংশ, ফ্রান্সে ১৪ শতাংশ। অন্যদিকে, ইতালি ও স্পেনে ২০ শতাংশ, গ্রীস ও ব্রিটেনে ২২ শতাংশ এবং পর্তুগালে ২৬ শতাংশ। ইউরোপে ১৬ বা তার নিচের বয়সের ২০ শতাংশ ছেলেমেয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের বাড়িঘরে বাস করে। কিন্তু এই হার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। ডেনমার্কে এই হার ৫ শতাংশ, ফ্রান্সে ১২ শতাংশ, ১৩ শতাংশ জার্মানিতে, ইতালিতে ২৪ শতাংশ, পর্তুগালে ২৮ শতাংশ এবং ব্রিটেনে সর্বোচ্চ ৩২ শতাংশ। সমীক্ষায় এভাবে উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছিল যে, ইউরোপীয় দেশগুলোতে গড় দারিদ্র্যের হার ক্রমশ বাড়ছে যা এসব দেশের সরকারকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল।

ইউরোপের দেশগুলো এখন জার্মানির উত্থান নিয়ে বড় ধরনের ভয়ের মধ্যে আছে। প্রধানত দুটো কারণে জার্মানি সম্পর্কে ইউরোপের অন্যান্য দেশের ভয়। এর একটি তার অর্থনৈতিক শক্তি আর দ্বিতীয়টি তার পুরনো ঐতিহ্য। দুই জার্মানির একীকরণের সময় তাদের যৌথ জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৮৬৫ বিলিয়ন ডলার

(পশ্চিম জার্মানি ৬৯৭ বি: ডলার ও পূর্ব জার্মানি ১৬৮ বি: ডলার)। এই অর্থনীতি শতাব্দী শেষ হবার আগেই, নব্বই–এর মাঝামাঝি সময়ে প্রায় দুই ট্রিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে এই অর্থনীতি অন্যান্য ইউরোপীয় অর্থনীতিকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। এই ভয় এখনও বর্তমান। দ্বিতীয়ত, তাদের পুরনো ঐতিহ্যের কারণে অনেকেই ভীত। জার্মানি একীকরণের ফলে লোকসংখ্যা এখন ৮১ মিলিয়ন। আয়তন ৩,৫৬,৮০৬ কিলোমিটার, অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রায় আড়াই গুণ। জনসংখ্যা, আয়তন ও তাদের রফতানির ক্ষমতা ইসিভুক্ত দেশগুলোর জন্য রীতিমতো এক হুমকিস্বরূপ। এতে করে ডেনমার্ক কিংবা বেলজিয়ামের মতো ছোট ছোট দেশগুলোর ধারণা, অভিন্ন ইউরোপের চুক্তির ফলে ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। ইউরোপের ঐতিহ্য বেশ পুরনো। এখানে জার্মানদের সাথে যেমন ফরাসি জাতির যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বের ইতিহাস রয়েছে, তেমনি এটাও সত্য, এখানে ডেনিস, আইরিশ, ফ্লেমান (বেলজিয়াম) জাতি পাশাপাশি শত বছর ধরে বসবাস করে আসছে। এক ইউরোপের ফলে ছোট ছোট জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটবে এবং সেখানে আগামী শতাব্দীতে এক নতুন শংকরজাতির উদ্ভব ঘটবে। রক্ষণশীলরা এটা সহজভাবে গ্রহণ করতে চাইছেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর আরো একটি ভয়ের কারণ হচ্ছে, গত ৫০ বছরের ইতিহাসে তাদের দেশে ছোটখাটো পুঁজিপতির জন্ম হয়েছে। এসব পুঁজিপতি তাদের দেশের স্বার্থে আন্তর্জাতিক আসরে প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। এখন এক ইউরোপ গঠনের ফলে বড় অর্থনীতির পুঁজিপতিদের তথা বহুজাতিক সংস্থার কাছে এসব ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা হেরে যাবে, তারা আর দাঁড়াতে পারবে না। এতে করে ছোট ছোট জাতির জাতীয় স্বার্থও বিঘ্নিত হবে। সুতরাং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এটা চাইছেন না।

শেঙেন চুক্তি

২০০০ সালের ১৬ মার্চ বেলজিয়াম, জার্মানি, ফ্রান্স, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল ও স্পেন এই দেশগুলো শেঙেন চুক্তি চালু হবার দশ বছর পূর্ণ করে। ইউরোপের ক্রমবিকাশে এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে। এর ফলে অবশেষে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে (আপাতত সীমিতসংখ্যক কতকগুলো দেশে) অবাধ যাওয়া-আসা সম্ভব হয়েছে। বিগত দশ বছর যাবৎ শেঙেন দেশগুলোর সাধারণ সীমানায় জল, স্থল ও আকাশপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। এমনকি কোনো তৃতীয় দেশের নাগরিকরা বৈধ কাগজপত্রসহ তিনমাস পর্যন্ত শেঙেনভুক্ত দেশগুলোর বহিঃসীমানার অন্তর্গত অঞ্চলে বিনা বাধায় যাতায়াত করতে পারেন।

ইউরোপের অধিবাসীদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করার উদ্দেশ্য নিয়েই শেঙেন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। অনেক কঠিন প্রয়াসের ফল ছিল ওই চুক্তি। জার্মানির সাবেক চ্যান্সেলর হেলমুট কোল ও তদানীন্তন ফরাসি রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া মিতেরা-এর উদ্যোগে ১৯ জুলাই, ১৯৮৪ তারিখ থেকে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে সীমানা নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করে

দেয়া হয়। এই উদ্যোগের ভিত্তিতেই ১৪ জুলাই, ১৯৮৫ তারিখে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবুর্গ, ফ্রান্স ও জার্মানি প্রথম শেঙেন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় (লুক্সেমবুর্গের শেঙেন শহরে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল)। ওই ঘটনার পাঁচ বছর পরে ১৯ জুন ১৯৯০ ওই চুক্তি চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ই.ইউ-এর অন্তর্ভুক্ত যে-সব দেশ ইউরোপীয় কমিউনিটির '৮এ' অনুচ্ছেদটি অনুসরণ করতে আগ্রহী সেগুলোও ক্রমশ শেঙেন চুক্তিতে অংশগ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৯৯০-এর নভেম্বর মাসে ইতালি, ১৯৯১-এর জুন মাসে স্পেন ও পর্তুগাল, ১৯৯২-এর নভেম্বরে গ্রীস এবং ১৯৯৬-এর এপ্রিলে অস্ট্রিয়া শেঙেন চুক্তিতে অংশগ্রহণ করে। ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও সুইডেন পরবর্তীকালে ওই চুক্তিতে যোগদান করে।

শুধু স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরাই নয়, শেঙেন একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও বটে। শেঙেন মডেলের আকর্ষণের মূল কারণ দুটি। মোটামুটিভাবে শেঙেন-এর উদ্দেশ্য

(১) সাধারণ সীমানায় নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দেয়া, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন কিছু পদক্ষেপ নেয়া, যার ফলে একটি দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়,

(২) শেঙেন অঞ্চলের বহিঃসীমানায় সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ চালু থাকবে, কিন্তু কোনো মতেই মানুষের আনাগোনা বন্ধ করে নয়।

ইতোমধ্যে শেঙেন চুক্তির আরো পরিধি বেড়েছে। এই শেঙেন চুক্তি ছিল অভিন্ন ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে বড় ধরনের অগ্রগতি। এখানে ইউরোপের অভিন্ন মুদ্রা 'ইউরোর' কথাও আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ইউরোর চালু হয়েছে। তৎকালীন ১৫টি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের মাঝে ১১টিতে এই মুদ্রা চালু করা হয়েছিল। ওই সময়ে যেসব দেশে 'ইউরো' চালু করা হয়েছিল, সেই দেশগুলো হচ্ছে অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল ও স্পেন। ব্রিটেন ইউরো গ্রহণ করেনি। শতাব্দীর শেষ দিন পর্যন্ত ডেনমার্ক ও সুইডেন তাদের দেশের মুদ্রা বহাল রেখেছিল। ডলারের বিপরীতে এক ইউরোপ মুদ্রামান ধরা হয়েছিল ১ ডলার ১৭ সেন্ট। ইউরো চালু হবার সিদ্ধান্ত হলেও প্রথম তিন বছর নিজ দেশের মুদ্রাও চালু থাকে।

২০০২ সালের ১ জানুয়ারি ইউরো সর্বত্র প্রচলন হয় এবং অন্যান্য মুদ্রা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বলা হচ্ছে ওই ১১টি দেশের দায়-দেনা ও মূলধন বাজার মিলে একটি একক নতুন মূলধন বাজার সৃষ্টি হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলধন বাজার। দ্বিতীয় বৃহত্তম শেয়ার ইক্যুইটি বাজার হবে 'ইউরোল্যান্ড', যেখানে রয়েছে ২৭০০'র বেশি তালিকাভুক্ত কোম্পানি। আরও আছে ২৭০০০০ কোটি মার্কিন ডলার সমমানের বাজার মূলধন। বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, 'ইউরো' চালু হওয়ার ফলে ৫০০০০ কোটি থেকে ১ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের শেয়ার ইউরোতে আসবে। এরই মধ্যে ইউরো ডলারের পাশাপাশি আরেকটি আন্তর্জাতিক মুদ্রায় পরিণত হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আওতাধীন ইউরোপে যে কটি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে, সেসব প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে।

সারণি-২

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর জাতীয় বৈশিষ্ট্যাবলি

দেশ	মোট জাতীয় উৎপাদন (১৯৯২, ডলার)	মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (১৯৯২, ডলার)	জনসংখ্যা (২০০০ সালের হিসাব অনুযায়ী)	PQLI বা জীবনযাত্রার বাস্তবসম্মত মান
জার্মানি	১৮৭৭ ট্রিলিয়ন)	২৩,৩৬০ (হাজার)	৮১.৭ মিলিয়ন	৯৮
ফ্রান্স	১২৯৬	২২,৬৩০	৫৯.০	৯৯
ইতালি	১১৮৭	২০,৭৯০	৫৭.৩	৯৮
ব্রিটেন	১০৪৬	১৮,১১০	৫৯.০	৯৮
স্পেন	৫৬১ (বিলিয়ন)	১৪,২৩০	৩৯.৮	৯৮
নেদারল্যান্ড	৩১৬	২০,৮৫০	১৫.৯	১০০
বেলজিয়াম	২১৪	২১,৩৬০	১০.২	৯৮
অস্ট্রিয়া	১৭৮	২২,৭৯০	৮.১	৯৭
ডেনমার্ক	১৩৬	২৬,৩১০	৫.২	৯৮
ফিনল্যান্ড	১১৪	২২,৬৯০	৫.২	৯৯
পর্তুগাল	৭৪	৭,৩৯০	১০.৬	৯৭
আয়ারল্যান্ড	৪৫	১২,৮৫০	৩.৫	৯৭
লুক্সেমবুর্গ	১৪	৩৫,০০০	০.৪	৯৮

সূত্র : Human Development Report 1995 (New York, Oxford University Press, 1995)। জীবনের বাস্তবসম্মত মান বা Physical Quality of Life Index-এর তথ্যাবলি নেয়া হয়েছে Foreign Policy and Developing Countries (Washington DC Overseas Development Council, 1991) থেকে।

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির আগপর্যন্ত ৬২৬ সদস্যবিশিষ্ট ইউরোপীয় পার্লামেন্ট (European Parliament) ১৯৭৯ সাল থেকে প্রত্যক্ষ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে আসছে। পার্লামেন্টের অধিবেশন সাধারণত ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গে বসে, তবে এর সচিবালয় লুক্সেমবুর্গ ভিত্তিক। ৩৭ কোটি জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী এ পার্লামেন্ট হলো ই.ইউ-এর প্রধান রাজনৈতিক চালিকাশক্তি। উন্নয়ন ও নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর প্রধান কাজ। এছাড়া পার্লামেন্ট ইউরোপীয় কমিশন অনুমোদন ও নিয়োগ, ইউরোপীয় নীতিমালা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ, তদন্ত কমিটি গঠন, ইউনিয়নের নাগরিকদের আবেদনের শুনানি গ্রহণ, ন্যায়পাল নিয়োগ, বাজেট অনুমোদন ও বাস্তবায়ন তদারক করে।

ইউরোপীয় কাউন্সিল ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় কাউন্সিল (European Council) সদস্য রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান ও ইউরোপীয় কমিশনের

প্রেসিডেন্টকে নিয়ে গঠিত। বছরে দুবার এ সংস্থার অধিবেশন বসে। ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের প্রেরণা যোগান এবং বৃহত্তর দিকনির্দেশনা প্রদান কাউন্সিলের দায়িত্ব।

কাউন্সিল প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রের মন্ত্রিপর্যায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কাউন্সিল (The Council) গঠিত। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীও প্রতিষ্ঠানের বৈঠকে যোগ দেন। ব্রাসেলসে সদর দফতর অবস্থিত হলেও কাউন্সিলের কিছু বৈঠক লুক্সেমবুর্গে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সদস্যই পর্যায়ক্রমে ৬ মাসের জন্যে কাউন্সিলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। ইউরোপীয় ঐক্য চুক্তির উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবায়ন সদস্যরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা, অভিন্ন পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তানীতির ক্ষেত্রে অভিন্ন অবস্থান নির্ধারণ ও যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ, বিচার ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সুপারিশক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ এর দায়িত্ব।

ইউরোপীয় কমিশন ইউরোপীয় কমিশনে (Europen Commission) ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন ও যুক্তরাজ্যের ২ জন করে ও বাকি সদস্যরাষ্ট্রসমূহের একজন করে সদস্য রয়েছে। নিজ নিজ জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে সদস্যরা শুধু ইইউ-এর স্বার্থে কাজ করেন। কমিশন হচ্ছে চুক্তিসমূহের প্রথম ও প্রধান অভিভাবক। কোনো চুক্তির ধারা বা মর্মার্থের সঠিক প্রয়োগ ঘটছে কিনা নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশন তা পর্যবেক্ষণ করে। কমিশন কোনো চুক্তিভঙ্গকারী সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং প্রয়োজনে নিষ্পত্তির জন্যে বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে প্রেরণ করতে পারে।

ইউরোপীয় আদালত ১৫ সদস্যবিশিষ্ট লুক্সেমবুর্গভিত্তিক ইউরোপীয় আদালত (Court of Justice) ও ১৫ সদস্যবিশিষ্ট প্রথম দৃষ্টান্ত আদালত (Court of First Instance) ইউরোপীয় চুক্তিসমূহ বিদ্যমান আইনের শর্ত মোতাবেক সম্পাদিত হবার নিশ্চয়তা ও প্রয়োজনে এসব আইনের ব্যাখ্যা দেয়। ইউরোপীয় আদালতের রায় সদস্যরাষ্ট্রের সকলে পালন করতে বাধ্য।

নিরীক্ষক দফতর : পার্লামেন্টের সাথে পরামর্শক্রমে কাউন্সিল সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিরীক্ষক দফতরের (Court of Auditors) অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ দান করে। আর কয়লা ও স্টিল বিষয়ে পরামর্শ দান করে ইসিএসই পরামর্শ কমিটি (ECSE Consultative Committee)।

আঞ্চলিক কমিটি : শিক্ষা, যুবশক্তি, সংস্কৃতি, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি আঞ্চলিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাউন্সিল অথবা কমিশন ২২২ সদস্যবিশিষ্ট আঞ্চলিক কমিটির (Committee of the Regions) পরামর্শ গ্রহণ করে।

ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক : ১৯৫৮ সালে স্বাক্ষরিত রোম চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক (European Investment Bank) ই.ইউ-র লক্ষ্য অর্জনের জন্যে অর্থ বিনিয়োগ করে।

ইউরোপীয় মুদ্রা ইন্সটিটিউট ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক মুদ্রা চালু করার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (European Central Bank). প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৪ সাল

থেকে ইউরোপীয় মুদ্রা ইন্সটিটিউট (European Monetary Institute) এ লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। উল্লেখ্য, ই.ইউ-র সদস্য দেশের সংখ্যা বেড়েছে। ফলে ই.ইউ-র আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যসংখ্যাও তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। নতুন নতুন দেশ ই.ইউ-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নতুন শতাব্দীর প্রথম দিকে, অর্থাৎ ২০০১ সালের পর।

ন্যাটোর সম্প্রসারণ

অভিন্ন ইউরোপ আলোচনা করলে সংগতকারণেই ন্যাটোর সম্প্রসারণের প্রশ্নটি এসে যায়। পূর্ব ইউরোপের সাবেক ওয়ারশভুক্ত অনেক দেশই এখন ন্যাটোর সদস্য। রাশিয়া এখনও পূর্ণসদস্য নয়। ১৯৯৭ সালের ২৭ মে এক চুক্তি বলে (প্যারিসে) রাশিয়াকে ন্যাটোতে পরামর্শকের একটি ভূমিকা দেয়া হয়েছে। তবে রাশিয়াতে ন্যাটোর সম্প্রসারণ নিয়ে অনেকেই অখুশি। বরিস ইয়েলৎসিন প্যারিসে এই চুক্তি স্বাক্ষর করলেও ন্যাটোর সম্প্রসারণের প্রশ্নে যে বিতর্ক চলে আসছিল তার অবসান হয়নি। ন্যাটোর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ বড় ধরনের বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল রাশিয়াতে। রাশিয়ার বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা যুগানভ ও উগ্রজাতীয়তাবাদী নেতা ঝিরিনোভস্কি ন্যাটোর সম্প্রসারণ, রাশিয়ার সীমান্তে ন্যাটোর উপস্থিতি এবং ন্যাটোতে রাশিয়ার যোগদানের বিরোধিতা করে আসছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে। এমনকি রাশিয়ার জনমতের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করে প্রয়াত ইয়েলৎসিন নিজেও বারে বারে ন্যাটোর পরিকল্পনার বিরোধিতা করে আসছিলেন। কিন্তু ক্রমবর্ধমান মার্কিনি চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত ইয়েলৎসিনকে নতিস্বীকার করতে হয়েছিল। তিনি রাজি হয়েছিলেন। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এর আগে *'পার্টনারশিপ ফর পিস'*-এর আওতায় রাশিয়াকে ন্যাটোর সাথে সম্পর্কিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইয়েলৎসিন রাজি ছিলেন না ওই প্রস্তাবে। ধীরে ধীরে ক্লিনটন তাঁর প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে গেছেন। এক সময়ের ওয়ারশ জোটের সদস্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকেও তিনি উদ্বুদ্ধ করেন ন্যাটোতে যোগ দিতে। প্রথমে পোল্যান্ড, চেক রিপাবলিক ও হাঙ্গেরিকে ন্যাটোর সদস্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই তিনটি দেশ ১৯৯৯ সালে এই সংস্থায় যোগ দেয়। এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকেও ন্যাটোর সদস্যপদ দেয়া হয়।

পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর এই সম্প্রসারণ তিনটি স্তরে পরিচালিত হয়। প্রথম স্তরে রয়েছে ন্যাটোর পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রগুলো। নতুন সদস্যপদ পাওয়া রাষ্ট্রগুলোকেও এই স্তরে ফেলা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে এমন কিছু দেশ, যারা ন্যাটোর সদস্য হবে না। অথচ ন্যাটোর সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শান্তির জন্য সহযোগিতা শীর্ষক একটি চুক্তিতে তারা আবদ্ধ হয়েছে। আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ার মতো সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলো এই চুক্তির আওতায়। সর্বশেষ স্তরে রয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন, যাদের সাথে ন্যাটোর আলাদা চুক্তি রয়েছে। এই চুক্তির বলে ন্যাটোর প্রতিনিধিরা এই দুটো দেশের রাজধানীতে থাকবেন। ন্যাটোর সদর দফতর ব্রাসেলস-এ এই দুটো দেশের প্রতিনিধিরা থাকবেন বটে, তবে ন্যাটোর সিদ্ধান্তে এরা 'ভেটো' দিতে পারবেন না।

পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর ন্যাটো তার পূর্বসীমান্ত সম্প্রসারণের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে লক্ষ্যে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে ন্যাটোর সদস্যপদ দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ন্যাটো জোটের এই সম্প্রসারণের জন্য মূলত তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক, ন্যাটোর সম্প্রসারণ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জোটকে শক্তিশালী করবে। এককভাবে প্রতিরক্ষার চেয়ে যৌথ প্রতিরক্ষা ভালো। ন্যাটোর সম্প্রসারণের অর্থ সমমনা রাষ্ট্রগুলোর গভীর সম্প্রসারণ, যারা জাতিগত সংঘাত, আঞ্চলিক আগ্রাসন এবং ব্যাপক বিধ্বংসী ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রের প্রসারসহ নতুন বিশ্বের হুমকি থেকে একে অপরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ন্যাটোর সামরিক ক্ষমতাকে খর্ব করবে কিনা কেউ কেউ এ প্রশ্ন করেছেন। এর জবাব নেতিবাচক। ন্যাটোর প্রত্যেকটি নতুন সদস্য দেশ কেবল নিরাপত্তা ভোগ করবে না, এক্ষেত্রে অবদানও রাখবে। এর অর্থ হলো তাদের বাহিনীগুলো ন্যাটোর বাহিনীগুলোর পাশাপাশি যুদ্ধ করতে এবং ন্যাটোর ভূখণ্ড রক্ষা করতে সক্ষম হবে। দুই, ন্যাটোর সম্প্রসারণ ইউরোপে গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক সুফলগুলো রক্ষায় সহায়ক হবে। ন্যাটোর সদস্যপদ নতুন গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে একবিংশ শতাব্দীতে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠার ব্যাপারে নিরাপত্তা দেবে– যেমন অতীতে ন্যাটোর সদস্যপদ জার্মানি, ইতালি ও স্পেনের মতো পশ্চিম ইউরোপীয় দেশকে তাদের শক্তিশালী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সুসংহত করার ব্যাপারে নিরাপত্তা যুগিয়েছিল। তিন, ন্যাটোর সম্প্রসারণ সম্ভাব্য দেশগুলোকে তাদের মধ্যকার মতপার্থক্য শান্তিপূর্ণভাবে নিরসনে উৎসাহিত করবে। অতীতে ন্যাটোর সদস্য ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে এবং গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে উত্তেজনা নিরসনে এই সংস্থাটি সহায়তা করেছিল। অতীতে ন্যাটোর খোলা দুয়ারনীতি মধ্য ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকে তাদের বিগত দিনের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে, স্থিতিশীল সীমান্ত নিশ্চিত করতে, সহযোগিতার প্রসার ঘটাতে, জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে তাদের অভিন্ন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিতে কয়েকটি নজিরবিহীন চুক্তি সম্পাদনে জোরালো প্রেরণা যুগিয়েছিল। যেমন, ১৯৯৪ সালের পোল্যান্ড-লিথুনিয়া চুক্তি, ১৯৯৬ সালের হাঙ্গেরি-স্লোভাকিয়া চুক্তি, পোল্যান্ড ও ইউক্রেনের মধ্যে কয়েকটি চুক্তি এবং ১৯৯৬ সালে হাঙ্গেরি ও রুমানিয়ার মধ্যকার চুক্তি।

ন্যাটোর এই সম্প্রসারণে ব্যয় ধরা হয়েছিল সাড়ে তিন হাজার কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর এজন্য ২০ কোটি ডলার দেয়। এজন্য সময় লাগবে ১২ বছর। এসব দেশের সশস্ত্রবাহিনীর উন্নয়ন, এদেরকে ন্যাটো কমান্ডের আওতায় আনা, এবং নাটোর যৌথ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে প্রতিবছর ২১০ থেকে ২৭০ কোটি ডলার ব্যয় হবে। এই ব্যয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ দেবে নয়া সদস্যভুক্ত দেশগুলো, ৫০ ভাগ দেবে জোটভুক্ত অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো, আর যুক্তরাষ্ট্র দেবে শতকরা ১৫ ভাগ। ন্যাটো সম্প্রসারণে রুশ বিরোধিতা নমনীয় করার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র একটি যৌথ ন্যাটো রাশিয়া শান্তিরক্ষী ব্রিগেড গঠনের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু রাশিয়ার সমর্থন তাতে পাওয়া যায়নি।

ন্যাটো কার্যক্রমে রাশিয়ার অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে গুরুত্বের দাবি রাখে। প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় সরকার প্রধানরা স্নায়ুযুদ্ধকে চিরতরে কবর দিয়েছিলেন এবং ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়াল্টা চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপের যে বিভক্তি সৃষ্টি করা হয়েছিল তা মুছে ফেলা হয়েছিল। এখানে বলে রাখা ভালো যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে দুই বৃহৎশক্তি, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল দুটি সামরিক জোট- ন্যাটো ও ওয়ারশ। ১৯৪৯ সালের ২৪ আগস্ট ন্যাটো বা North Atlantic Treaty Organization (NATO) আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে, ওয়ারশ বা Warsaw Treaty Organization-র জন্ম হয় ১৯৫৫ সালের ১৪ মে। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিল ওয়ারশ প্যাক্ট, যার নেতৃত্বে ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। অন্যদিকে, পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী তথা গণতান্ত্রিক দেশগুলো গঠন করেছিল ন্যাটো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল এর নেতৃত্বে।

দুটো সামরিক জোট গঠনেরও একটা প্রেক্ষাপট আছে। ন্যাটো সামরিক জোট গঠনের পেছনে কাজ করেছিল সোভিয়েত আগ্রাসন রোধ তথা সমাজতন্ত্রের প্রসার রোধ করার ব্যাপারটি। এখানে অবশ্য ট্রুম্যান ডকট্রিন ও মার্শাল প্লান-এর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালে ট্রুম্যান ডকট্রিনের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজতন্ত্রের প্রসার ঠেকানো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গ্রিস ও তুরস্কে কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়ছিল। এই প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে এলো। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান (১৯৪৫-১৯৫৩) কংগ্রেসের কাছে প্রেরিত বার্তায় বলেছিলেন, যে সকল স্বাধীন জনগণ সশস্ত্র সংখ্যালঘু বা বহিরাগত চাপের মারফত পদানত করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে সচেষ্ট, যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হবে তাদের সমর্থন করা। ট্রুম্যানের নীতির কারণেই ওয়াশিংটন-মস্কো সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯৫২ সালে গ্রীস ও তুরস্ক ন্যাটোতে যোগ দেয়। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের এই নীতি আর্থিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য ১৯৪৭ সালের জুন মাসে তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট ঘোষণা করেছিলেন যে, ইউরোপের পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করবে। কিন্তু পূর্ব ইউরোপ মার্শাল প্লান পরিত্যাগ করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ট্রুম্যান ডকট্রিন, মার্শাল প্লান আর ন্যাটো সামরিক জোট গঠন করে পশ্চিম ইউরোপে সমাজতন্ত্র বিরোধী একটা জোট গড়ে তুলেছিল, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নই পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে নিয়ে ওয়ারশ সামরিক জোট গড়ে তোলে। তবে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল 'কমিকন' বা Council for Mutual Economic Assistance গঠন করে। এটি গঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ২৫ জানুয়ারি। উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্য ও আর্থিক সহযোগিতা বাড়ানো।

দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর এই দুটি জোট ইউরোপের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি এক পর্যায়ে ইউরোপকে কেন্দ্র করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি আশঙ্কার জন্ম হয়েছিল। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৮৫ সালে গরবাচেভ ক্ষমতায় যাবার আগ পর্যন্ত ইউরোপে ন্যাটো ও ওয়ারশ জোটের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছিল ও উভয় বৃহৎশক্তি,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এখানে তাদের পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। ন্যাটো তার যাত্রা শুরু করেছিল ১২টি দেশ নিয়ে। এ দেশগুলো হচ্ছে বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ব্রিটেন, আইসল্যান্ড, ইতালি, কানাডা, লুক্সেমবার্গ, হল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল ও যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৫২ সালে যোগ দেয় গ্রিস ও তুরস্ক। জার্মানি (পশ্চিম জার্মানি) ন্যাটোর সদস্যপদ গ্রহণ করে ১৯৫৫ সালে। আর স্পেন ১৯৮২ সাল থেকে ন্যাটোর সদস্য। তবে মধ্যখানে ১৯৬৬ সালে ফ্রান্স ন্যাটোতে থেকেও ন্যাটোর সামরিক কার্যক্রমে তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। অন্যদিকে, জন্মলগ্নে ওয়ারশ প্যাক্টের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮। এ দেশগুলো হচ্ছে বুলগেরিয়া, চেকোশ্লাভিয়া, পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গেরি ও আলবেনিয়া। ১৯৬৮ সালে আলবেনিয়া ওয়ারশ প্যাক্ট থেকে বেরিয়ে যায়। এই সংস্থায় মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েতনামকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। মধ্য আশির দশক পর্যন্ত দুই জোটের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বাড়লেও গরবাচেভ ক্ষমতায় এসে অস্ত্র প্রতিযোগিতা কমিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেন। তিনি ক্ষমতায় এসে এক ইউরোপ অর্থাৎ Common European Home-এর তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। গরবাচেভ ইউরোপের বিভক্তি মেনে নেননি। তিনি এক ইউরোপ দেখতে চেয়েছিলেন। গরবাচেভ ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়েই ওয়ারশ জোট ভেঙে দিয়েছিলেন। কিন্তু ন্যাটো জোটকে ভেঙে দেয়া হয়নি।

ন্যাটোতে রাশিয়ার সদস্যপদ না পাওয়ায় নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এক, রাশিয়া এখন ন্যাটোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারবে? দুই, পূর্ব ইউরোপ তথা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের রিপাবলিকগুলোর ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্তি রাশিয়া ঠেকাতে পারবে কিনা? তিন, রাশিয়াতে অভ্যন্তরীণভাবে যে বিরোধিতা দানা বাঁধছে, তা পুতিনের পক্ষে ঠেকানো সম্ভব হবে কিনা? ন্যাটোর সাথে রাশিয়ার যে চুক্তি হয়েছে, তাতে রাশিয়াকে দেয়া হয়েছে পরামর্শকের মর্যাদা। অর্থাৎ এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাশিয়া থাকছে না। ন্যাটো আগামীতে যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, তাতে রাশিয়ার সরাসরি অংশগ্রহণ থাকছে না। এমনকি রাশিয়া ন্যাটোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভেটোও দিতে পারবে না এবং ন্যাটো তার পূর্বমুখী সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেবে। একটি যৌথ কাউন্সিল গঠন করার কথা চুক্তিতে আছে, যা কিনা গঠিত হয়নি। এই যৌথ কাউন্সিলের ভূমিকা কি হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এগুলো বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, ন্যাটোতে পূর্ব ইউরোপের কটি দেশের অন্তর্ভুক্তকরণের মধ্য দিয়ে লাভ হলো পশ্চিমা বিশ্বের। রাশিয়া তেমনভাবে লাভবান হবে বলে মনে হয় না। পশ্চিমাগোষ্ঠী এখন রাশিয়াকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করবে। পশ্চিমাগোষ্ঠীর লাভ একাধিক। এক, অস্ত্র সীমিতকরণের পরও রাশিয়ার কাছে কিছু পারমাণবিক অস্ত্র থেকে গিয়েছিল। এই অস্ত্রের কিছু অংশ তাক করা ছিল ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর দিকে। রাশিয়া সেই সব অস্ত্র প্রত্যাহার করে নিতে সম্মত হয়েছিল। ফলে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর ভয়টা আর থাকল না। দুই, জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ও ন্যাটোর শক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে রাশিয়া কখনো-সখনো আপত্তি তুলেছিল। সেই সমস্যাটা আর থাকছে না। তিন, শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী এখন

প্রয়োজনে মোতায়েন করা যেতে পারে। চার, রাশিয়ার নেতৃত্বে বিকল্প জোট গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ পুরোপুরি সফল হয়েছে এটা বলা যাবে না। ন্যাটোতে রাশিয়ার 'পরামর্শকের' ভূমিকায় রাশিয়া খুশি নয়। বরং রাশিয়ার সীমান্তে ন্যাটোর সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে রাশিয়া উদ্বিগ্ন। বিংশ শতাব্দীর শেষদিনগুলোতে রাশিয়ার এই উদ্বিগ্নতা যতটা না প্রকাশ পেয়েছে, একুশ শতকের শুরুতে নতুন করে এক ধরনের বৈরিতার সৃষ্টি হয়েছে।

উপসংহার

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের রাজনীতিতে তাই ইউরোপ একটি শক্তি হিসেবে আর্বিভূত হচ্ছে। আগামি দিনে ইউরোপের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। তবে ন্যাটোর সম্প্রসারণের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে তার স্বার্থ ও কৌশল বজায় রাখতে আরো সচেষ্ট হবে। ইতোমধ্যে ওই কৌশলের অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো ন্যাটো বাহিনীকে ইউরোপের বাইরে আফগানিস্তানে মোতায়েন করা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, ঢাকা, ২০০২
২. আবদুল হালিম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৮৬
৩. প্রাণগোবিন্দ দাশ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কলিকাতা, ১৯৮৯
৪. অতুল চন্দ্র রায়, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৯৬
৫. তারেক শামসুর রেহমান, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ঢাকা, ১৯৯৯
৬. Peter Calvocoressi, World Politics Since 1945, New York, 1982
৭. Charles W. Eegley Jr. and Eugene R. Wittkopf, World Politics, Trend and Transformation, New York, 1985
৮. Richard Goff, Walter Moss, Janice Terry, Jiu-Hwa Upshur, the Twentieth Century-A Brief Global History, 5 Edition, New York, 1998

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূর্ব ইউরোপ

Both Russians and Americans tended to view ideology more as a justification for action than as a guide to action; both, as they showed during world War II were capable of subordinating ideological differences to pursue common interests where those existed.

John Lewis Gaddis, 1983

বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল, সেই যুদ্ধ ইউরোপকে কৃত্রিমভাবে দুভাগে ভাগ করেছিল। একভাগ পূর্ব ইউরোপ, অন্যভাগ পশ্চিম ইউরোপ। এই বিভক্তিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সেখানে দুধরনের সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। একদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অন্যদিকে বাজার অর্থনীতিনির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতেই আমরা প্রত্যক্ষ করলাম এই কৃত্রিম বিভক্তির অবসান। ধর্মীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ কিংবা জীবনধারায় একসময় যে ইউরোপ এক ছিল, আজ একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পতাকাতলে সেই ইউরোপ আবার এক হতে চলেছে। তবে নিঃসন্দেহে দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছরের যে ইউরোপ এই বিভক্তি প্রত্যক্ষ করেছে, তা ইতিহাসের অংশ এবং বিশ্বরাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটাকে অস্বীকার করা যাবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব আদর্শিক দ্বন্দ্বে দুটি মেরুতে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিয়ে উদার গণতান্ত্রিক বিশ্ব, অপরটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব। এই বিভক্তি সম্ভব হয়েছিল ১৯৪৫ সালে ক্রিমিয়ায় অনুষ্ঠিত একটি শীর্ষ সম্মেলনে। ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন। এরা ছিলেন বিশ্বযুদ্ধের মিত্রপক্ষ। ওই শীর্ষ সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল ইউরোপের দ্বিধাবিভক্তি, পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপ।

স্নায়ুযুদ্ধের টানটান উত্তেজনার মধ্যে দুই বিশ্বে জন্ম নেয় দুটি সামরিক জোট ন্যাটো (১৯৪৮ সালের ৪ এপ্রিল) ও ওয়ারশ (১৯৫৫ সালের ১৪ মে)। পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে যে সমাজতন্ত্রের বিকাশ হয় তা এতটাই প্রবল ছিল যে

পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে একদলীয় শাসন কায়েম হয়। বেড়ে যায় সোভিয়েত আধিপত্য আর আগ্রাসন। এই আধিপত্যবাদদের কবল থেকে মুক্তির জন্য আশির দশকের শেষ দিকে পূর্ব ইউরোপ জুড়ে দাবি ওঠে গণতন্ত্রের। গণতন্ত্রের এই দাবির কাছে ধরাশায়ী হয় পূর্ব ইউরোপের অনেক জাঁদরেল নেতা। পতন ঘটেছিল পূর্ব জার্মানির ১৩ বছরের কমিউনিস্ট শাসক এরিক হোনেকারের, ২০ বছরের চেকোশ্লোভাকিয়ার শাসক গুস্তাভ হুসাকের, ২২ বছরের রুমানিয়ার শাসক চসেস্কুর, ৪৩ বছরের হাঙ্গেরির শাসক ইয়ানুস কাদার এবং ৪৫ বছরের বুলগেরিয়ার সিভকভের। এরা ছিলেন স্ব স্ব দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান। কখনো সরকার প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা পার্টি প্রধান হিসেবে এরা মূল ক্ষমতা পরিচালনা করে গিয়েছিলেন। ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপের পরিবর্তনের এই ধারাকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা *“ভেলভেট রেভ্যুলেশন”* হিসেবে আখ্যা দেন। রক্তপাতহীন এক শান্তিপূর্ণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেখানে একে একে সমাজতান্ত্রিক একদলীয় সরকারগুলোর পতন ঘটতে থাকে। ভেঙে ফেলা হয় বার্লিন দেয়াল। পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় ভেঙে খান খান হয় সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব, জন্ম হয় একমেরুকেন্দ্রিক নয়া বিশ্বব্যবস্থার।

পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আধিপত্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে পূর্ব ইউরোপের ১২০ মিলিয়ন জনসাধারণ সোভিয়েত সাম্যবাদের প্রভাবাধীন ছিল। পূর্ব জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক মতাবলম্বী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে। ১৯৪৫ সালে রুমানিয়ার অধিপতি মাইকেল সাম্যবাদী মন্ত্রীসভা নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বল্পকালের মধ্যে রুমানিয়ায় সমাজতান্ত্রিকরা সকল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পোল্যান্ডেও সোভিয়েত প্রভাবধীন সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় ভবিষ্যতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিরক্ষা জোট গঠন করতে আগ্রহী ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তার জন্য এই স্থান তার প্রভাবাধীন রাখতে চেয়েছিল। তাছাড়া পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক সাহায্য, কারিগরি সাহায্য ও বিভিন্ন কাঁচামাল তাদেরকে অল্পমূল্যে সরবরাহ করত। এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র তথা তার আধিপত্য বিস্তারের জন্য এরূপ নানা কৌশল অবলম্বন করেছিল।

প্রেক্ষাপট

ক্রিমিয়ার সম্মেলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব ইউরোপের প্রতিটি দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনপুষ্ট সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও, সেখানে ভেতরে ভেতরে সোভিয়েত বিরোধিতা লক্ষ করা গিয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরিতে ও ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লাভাকিয়ার ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এমনকি অধুনালুপ্ত যুগোশ্লাভিয়ার কথাও উল্লেখ করা যায়। যুগোশ্লাভিয়ার সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান টিটো (১৯৪৪-১৯৮০) একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু টিটোই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সোভিয়েত আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সোভিয়েত ব্লক থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এমনকি আলবেনিয়ার শাসক আনোয়ার হোজ্জার কথাও আমরা উল্লেখ করতে পারি। সোভিয়েত আধিপত্যবাদের

সমালোচনা করেছিলেন তিনি এবং ১৯৬৮ সালে ওয়ারশ সামরিক চুক্তি থেকে আলবেনিয়াকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারপরও বাকি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সোভিয়েত আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বজায় ছিল। ওয়ারশ জোটের পক্ষ থেকে প্রতিটি পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রে সোভিয়েত সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল এবং ওইসব দেশের সেনাবাহিনীকে ওয়ারশ জোটের সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে আনা হয়েছিল। আর ওয়ারশ জোটের নেতৃত্ব দিতেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন জেনারেল। এখানে *'ব্রেজনেভ ডকট্রিন'*-এর কথা উল্লেখ করা যায়। সাবেক সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভের (১৯৬৪-১৯৮২) নামানুসারে এই মতবাদের জন্ম। ওই মতবাদের মূলকথা ছিল সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব যদি সমাজতান্ত্রিক বিরোধী কোনো শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এই 'ডকট্রিন' বা মতবাদের প্রতিফলন ঘটেছিল ১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরিতে, ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লাভাকিয়ায় আর ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে। হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লাভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবের বাইরে গিয়ে স্বাধীন নিরপেক্ষ একটি নীতি গ্রহণ করলে, সেখানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে। আফগানিস্তানে ১৯৭৮ সালের ২৭ এপ্রিলের বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লবীরা (হাফিজুল্লা আমিনের নেতৃত্বে) তৎপর হয়ে উঠলে ও সেখানে 'তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সরকারকে' সহযোগিতা করতে ওই *'ব্রেজনেভ ডকট্রিনের'* প্রয়োগ করেছিলেন সোভিয়েত নেতারা এবং ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত সৈন্যরা দেশটি দখল করে নিয়েছিল। তবে সোভিয়েত এই নীতিতে পরিবর্তনের ধারা সূচনা করেছিলেন গরবাচেভ।

অভিন্ন ইউরোপীয় বাসভূমি

"অভিন্ন ইউরোপীয় বাসভূমি" এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাবেক প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরবাচেভ। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ বলতে অর্থাৎ ইউরোপকে ভাগ করতে চাননি। তার মতে ইউরোপ সত্যিই এমন এক বাসভূমি যেখানে ভূগোল আর ইতিহাস পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে মিলে গিয়ে গড়ে তুলেছে বেশ কিছু দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎকে। একথা অবশ্যই ঠিক যে এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সমস্যা রয়েছে– প্রত্যেকেই চায় নিজের ধারায় জীবনযাপন করতে, নিজস্ব পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য অনুসরণ করতে। তাই রূপক অর্থে তিনি ইউরোপকে চিহ্নিত করেছিলেন একটি বাসভূমি হিসেবে, যেখানে বিভিন্ন কক্ষে (বিভিন্ন দেশ) বিভিন্ন লোক (বিভিন্ন জাতি) বসবাস করে। ইউরোপে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা আছে, কিন্তু ইউরোপ এক– এ কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন গরবাচেভ। তিনি ইউরোপে স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় রাখার স্বার্থেই এক ইউরোপ চেয়েছিলেন। তার এই প্রচেষ্টার পেছনে বেশ কিছু যুক্তিও ছিল।

প্রথমত, ঘনবসতিপূর্ণ ও অত্যন্ত শহরায়িত ইউরোপে পারমাণবিক ও প্রচলিত উভয় ধরনের অস্ত্রেই ছেয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, পারমাণবিক যুদ্ধের কথা বাদ দিলেও একটা চিরাচরিত যুদ্ধও বর্তমান ইউরোপের জন্য ক্ষতিকর হবে। এর কারণ শুধু এই নয় যে শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের চেয়ে প্রচলিত অস্ত্রগুলো আরো মারাত্মক-এর কারণ এটাও যে মোট দুশর মতো আণবিক রিঅ্যাক্টর ইউনিট আর বিপুল সংখ্যক রাসায়নিক কারখানাসমেত নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎশক্তি ইউনিট এখানে রয়েছে। প্রচলিত যুদ্ধের সময়

এইসব কারখানা ধ্বংস হয়ে গেলে এই মহাদেশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। তৃতীয়ত, ইউরোপ বিশ্বের শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলোর অন্যতম। এখানকার শ্রম শিল্প ও পরিবহণ বিকাশ লাভ করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে পরিবেশের পক্ষে তার বিপদ গুরুতর হয়েছে বলা যেতে পারে। এই বিপদ একটা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে এখন গোটা ইউরোপের বিপদ হয়ে উঠেছে। চতুর্থত, ইউরোপের দুই অংশের অর্থনৈতিক বিকাশের এবং সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের তাগিদে কোনো না কোনো ধরনের পারস্পরিকভাবে সুবিধাজনক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পঞ্চমত, ইউরোপের দুই অংশে পূর্ব-পশ্চিম পরিসরে নিজস্ব সমস্যা আছে। কিন্তু অত্যন্ত তীব্র উত্তর-দক্ষিণ সমস্যা সমাধান করায় তাদের উভয়েরই আছে অভিন্ন স্বার্থ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতিসমূহের ভবিষ্যৎ যদি উপেক্ষিত হয়, উন্নয়নশীল দেশ ও শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার ফারাক দূর করার জটিল সমস্যাকে যদি অবহেলা করা হয় তাহলে সেটা ইউরোপ আর বিশ্বের বাকি অংশের পক্ষে বিপর্যয়কর পরিণতি ডেকে আনতে পারে। ষষ্ঠত, গরবাচেভ তার 'পেরেস্ত্রোইকা' ও 'গ্লাসনস্ত' নীতির সফল বাস্তবায়ন ও সাফল্যের জন্য পশ্চিম ইউরোপের ও সেই সাথে পূর্ব ইউরোপের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। আর এজন্যই তিনি *'কমন ইউরোপিয়ান হোম'*-এর তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন।

পেরেস্ত্রোইকা

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মিখাইল গরবাচেভের আগমনের পর (১৯৮৫) দেশ ও পার্টির সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাপক সংস্কারমূলক কর্মসূচি 'পেরেস্ত্রোইকা' হাতে নেয়া হয়েছিল। পেরেস্ত্রোইকায় প্রধান যে বিষয়গুলো হাতে নেয়া হয়েছিল তা হলোঃ ১. অর্থনৈতিক সংস্কার; ২. সামাজিক অগ্রগণ্যতা; ৩. রাজনৈতিক গণতন্ত্রায়ন; ৪. পার্টির ভূমিকা সংশোধন; ৫. মতাদর্শ, ধর্ম ও সংস্কৃতির গুণবিন্যাস; ৬. অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় সমস্যা সমাধান; ৭. পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতিতে পরিবর্তন। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে ব্যাপক পুনর্গঠনের মাধ্যমে গরবাচেভ পূর্ব ইউরোপে এক নতুন ধারার সূচনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর বহুল প্রচারিত 'পেরেস্ত্রোইকা'-তে লিখেছেন— "বহুবার আমি ব্যাখ্যা করেছি যে পশ্চিমী স্বার্থবিরোধী কোনো লক্ষ আমরা অনুসরণ করি না। আমরা জানি যে মার্কিন ও পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনীতির পক্ষে প্রধানত কাঁচামালের উৎস হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, ল্যাতিন আমেরিকা অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের এলাকা এবং এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে ছেদ ঘটাবার কথা আমরা চিন্তাও করি না এবং ঐতিহাসিক কারণে সৃষ্ট পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থের হানি ঘটাবার কোনো অভিপ্রায় আমাদের নেই।" (*পেরেস্ত্রোইকা ও নতুন ভাবনা : আমাদের দেশ ও সমগ্রবিশ্ব*। মনীষা প্রকাশনী পৃ. ১২০)

গ্লাসনস্ত

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পুনর্গঠনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার জন্য রাজনৈতিক সংস্কার ও গণসমর্থন প্রয়োজন ছিল। আর এজন্য গ্লাসনস্ত নীতি গ্রহণ করা হয়। গ্লাসনস্তের আওতায় রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থায় যে

রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়েছিল তা হলো– ১. সকল পর্যায়ে নির্বাচিত পদে পর পর দুবারের বেশি কেউ নির্বাচিত হতে পারবে না; ২. কংগ্রেস অব পিপলস ডেপুটি হবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এবং এর সদস্য সংখ্যা হবে ২২৫০; ৩. ডেপুটিদের মধ্য থেকে একটি স্থায়ী কার্যনির্বাহী সুপ্রীম সোভিয়েত নির্বাচিত হবে; ৪. কংগ্রেস অব পিপলস ডেপুটি গোপন ব্যালটে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে।

গরবাচেভের এই নীতি নানা কারণে বিতর্কিত ছিল। অভিযোগ আছে, ১৯৮৫ সালে গরবাচেভ ক্ষমতায় আসার পর তিনি পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ঐক্য দৃঢ় না করে বরং পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপকে একীভূত করার জন্য ইউরোপের অভিন্ন বাসভূমির কথা বলেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন এর মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপের ঐক্য ও সংহতি বাড়বে। কিন্তু প্রকারান্তরে তার এই নীতি পূর্ব ইউরোপের ঐক্যে চির ধরায়। গরবাচেভ পূর্ব ইউরোপ সম্পর্কে দীর্ঘদিনের গড়া সোভিয়েত নীতিকে পরিত্যাগ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ মনে করতেন পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত প্রভাবাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিবাদী বিশ্ব কর্তৃক প্রভাবিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেখানে হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে। গরবাচেভ এই নীতি হতে সরে এসে নতুন নীতি ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর এই উদারনীতির ফলে পোল্যান্ডে অ-কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও গরবাচেভ পোল্যান্ডের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি।

এভাবে গরবাচেভের সংস্কারনীতির ফলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্র বিরোধী শক্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সুযোগ পায়। এদেরকে ইন্ধন দেয় পশ্চিমা গণতান্ত্রিক বিশ্ব। আর এভাবেই সমাজতন্ত্রের পতনের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়, যা মূলত সোভিয়েত নেতা মিখাইল গরবাচেভের নিজেরই তৈরি। এরপর থেকেই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে একের পর এক সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটতে শুরু করে।

এই পতনের জন্য গরবাচেভের নীতি বা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্যবাদী নীতি কতটুকু দায়ী ছিল, তা হয়তো আগামিতে বোঝা যাবে। তবে পূর্ব ইউরোপের সাধারণ মানুষের মনে সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপারে কিছুটা হলেও বিদ্বেষ মনোভাব ছিল। পূর্ব ইউরোপের বেশ কিছু দেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক হস্তক্ষেপের পর এই বিদ্বেষ মনোভাব তৈরি হয়েছিল। আমরা কয়েকটি দেশের ঘটনাবলি নিয়ে আলাপ করতে পারি।

পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের স্বরূপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ধাঁচের সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল। নীতি ও আদর্শের দিক থেকে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলো ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির খুব কাছের ও তাদের উপর নির্ভরশীল। যদি বলা যায় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব ইউরোপের পার্টিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করত, তাহলে খুব মিথ্যা বলা হবে না। পূর্ব ইউরোপের কোনো কোনো দেশের কমিউনিস্ট পার্টি অতীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবের বাইরে থেকে স্বাধীন একটি

কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত তথা ওয়ারশবাহিনীর হস্তক্ষেপে সেই উদ্যোগ কখনো সফলতা পায়নি। আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমেই বলতে হয় হাঙ্গেরির কথা। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে অভ্যুত্থান ঘটে। এই সময় সেখানকার শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দাবি করেন। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ইমরে নাগী কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি হাঙ্গেরিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন। কৃষকদের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হ্রাস করা হয়, নাগরিকদের জীবনে গোপন পুলিশের ভূমিকা কমে যায় এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির এক অংশ এর বিরোধিতা করে ও তারা স্ট্যালিনের আমলের অনুসৃত কঠোরনীতি সমর্থন করেন। কমিউনিস্ট পার্টির এই অংশের নেতৃত্বে ছিলেন রাকোসি। বলা হয় ইমরে নাগী ছিলেন সাবেক সোভিয়েত নেতা মালেনকভের (১৯৫৩-৫৫) অনুসারী। মালেনকভের উৎখাতের পর ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে রাকোসি হাঙ্গেরিতে ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু জনগণের তীব্রবিরোধিতার মুখে নাগী পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসেন ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে। ওই সময় নাগী হাঙ্গেরিতে একাধিক রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি, সোভিয়েত সৈন্যের পূর্ণ অপসারণ, ওয়ারশ চুক্তি ত্যাগ করা, বৈদেশিক নীতিতে নিরপেক্ষ অবস্থানের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ তা মেনে নিতে পারেননি। ফলে ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বুদাপেস্টে প্রবেশ করে ও নাগীকে অপসারণ করে। এরপর ইয়ানোস কাদারের নেতৃত্বে সেখানে একটি প্রো-সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমরে নাগীকে পরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। এভাবেই হাঙ্গেরিতে একটি স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগের মৃত্যু হয়। হাঙ্গেরির এই সংস্কার কর্মসূচিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আখ্যায়িত করেছিল প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র হিসেবে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পূর্ব ইউরোপের অপর দুটি রাষ্ট্র, যুগোশ্লাভিয়া ও আলবেনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বলয়ের বাইরে গিয়ে আলাদা অবস্থান গ্রহণ করলে, পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও আধুনালুপ্ত চেকোশ্লাভাকিয়ায় যে ঘটনা ঘটেছিল, তা ছিল এরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সাবেক সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ যুগোশ্লাভিয়া ও আলবেনিয়ার ব্যাপারে নমনীয় হলেও, অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে নমনীয় হয়নি। তবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর (১৯২২-১৯৫৩) পূর্ব ইউরোপে যে উদারনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়, তাকে কেউ কেউ 'অক্টোবরের বসন্ত' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। পোল্যান্ডে এর প্রথম প্রকাশ লক্ষ করা যায়। গোমুলকা ছিলেন তখন কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান। ১৯৫৬ সালের ২৮ জুন পোল্যান্ডের পোজননা শহরে সরকারবিরোধী বড় ধরনের বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ওই সময় গোমুলকা বেশ কিছু উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন। ফলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লাভাকিয়ার ঘটনায় পোল্যান্ডের ছাত্র-জনতা আবার তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিল। ওই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড ওচাব পদত্যাগ করেছিলেন এবং

ম্যারিয়ান স্পাইচালেস্কি তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পোল্যান্ডে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভয়ানক অবনতি ঘটতে থাকে। পশ্চিমা গোষ্ঠী, পোলিশ ক্যাথলিক চার্চ, বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর প্ররোচণায় পরিস্থিতি কঠিন আকার ধারণ করে। ১৯৭০ সালে তা দাঙ্গা-হাঙ্গামার রূপ নেয়, যার মূল ভূমিকায় ছিল শ্রমিকরা। ১৯৭১ সালে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আমদানি বাড়ে ৫০ ভাগ। ইতোমধ্যে পোল্যান্ডে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ে। বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। ১৯৭৬ সালে শিল্পায়নের হার কমে যায়। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে বৈদেশিক ঋণ ১০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। পোল্যান্ডের এই সংকটে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। ১৯৮০ সালে তা রূপ নেয় বিক্ষোভে। পতন হয় গিরেক সরকারের। লাগাতার শ্রমিক ধর্মঘটে পোল্যান্ডের জাতীয় আয় হ্রাস পায়। এছাড়া সোভিয়েত অর্থনীতির চাপে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে পোল্যান্ডের লেনদেনে বিঘ্ন ঘটে। অর্থনীতিতে ঋণের ভার বৃদ্ধি পায়। শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল জারুজালেস্কিকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন করে সামরিক আইন জারি করা হয় ১৯৮১ সালের ১৩ ডিসেম্বর। ইতোমধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য থেকে উঠে আসেন পোল্যান্ডের সমুদ্র বন্দর গডানস্ক-এর একজন বিদ্যুৎশ্রমিক লেস ওয়ালেসা। ১৯৮০ সালে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 'সলিডারিটি' নামক শ্রমিক সংগঠনের জন্ম দেন। ১৯৮২ সালের আগস্টে সামরিক আইন দ্বারা সলিডারিটি বেআইনী ঘোষণা করা হয়। সলিডারিটি আন্দোলন কিছুটা হলেও স্তিমিত হয়ে পড়ে। পশ্চিমা বিশ্ব ১৯৮৩ সালে লেস ওয়ালেসাকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে এবং তাকে পোলিশ শ্রমিকদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রচার করে।

এডওয়ার্ড গিরেকের পতন এবং সামরিক শাসন জারির পর থেকে গণতন্ত্রকামীদের শক্তি বাড়তে থাকে। সলিডারিটি একটু একটু করে পোল্যান্ডের ক্ষমতা দখলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, যা কমিউনিস্টদের একটি অংশ কর্তৃক সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে। এ কারণে সেখানে গণতন্ত্রের নামে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত সমর্থিত সরকারকে হটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় অপর এক সরকার, যা মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যাথলিক চার্চের সমর্থনপুষ্ট ছিল। সরকার পরিবর্তনে ১৯৮৮ সালের অক্টোবরে পোল্যান্ডের ইস্পাত শ্রমিকদের ধর্মঘট অন্যতম ভূমিকা পালন করে। এই সরকার ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বিশ্ব সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিজয় বলে ঘোষণা করেছিল। সলিডারিটি আন্দোলনই পোল্যান্ডের আত্মমুক্তির চেতনাকে বাস্তবে রূপ দেয় এবং তাদের জন্মের ৯ বছরের ভিতরে পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ধস নামিয়ে পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় ১৯৮৯ সালে। লেস ওয়ালেসাই পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৯৫ সালে সাবেক যুব কমিউনিস্ট নেতা আলেকজান্ডার কাওয়াজিনিয়েস্কি সে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তবে সলিডারিটি ও তার সমর্থকরা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়েছিল (১৯৯৭ সালের নির্বাচন)। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে একজন সাধারণ বিদ্যুৎমিস্ত্রী ওয়ালেসা যে সমাজতন্ত্রের পতন ডেকে আনতে পারেন, সেটা ছিল শতাব্দীর বড় ঘটনাগুলোর একটি। বলতে বাধা নেই সলিডারিটির সেই আমেজ ও

জনপ্রিয়তা এখন আর পোল্যান্ডে নেই। পরবর্তীকালে ওয়ালেসা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও জিততে পারেননি।

পূর্ব জার্মানিতে পরিবর্তনটা এসেছে খুব ধীরগতিতে। এরিক হোনেকার (১৯৬৭-১৯৮৯) ছিলেন সংস্কারবিরোধী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি জার্মানিকে ভাগ করে নেয়। যার ফলে জার্মানি দুই ভাগ হয়ে যায়। পশ্চিম জার্মানির জন্ম হয় ২৯ মে, ১৯৪৯ সালে। পূর্ব জার্মানির জন্ম হয় ৭ অক্টোবর, ১৯৪৯ সালে। দুই জার্মানি সৃষ্টির পর হতেই পশ্চিম জার্মানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং পূর্ব জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত হয়। পশ্চিম জার্মানিকে নিয়ে পশ্চিমা সামরিক জোট গঠিত হয়। অন্যদিকে পূর্ব জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত সামরিক জোট ওয়ারশ প্যাক্টে যোগ দেয় ২৮ জানুয়ারি ১৯৫৬ সালে।

পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান এরিক হোনেকার গরবাচেভের পেরেস্ত্রইকা নীতির বিরোধিতা করেছিলেন এবং সংস্কারবিহীন কঠোর শাসন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ব জার্মানি অর্থনৈতিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নির্ভরশীল থাকার কারণে তিনি ওই দেশের কঠোর বিরোধিতা করতে পারেননি। পূর্ব জার্মানির গ্যাসের শতকরা একশ ভাগ আসত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। কারণ পূর্ব জার্মানির কোনো গ্যাসক্ষেত্র ছিল না। এছাড়া জ্বালানি তেলের ৮৯%, কাঠের ৯৯% ভারী যানবাহনের ৬৯% আসত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। এসব নির্ভরশীলতার কারণে হোনেকারের পক্ষে গরবাচেভের কঠোর বিরোধিতা করা সম্ভব হয়নি। গরবাচেভ মূলত চাচ্ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মডেলে পূর্ব জার্মানিতে সংস্কার চালু করতে, যা তিনি পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির জন্য চেয়েছিলেন। কিন্তু হোনেকার এই সংস্কারের বিরোধী ছিলেন

পূর্ব জার্মানিতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল চার্চের প্রভাব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মকর্ম বন্ধ থাকার বিরোধিতা করছিল চার্চ। এর প্রভাব পরবর্তীকালের ঘটনাবলিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এখানে সংস্কার এসেছিল হোনেকারের উৎখাতের পর। ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর হোনেকারের পতনের পর এগোন ক্রেনজ ও হ্যান্স মদরো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং দুই জার্মানির একীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। ওই সময় পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর কোল একীকরণের প্রশ্নে ১০ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর দুই জার্মানি একত্র হয়।

জার্মান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলে 'বার্লিন সমস্যা' নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, বার্লিনকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ও মার্কিন উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বার্লিনকে ভাগ করে পূর্বাংশে সোভিয়েত এবং পশ্চিমাংশে মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিস্থিতিতে দুই বার্লিনের মধ্যে প্রাচীর নির্মাণ করে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেয়া (১৯৬১) হয়। ১৯৬৩ সালে উভয়ের মধ্যে পাসপ্রথা চালু করা হয়। ১৯৬২ সালে দুই বার্লিনের মধ্যে দেয়াল তোলা হয়। কারণ বিভক্তিকরণের ফলে সেখানে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল এবং পূর্ব জার্মানির নাগরিকেরা দেশত্যাগ করে জার্মানিতে চলে আসতে শুরু করেছিলেন। জনগণের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে নতুন সরকার প্রধান ক্রেনজ ১০ নভেম্বর ১৯৮৯ সালে পশ্চিমে যাবার ব্যাপারে পূর্ব জার্মান সরকারের বাধ্যবাধকতা তুলে নেন। পতন ঘটে বার্লিন প্রাচীরের, যে প্রাচীর দীর্ঘ ২৮ বছর জার্মান নাগরিকদের পূর্ব ও পশ্চিমে

তথা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের নামে পৃথক করে রেখেছিল। ১০ নভেম্বর, ১৯৮৯ সালে হাজার হাজার লোক বার্লিন প্রাচীর অতিক্রম করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়, যা ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রুমানিয়া ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করে রুমানিয়ার নেতৃবৃন্দ সারা বিশ্বের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম কৃষিসম্পদশালী দেশ রুমানিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনপুষ্ট সমাজতান্ত্রিক সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সে দেশেরই কৃষক পরিবারের সন্তান নিকোলাই চসেস্কু। ১৯৬৭ সালে তিনি ক্ষমতাসীন রাষ্ট্র পরিচালনা পরিষদের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৪ সালে তিনি তার পদকে প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত করেন। তার শাসনামলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে রুমানিয়া তথা চসেস্কুর এক ধরনের দ্বন্দ্ব হয় এবং তিনি রুমানিয়ায় সোভিয়েত উপস্থিতি খর্ব করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি নমনীয় হন, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল থেকে এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করেন এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে অসম বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে দ্বন্দ্বের সময় চসেস্কু চীনের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সংস্কার আন্দোলন দমনে ওয়ারশ হামলার নিন্দা করেন চসেস্কু। ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হামলারও নিন্দা করেছিলেন তিনি। ১৯৮৫ সালে মিখাইল গরবাচেভের সংস্কার কর্মসূচিকে তিনি স্বীকৃতি দেননি। ১৯৮৮ সালে চসেস্কু ঘোষণা করেছিলেন যে, হাজার হাজার গ্রাম বিলুপ্ত করে সেখানে গড়ে তোলা হবে নতুন কৃষিশিল্প কেন্দ্র। তার এই সংস্কার বিদেশে কঠিনভাবে সমালোচিত হয়েছিল।

পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানি ইত্যাদি দেশের মতো রুমানিয়াতেও অর্থনীতি এবং উৎপাদন সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত খাত যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে। কিন্তু তা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি করতে ব্যর্থ হয়। ফলে অসন্তোষ বেড়ে যায়। এরকম সংকটজনক পরিস্থিতিতে চসেস্কু আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য এমন এক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন যা জনগণের জন্য দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করে এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও চসেস্কু এবং তার পরিবার ও সরকারি আমলারা সব রকম কৃচ্ছ্রতা সাধনের বাইরে থাকেন এবং সুবিধাভোগী গোষ্ঠী হিসেবে বিলাসী জীবনযাপন করেন। এই পার্থক্য জনগণের একটি বড় অংশের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। তিমিসিউরাতে খ্রিস্টান পাদরিদেরকে নিয়ে রুমানিয়ায় প্রথম দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৮৭ সালে খাদ্য ঘাটতি ও নাগরিক অধিকার প্রশ্নে রুমানিয়ার ব্রাসোভ শহরে হাজার হাজার শ্রমিকের দাঙ্গা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন কর্মকর্তারা এর সমালোচনা করেন এবং সমালোচনা করেন চসেস্কুর শাসনের।

রুমানিয়া ওয়ারশ জোট এবং বাণিজ্য সংস্থা *কমিকন*-এর সদস্য থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ ও চীন বিভিন্ন সময় রুমানিয়াকে কাছে টানার চেষ্টা করে। এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে, রুমানিয়া ওয়ারশ জোট ও কমিকন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। চসেস্কু তার ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত

করার জন্য তার স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি।

ওয়ারশভুক্ত অন্যান্য দেশে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান হলেও রুমানিয়াতে কেবল ঘটল রক্তাক্ত বিপ্লব। শুধু তিমিসিউরায় বিক্ষোভরত জনতার উপর চসেস্কুপন্থী সৈন্যরা গুলিবর্ষণ করে, এতে অনেক জনতা নিহত হয়। একপর্যায়ে রুমানিয়ার সৈন্যরা জনগণের উপর গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তারা জনগণের সাথে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে। ১৯৮৯ সালে বিপ্লবের এক সপ্তাহের মধ্যে চসেস্কুকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রুমানিয়ায় সমাজতন্ত্রের কবর রচিত হয়। চসেস্কুর পর প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ইলিয়েস্কু। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে (১৯৯৬) বিজয়ী হন এমিল কনটানেস্কু। শতাব্দী শেষ হবার আগেই সেখানে নতুন নতুন শক্তির উত্থান ঘটেছে। কোনো কোনো দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নতুন নামে ও নতুন রাজনীতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ ও ক্ষমতায় গেলেও, রুমানিয়ায় চসেস্কুর সমর্থকদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পূর্ব ইউরোপের আরেকটি দেশ বুলগেরিয়া নিয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন। বুলগেরিয়ায় জর্জ দিমিত্রভের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কাজ একটানাভাবে নানা সমস্যা সত্ত্বেও পরিচালিত হচ্ছিল। দিমিত্রভ ছিলেন বুলগেরিয়ার ফ্যাসিস্ট প্রতিরোধ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান নেতা, তথা বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টিরও নেতা। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতা এবং স্ট্যালিনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন তিনি। স্ট্যালিনের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরই দিমিত্রভ মস্কোয় মৃত্যুবরণ করেন। দিমিত্রভের মৃত্যুর পর বুলগেরিয়ান পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ভেলকো চেরভেনকভ। চেরভেনকভ ছিলেন দিমিত্রভের মতো প্রতিরোধ যুদ্ধের একজন পুরাতন নেতা ও মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের প্রতি অনুগত। এদিক দিয়ে তিনি দিমিত্রভের গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু হলেও বুলগেরিয়ান পার্টিতে দিমিত্রভের মতো প্রভাব তার ছিল না। অন্যদিকে, ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক বুলগেরিয়ায় নতুন সোভিয়েত লাইন চালু করার ক্ষেত্রে এক মস্ত প্রতিবন্ধক মনে করায় তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ঘনীভূত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর পদ এবং পরে পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদও পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ব্যক্তিপূজা ও বিভিন্ন ধরনের ভুল-ভ্রান্তির অভিযোগ তুলে চেরভেনকভের বিরুদ্ধে অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের নামে কসটভ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের পার্টিতে পুনর্বাসিত করা হয়। অন্তন ইউপভ চেরভেনকভ এরপর প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হলেও তিনি ক্রুশ্চভের লাইন কার্যকর করার ব্যাপারে মোটেই উৎসাহিত ছিলেন না। কাজেই কিছুদিন পর তাকে আকস্মিকভাবে অপসারিত করা হয় এবং বুলগেরিয়ান পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন ক্রুশ্চভের একান্ত অনুগত টডর ঝিভকভ। এই ঝিভকভই ১৯৮৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘকাল বুলগেরিয়ায় ক্ষমতাসীন ছিলেন। ঝিভকভের আমলে পার্টি ও সরকারি প্রশাসনের ক্ষেত্রে এবং অর্থনীতিতে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ যতখানি ব্যাপক ও সরাসরি ছিল ততখানি অন্য কোনো পূর্ব ইউরোপীয় দেশে ছিল না। সমাজতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পশ্চিমা ধাঁচের গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ ঘটেছে। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে (১৯৯৭)

অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে (নতুন সংবিধান ১৯৯১) বিজয়ী হন পিটার স্ট্রোইয়ানভ। আর প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ইওয়ান কসটভ।

পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেছিলেন অধুনালুপ্ত যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল টিটো। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের অবনতির পেছনে একাধিক কারণ কাজ করেছিল। প্রথমত, যুগোশ্লাভিয়াকে সোভিয়েতীকরণের প্রবল ইচ্ছা ছিল মস্কোর। বিশেষ করে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন মস্কো নিজের কব্জায় নিতে চেয়েছিল। কিন্তু টিটো তা হতে দেননি। দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদের ব্যাখ্যা নিয়ে যুগোশ্লাভিয়ার সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধ দেখা দিয়েছিল। টিটো সমাজতন্ত্রের তৃতীয় একটি পথ খুঁজে নিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়ন আশা করেছিল টিটো ক্ষমতা পেয়েই বিদেশি পুঁজিবাদের বিলোপ সাধন করবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। চতুর্থত, বেলগ্রেড ও মস্কোর মধ্যে বিরোধের অন্যতম কারণ ছিল টিটোর জাতীয়তাবোধ। এসব কারণে টিটোর সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি কিংবা চেকোশ্লাভাকিয়ায় 'হস্তক্ষেপ' করলেও, যুগোশ্লাভিয়ায় কখনও হস্তক্ষেপ করেনি। টিটোর 'সমাজতন্ত্র' একটি বিকল্পধারার জন্ম দিয়েছিল। তিনি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে নিয়ে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। টিটোর একক ও কঠোরনীতির কারণে সেখানে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়নি। টিটোর পরবর্তী নেতৃত্ব সেই ধারা ধরে রাখতে পারেননি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বের বিষয় নিয়ে স্ট্যালিনের সাথে টিটোর মতপার্থক্য দেখা দেয়। টিটো সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব অস্বীকার করেন। ১৯৪৮ সালে টিটো যুগোশ্লাভিয়াকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করেন ও রুমানিয়ার স্বাতন্ত্র্যের প্রতিও টিটো সমর্থন দেন।

১৯৮০ সালে টিটোর মৃত্যুর পর যুগোশ্লাভিয়ায় একটি যৌথপ্রেসিডেন্সি ব্যবস্থা চালু হয়। এতে কেউ একক প্রেসিডেন্ট ছিলেন না। যুগোশ্লাভিয়ার তৎকালীন ৬টি রিপাবলিক ও ২টি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের নেতারা পালাক্রমে এই যৌথপ্রেসিডেন্সির দায়িত্বভার পালন করতেন। এক বছর অন্তর অন্তর সভাপতির পদ পরিবর্তিত হতো। টিটোর মৃত্যুর পর আর্থিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য পুঁজিবাদী দেশের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তারা মানুষের অসন্তোষ ও বিভিন্ন রিপাবলিকের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। যে ৬টি রিপাবলিক ও ২টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল, সেগুলো হচ্ছে শ্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া হারজেগোভিনা, ভজভোডিনা, সার্বিয়া, মনটেনেগরো, কসভো ও মেসিডোনিয়া। পুরো জনসংখ্যার মধ্যে সার্ব সম্প্রদায় ছিল মোট জনসংখ্যার ৩৯.৭ ভাগ, ক্রোট ২২ ভাগ, মুসলমান ৮.৪, শ্লোভাক ৮.৩ মেসিডোনিয়ান ৫.৮ ও মন্টেনেগ্রোস ২.৫ ভাগ। কিন্তু সার্বরা রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত। প্রেসিডেন্ট টিটোর বিভিন্ন রিপাবলিককে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোয় একত্র রাখতে পারলেও, টিটো পরবর্তী নেতৃত্ব জাতিগত দ্বন্দ্ব নিরসন করতে ব্যর্থ হন। সার্বদের একক কর্তৃত্ব করার প্রবণতা রিপাবলিকগুলোকে স্বাধীনতার দিকে ঠেলে দেয়। ১৯৯১ সালে ক্রোয়েশিয়া ও শ্লোভেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে আর মুসলমান অধ্যুষিত (৪৩ ভাগ মুসলমান) বসনিয়া-

হারজেগোভিনা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ১৯৯২ সালের এপ্রিলে। কিন্তু এই স্বাধীনতা ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বড় ধরনের গণহত্যা হয়। লক্ষ লক্ষ মুসলমান ঘরছাড়া হয় অথবা গণহত্যার শিকার হয়। যারা গণহত্যার সাথে জড়িত ছিল, তাদের এখনো হেগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বিচার হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৫ সালের ২১ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ডেটন শহরে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির বিনিময়ে (বসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ-এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে) বসনিয়ার স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। অন্যদিকে, কসভোর (জনসংখ্যার শতকরা ৭৭ ভাগ মুসলমান এবং আলবেনীয় বংশোদ্ভূত) স্বাধীনতা এখনও নিশ্চিত হয়নি। কসভো সংকটকে কেন্দ্র করে সেখানে ন্যাটোর বিমান হামলা পর্যন্ত হয়েছিল। সেখানেও সার্বরা বড় ধরনের গণহত্যা চালিয়েছিল। ইতোমধ্যে যুগোশ্লাভিয়া তার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হারিয়েছে। যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এখন টিকিয়ে রাখছে সার্বিয়া। আর সার্বিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ বসনিয়ার গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে হেগের আদালতে বিচারাধীন ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। একটি, সাবেক প্রেসিডেন্ট টিটোর নেতৃত্বে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা, আর দ্বিতীয়টি, শতাব্দী শেষ হবার আগেই যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্রের বিলুপ্তি।

পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ধাঁচের সমাজতন্ত্রের পতন আলোচনা করলে খুব সংগতকারণেই অধুনালুপ্ত চেকোশ্লাভিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক হস্তক্ষেপের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে এই চেকোশ্লাভাকিয়াতেই যে *'ভেলভেট'* পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের পতন ডেকে এনেছিল, তা আলোচনা করাও বাঞ্ছনীয়। চেকোশ্লাভাকিয়া ইউরোপের একটি পুরনো দেশ। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি প্রাগে ক্ষমতাসীন হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ট্যালিনের মৃত্যুর সাথে সাথে সেখানে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হলেও, এর ঢেউ এসে চেকোশ্লাভাকিয়ায় লাগে। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত অ্যান্তনিন নোভোতনি চেক কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্লোভাকবিরোধী। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়। ১৯৬৮ সালে আলেকজান্ডার ডুবচেক পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি ও লুডভিগ স্ববোদা রাষ্ট্রপ্রধান হন। পার্টি নেতারা বিকেন্দ্রীকরণ, কঠোর নিয়মকানুন শিথিল করা, শ্রমিকদের অংশগ্রহণ, সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবি তোলেন। ফলে ক্রেমলিনের নেতৃত্ব সতর্কতা গ্রহণ করেন। কেননা চেকোশ্লাভাকিয়া তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলোসহ (একমাত্র রুমানিয়া বাদে) সামরিক বাহিনী রাজধানী প্রাগ ও বিভিন্ন শহরে ট্যাঙ্ক নামিয়ে জনগণের উপর নৃশংসভাবে গুলিবর্ষণ করে এবং অসংখ্য লোককে সমাজতন্ত্র রক্ষার নামে হতাহত করে। ঘটনাটি ঘটে ১৯৬৮ সালের ২১ আগস্ট। ডুবচেক, স্বাবোদা, সার্নিক প্রমুখ চেক নেতৃবৃন্দ দখলদার বাহিনীর কাছে বন্দিদশা প্রাপ্ত হন। প্রাগে জাতীয় পরিষদ এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে এবং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দখলদার বাহিনীর সাথে অসহযোগিতা করে।

চেকোশ্লাভাকিয়ায় সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের দ্বারা সমর্থিত হয়েও সোভিয়েত ভেটোর কারণে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। বিশ্বের নানা দেশ

এই হস্তক্ষেপের নিন্দা করেছিল। ১৯৬৮ সালের ২৬ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ওয়ারশ জোটের নেতৃবৃন্দ মস্কোতে ডুবচেক, স্বাবোদা ও সার্নিকের মধ্যে আলোচনা করেন। তারা প্রাগ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার ও বন্দি নেতৃবৃন্দের মুক্তির কথা বলেন এবং পক্ষান্তরে চেক নেতৃবৃন্দ সেন্সার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করতে এবং পশ্চিম সীমান্তে টহলদারী ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ৭০,০০০ সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন রাখতে রাজি হন।

১৯৬৯ সালের প্রথম দিকেই ডুবচেককে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় ও গুস্তাভ হুসাকের নেতৃত্বে সোভিয়েতপন্থী একটি গ্রুপকে ক্ষমতায় বসানো হয়। হুসাক প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির মতো অর্থনৈতিক উন্নয়ন চেকোশ্লোভিয়ার হয়নি। ১৯৮০ সালের পরবর্তী সময়ে গণঅসন্তোষ বাড়তে থাকে। জীবনযাত্রার মান নিম্ন হচ্ছিল, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা যাচ্ছিল, যার জন্য মৌলিক অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

পূর্ব ইউরোপে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে থাকে। সে ধারা চেকোশ্লোভাকিয়াতে লাগে। সেখানে সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বিরুদ্ধবাদী নেতা লেখক ভাসলাভ হাভেল। ১৯৮০ সালের পরে চেক ও শ্লোভাক জাতিভুক্ত সাধারণ মানুষ একদলীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করে বিভিন্ন দল ও সংগঠন গঠন করে। যুবক ছাত্ররা বিরুদ্ধবাদী নেতা ভাসলাভ হাভেলের সমর্থনে দস্তখত সংগ্রহ করে এবং আন্দোলন অব্যাহত রাখে। যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৯৮৯ সালের ১৭ নভেম্বর। ১৯৮৯ সালের ১৭ নভেম্বর প্রাগের রাজপথে যে মিছিলটি বিক্ষোভে ও প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল, সেই মিছিলে শরিক ছিল বিভিন্ন স্তরের প্রায় ২০ হাজার লোক। তারা মানবাধিকার নেতা হাভেলের জয়ধ্বনি দেয় এবং পদত্যাগ দাবি করে সমাজতান্ত্রিক সরকারের। চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ একনায়কতন্ত্রী শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। তাদের গণআন্দোলনের প্রকৃত দাবি ছিল চেকোশ্লোভিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার নয় বরং কমিউনিজমের বদলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। তাদের দাবি সফল হয়েছিল। সেখানে সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটেছিল। শান্তিপূর্ণভাবে সংঘটিত এই 'বিপ্লব' শুধু চেকোশ্লাভাকিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ 'বিপ্লব' ছড়িয়ে গিয়েছিল পূর্ব ইউরোপের প্রতিটি রাষ্ট্রে। চেকোশ্লাভাকিয়ার এই 'বিপ্লব'-এর নায়ক ছিলেন ভাসলাভ হাভেল, যার নেতৃত্বে পরবর্তীকালে চেকোশ্লাভাকিয়া রাষ্ট্রটি ভেঙে যায়। জন্ম হয় দুটি রাষ্ট্রের, চেক রিপাবলিক ও শ্লোভাকিয়া। যুগোশ্লাভিয়ার মতো এটাও ছিল উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। তবে পার্থক্য ছিল যুগোশ্লাভাকিয়ায় গৃহযুদ্ধ ও গণহত্যার মধ্য দিয়ে একাধিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, আর চেকোশ্লাভাকিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। হাভেল ১৯৯৩ ও ১৯৯৮ সালে পরপর দুবার চেক রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। পূর্ব ইউরোপে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তাকে বলা হয় পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিজয়।

বিপ্লবপরবর্তী পূর্ব ইউরোপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও সে গণতন্ত্র জনগণের গণতান্ত্রিক চাহিদা অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ করতে পারেনি। বেড়েছে বেকার সমস্যা, ক্রাইম, ভায়োলেন্স আর অবাধ যৌনতা! কলকারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণের ফলে শ্রমিকরা চাকরি হারিয়েছে, আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তারা আমলাতন্ত্রের

রাজত্ব কায়েম করেছিল। পোল্যান্ডের অবিসংবাদিত নেতা লেস ওয়ালেসা শ্রমিকদের সম্মানজনক জীবন ও গণতন্ত্র উপহার দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার অন্তসারশূন্যতা ধরা পড়তে শুরু করেছিল। শুধু পোল্যান্ডেই কয়েক লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছিল। শ্রমিকদের মজুরি এক-তৃতীয়াংশ কমে গিয়েছিল। ১৯৯০ সালের নভেম্বরে এক জরিপে দেখা গিয়েছিল যে পোল্যান্ডের ৬২ ভাগ শ্রমিক মনে করে তাদের দেশের কোনো সংগঠন শ্রমিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না।

অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্ব ইউরোপ বড় ধরনের আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোও আমদানি করতে হয়েছিল। যার ফলে পূর্ব ইউরোপে পশ্চিমা বিশ্বের কলোনিতে পরিণত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। বিভিন্ন পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে কমিউনিস্টরাই নতুনরূপে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই পরিবর্তনের অনিবার্য পরিণতি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছিল। ভেঙে গিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। নব্বইয়ের দশকে পূর্ব ইউরোপ জুড়ে যে গণতন্ত্রের সূচনা হয় সে গণতন্ত্র পূর্ব ইউরোপের জনগোষ্ঠীকে হতাশ করেছিল। তাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। সাবেক কমিউনিস্টরা সেখানে ভিন্ন নামে সংগঠিত হয়েছিল। কোথাও কোথাও তারা ক্ষমতায়ও এসেছিল (পোল্যান্ডের যুবক কমিউনিস্ট নেতা আলেকজাণ্ডার কাওয়াজিনিয়েস্কি ১৯৯৫ সালে, আলবেনিয়ায় ১৯৯৭ সালে)। 'নয়া গণতন্ত্র' সেখানকার জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিনগুলোতে তাই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোয় এক ধরনের হতাশা লক্ষ করা গেছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. জিবিগনিউ ব্রেজেনিস্কি (অনুবাদঃ গাজী শামছুর রহমান) বিংশ শতাব্দীতে কম্যুনিজমের জন্ম ও মৃত্যু, ঢাকা, ১৯৯০
২. গৌরিপদ ভট্টাচার্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কলিকাতা, ১৯৯১
৩. প্রাণগোবিন্দ দাশ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কলিকাতা, ১৯৮৮
৪. অমিত কুমার সেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, কলিকাতা-
৫. তারেক শামসুর রেহমান, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ঢাকা, ১৯৯৯
৬. মিখাইল সের্গেইভিচ গরবাচেভ, পেরেস্ত্রইকা ও নতুন ভাবনা, আমাদের দেশ ও সমগ্র বিশ্ব— কলকাতা, ১৯৯১
৭. Richard Goff et. el, The Twentienth Century A Brief Global History, Boston, 1998
৮. Jerry Hough, Russia and the West Gorbachev and the Politics of Reform, New York, 1988
৯. James Lee Roy, Global Politics, Boston, 1987.

সপ্তম অধ্যায়

স্নায়ুযুদ্ধ

In the aftermath of the Second World War, there began a massive reorganization of the world...we are living through an era of the most extensive and intensive political change in human history...our generation is living through a genuine global political awakening.

Zbigniew Brzezinski, 1979

[Any United States President] must embrace both deterrence and coexistence, both containment and an effort to relax tensions.

Henry A. Kissinger, 1982

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে 'ঠাণ্ডা লড়াই' বা 'Cold War' একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর বিশ্বরাজনীতির চালিকাশক্তি ছিল এই ঠাণ্ডা লড়াই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি, বিশ্বের দুই পরাশক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সবকিছুই এই ঠাণ্ডা লড়াইকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। মূলত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্ব-রাজনীতি ও ঠাণ্ডা লড়াই অনেকটা সমার্থক হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের উত্থান-পতন, উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব সব কিছুর মূলে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিল ঠাণ্ডা লড়াই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যুগপৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের 'পরাশক্তি' বা "Super Power" হিসেবে আবির্ভাব ঘটে। উভয়ের মধ্যকার উত্তেজনার সময়কে ঠাণ্ডা লড়াই হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই দুই পরাশক্তি সরাসরি যুদ্ধে না জড়িয়ে স্বীয় কূটনৈতিক তথা অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রচারণা শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং পৃথিবীকে দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে ফেলে। বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র এভাবে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে একটি যুদ্ধোদ্যম অবস্থার সৃষ্টি করে। বিশ্বের এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক Mcbllan, Olson এবং Sonderman লিখেছিলেন "The tension, which has been labelled 'Cold War' is a cardinal fact of international life in the mid 20th century and thus must affect any analysis of contemporary internation

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ঠাণ্ডা লড়াই মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ বা 'Psychological War' যা দুটি বিরোধী মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত। এ দ্বন্দ্বের অর্থ ছিল সরাসরি প্রথাগত যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে একে অপরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক কলা-কৌশলতভাবে পরাভূত করা। এ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দুই প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের স্বীয় প্রভাববলয় বা 'Sphare of Influence' বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যা চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে নব্বই-দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

সারণি : ৩

অঞ্চলভিত্তিতে পার্থক্য, ১৯৮০

অঞ্চল	মাথাপিছু জিএনপি (ডলার)	মোট জিএনপি (মিলিয়ন ডলার)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
উত্তর আমেরিকা	১১৪৬০	২৮৮৩	২৫২
জাপান	৯০২০	১০৫৪	১১৮
ওসেনিয়া	৭৮১০	১৭৬	২৩
পশ্চিম ইউরোপ	৭৯৬৬	৩৩১৪	৪১৬
পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন	৫৪৫২	২০৪৪	৩৭৫
মধ্যপ্রাচ্য	৫৭৯০	২২০	৩৮
দক্ষিণ আমেরিকা	২০৭০	৪৮৭	২৩৬
মধ্য আমেরিকা (মেক্সিকোসহ)	১৭৪০	১৯৩	১১১
আফ্রিকা	৭৬০	৩৫০	৪৫৯
এশিয়া (জাপান, মধ্যপ্রাচ্য বাদে)	৩৩০	৭১৮	২১৯৩

সূত্র world Bank Atlas, Washington D.C., 1983

ঠাণ্ডা লড়াই : অর্থ ও প্রকৃতি

ইংরেজি 'Cold War' শব্দের বাংলায় বিভিন্ন প্রতিশব্দ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– 'ঠাণ্ডা লড়াই', 'স্নায়ুযুদ্ধ', 'শীতল যুদ্ধ', 'প্রচার যুদ্ধ' (Propaganda War) ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দুটি পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্র-জোট প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ না হয়ে পরস্পরের প্রতি যে যুদ্ধভাব বিরাজ করছিল বা সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তাকেই 'ঠাণ্ডা লড়াই' বলে অভিহিত করা হয়। এভাবে 'যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়' সাধারণত এ ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় 'Cold War Relationship'। কাজেই ঠাণ্ডা লড়াই ছিল দুই জোটের মধ্যে এমন একটি যুদ্ধোন্মাদ সম্পর্ক, যে সম্পর্ক যুদ্ধ সৃষ্টি করেনি, কিন্তু যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। উল্লেখ্য যে, ঠাণ্ডা লাড়াইয়ের ইঙ্গিত আমরা পাই উইনস্টন চার্চিলের ১৯৪৬ সালের ৫ মার্চ ওয়েস্ট-মিনিস্টার কলেজের এক বক্তৃতার মাধ্যমে। অবশ্য চার্চিল সরাসরি 'Cold War' কথাটি ব্যবহার করেননি। কিন্তু তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে মৈত্রীর বন্ধন

স্থাপিত হয়েছিল তা অবলুপ্ত হতে চলেছে। তার পরিবর্তে সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ, হিংসা ও অবিশ্বাস। চার্চিল ছাড়া অন্য একজন Cold War শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি হলেন বার্নাড বারুচ, যিনি মূলত একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী ছিলেন। পরে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তিনি বলেছিলেন *"Let us not be deceived- today we are in the midst of the Cold War".* তবে আমেরিকার ওয়াল্টার লিপম্যান-এই 'Cold War' শব্দটি সংবাদপত্রে প্রথম ব্যবহার করেন। এ শব্দের মাধ্যমে তিনি আমেরিকা ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে চেয়েছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে বেশ সন্দেহ ও ভীতি।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঠাণ্ডা লড়াইকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ লড়াইকে পরাশক্তিবর্গের মধ্যে পরোক্ষ লড়াই বা 'Indirect War' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। একে আবার পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকৃত লড়াইয়ের পরিবর্তে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনেকে ঠাণ্ডা লড়াই বলতে পরাশক্তিগুলোর মাঝে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে International World Book of Encyclopedia-এর উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয় *"Cold War is the struggle for power and influence between the Communist nations and the western allies led by the United States".*

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এই 'ঠাণ্ডা লড়াই-কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন: ১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ও 'যুদ্ধের' মূল কথা। আর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রাজনীতিকে 'Bipolar Politics' বা দ্বিপক্ষীয় রাজনীতিও বলা হয়; ২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে এবং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়; ৩. উভয় পক্ষই 'স্নায়ু যুদ্ধ' সম্বন্ধে তাদের নীতিকে রাজনৈতিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে 'ঠাণ্ডা লড়াই' পরিচালনা করে। অপরদিকে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নামে ঠাণ্ডা লড়াই পরিচালনা করে। তার ফলে এটি অনেক পরিমাণে 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর রূপ ধারণ করে এবং উভয় পক্ষই প্রচারণার উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করে; ৪. ঠাণ্ডা লড়াইয়ে দুপক্ষই যথাসম্ভব সামরিক প্রস্তুতি বাড়ানো সত্ত্বেও প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বিরত থাকে। এ লড়াইকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলে দুপক্ষের বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলেও উভয় পক্ষই যুদ্ধকে সেই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য চেষ্টা করে; ৫. ঠাণ্ডা লড়াই মূলত সামরিক ও জাতীয় নিরাপত্তার ইস্যুতে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে যা পূর্ব ও পশ্চিম এ দুটি বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত করে। এ প্রসঙ্গে Kengley এবং Wittkopt-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের মতে, "The East-West conflict is essentially a struggle among those at the top of the

international hierarchy for preeminent status, with each side seeking to protect its own position while gaining advantage in its relations with, and often at the expense of the other". এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠে এবং 'ঠাণ্ডা লড়াই' পূর্ণউদ্যমে অব্যাহত থাকে। সমগ্র বিশ্ব এক অনভিপ্রেত যুদ্ধের চাপে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কারণ

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রধান কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ :

প্রথমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপের যেসব অঞ্চলে বিভিন্ন মিত্রশক্তি প্রবেশ করে তারা সেখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করার চেষ্টা করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর সদ্ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়। অপরদিকে, যুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলো দুর্বল হয়ে পড়ায় তাদের মধ্যে সোভিয়েত ভীতি বিশেষভাবে সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের সাথে চুক্তি স্থাপন করে সোভিয়েত বিরোধী এক জোট সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত, আদর্শগত সংঘাতও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জন্ম দেয়। আমেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্বের ধনবাদী আদর্শ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দ্বন্দ্ব এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে Prof. V.K. Malhotra-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, *"The United States foreign policy became deadly against communism. Its actions highly competitive and confrontationist toward the Soviet Union. This interpretation thus sees the cold war as fuelled by historic antagonism between diametrically opposed systems of belief".*

তৃতীয়ত, প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়, অস্ত্রসজ্জার ক্ষেত্রেও এটা দেখা যায়।

চতুর্থত, পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস এই মনস্তাত্ত্বিক কারণের জন্যও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকান মনোভাব উভয়ের মধ্যে এক ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল।

পঞ্চমত, তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীন জাতিগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার খাতিরে বৃহৎশক্তিবর্গের ছত্রছায়ায় থাকতে চেয়েছিল। এই নেতৃত্ব লাভের জন্য আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং ঠাণ্ডা লড়াই দেখা দেয়।

ঠাণ্ডা লড়াই : উৎস ও বিকাশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হয়েছিল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সূত্রপাতের মধ্য দিয়ে। এ দুটি উপাদান ছিল যথাক্রমে রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্ব এবং পরমাণু অস্ত্রের প্রসার। এ সম্পর্কে Peter Calvocoressi লিখেছেন, "The Second World War ended with an act which contained the two central elements in the cold war the advent of nuclear weapons and Russo-American rivalry."

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে দুটো পরাশক্তির মাঝে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সনাতন বৃহৎশক্তিগুলোর

মধ্যে নাৎসি জার্মানি ও জাপানের পরাজয় এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রচুর ক্ষতি ও ধ্বংসসাধন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে সাহায্য করে। সামরিকভাবে তাদের কোনো সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কিন্তু স্বার্থ ছিল বিশ্বব্যাপী। যদিও তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একত্রে যুদ্ধ করেছে তবু তাদের মধ্যে প্রকৃত কোনো মিল বা বন্ধন ছিল না। উল্লেখ্য যে, হিটলারের আক্রমণই তাদেরকে একটি অসাধারণ মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। কিন্তু এ সময়ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ পরিলক্ষিত হয়। তবে যুদ্ধ চলাকালীন এ সম্পর্ক ভেঙে যায়নি, কারণ অক্ষ শক্তিসমূহের (Axis Powers), বিশেষত হিটলারের বিরুদ্ধে তাদের সাধারণ ভীতি ও বিপদই তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিল। হিটলারের পতনের সাথে সাথে তাদের মৈত্রী বন্ধনে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল। অধ্যাপক V.K. Malhatra-এর মতে, "The hope of the optimists that unity and co-operation among the erstwhile warring nations would become a permanent feature after the war, was belived. The world was divided into two distint political entities and thus cold war and bipolarization became an accomplished fact."

কেউ কেউ ঐতিহাসিকভাবে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় আসার মধ্যেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বীজ নিহিত ছিল। কারণ পুঁজিবাদী শক্তি রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ভীত হয়ে পড়ে এবং পুঁজিবাদী বিশ্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এ মত অনুযায়ী ঠাণ্ডা লড়াই ছিল মূলত সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে আদর্শের দ্বন্দ্ব। অনেকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মূল খুঁজতে গিয়ে বলেন যে, ১৮৭০ সালে জার্মানি ও ইতালির একীকরণের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তি সাম্যের (Balance of Power) পরিবর্তন ঘটে এবং এ দুটো নতুন বৃহৎশক্তির 'আগ্রাসী মনোভাব' বৃহৎশক্তিবর্গের মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্বের সূচনা করে যা পরবর্তীকালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রূপ পরিগ্রহের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছিল। কেউ কেউ বলেন, ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্টে আটলান্টিক সনদের বা 'The Atlantic Charter' ঘোষণার মধ্যেই এর বীজ নিহিত ছিল। ওই সময় রুশ নেতা জোসেফ স্ট্যালিনকে বাদ দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ভবিষ্যৎ বিশ্বব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য যে ঘোষণাবলি বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন, তাতে রুশ নেতা কিছুটা রুষ্ট হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কারণ তিনি পশ্চিমা নেতৃবৃন্দকে যে আগে থেকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন তাঁকে বাদ দেয়ায় তাঁর সে সন্দেহ অনেকটা ঘনীভূত হয়েছিল। স্বভাবতই তিনি মনে করেছিলেন যে, পশ্চিমা শক্তিবর্গ কোনো সময়ই সোভিয়েত ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে পারেনি এবং তার ধ্বংসসাধনের জন্য ছিল সর্বদা সচেষ্ট। তাঁর এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাই তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহকে বৃদ্ধি করে, যা পরবর্তীকালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পথকে প্রশস্ত করে।

আবার অনেকের মতে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রকৃত উদ্ভব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন রাশিয়া কর্তৃক তিনটি বাল্টিক

প্রজাতন্ত্র—লিথুনিয়া, লাটভিয়া এবং এস্তোনিয়ায় যে সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যুদ্ধ শেষে তা নিজস্ব প্রজাতন্ত্রে অধিভুক্ত করেছিল, তা থেকে পূর্ব ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে বিরোধ গড়ে উঠে। আর এ থেকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল। বিশেষ করে রাশিয়া এ তিনটি প্রজাতন্ত্রকে নিজস্ব ভূ-খণ্ডের সাথে অধিভুক্ত করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। এছাড়া ১৯৪৯ সালে প্রতিবেশী চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পূর্ব এশিয়াতে সমাজতন্ত্রের প্রসারকে গতিশীল করে। উভয় দেশ চীন ও রাশিয়া বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র প্রসারের জোর প্রয়াস অব্যাহত রাখে।

সারণি : ৪

বিশ্বে অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশসমূহের অংশীদারত্ব, ১৯৮৯-১৯৯৩

(শতকরা হার হিসেবে)

সাল	যুক্তরাষ্ট্র	সোভিয়েত ইউনিয়ন/রাশিয়া	ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি	অন্যান্য ইউরোপ	চীন	অন্যান্য
১৯৮৯	২৭	৩৯	১৭	১৭	৫	৫
১৯৯০	৩০	৩৪	২৫	৫	৩	৩
১৯৯১	৩৬	২২	২৯	৫	৫	৩
১৯৯২	৪২	১০	২৯	৯	৪	৬
১৯৯৩	৪৭	১২	২৮	৬	৪	৩

সূত্র : World military Expenditure and Arms Transfers, 1993-1994 Washington D.C., U.S. Arms Control and Disarmament Agency, 1995.P.15.

সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করত যে যুদ্ধোত্তর পৃথিবী মস্কোর নিয়ন্ত্রণাধীনে ক্ষমতা বৃদ্ধির এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। ১৯৪৫ সালে নাৎসিবাদের পতনের পর মধ্য ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র বলে বিবেচিত দুটো নগরী– বার্লিন ও ভিয়েনা দখলের জন্য রাশিয়ার লালবাহিনীর ক্ষিপ্রগতিতে ধাবিত হবার মধ্যেই স্টালিনের আগ্রাসী মনোভাব পরিস্ফুট হয়।

সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই নাৎসিদের পরাজয় ও ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের ক্ষমতা অনেকটা নিঃশেষিত হবার ফলে বিশ্বব্যাপী যে 'শক্তি শূন্যতা' বা 'Power vacuum' সৃষ্টি হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজস্ব শক্তি দিয়ে তা পূরণে সচেষ্ট হয়। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত আগ্রাসন রুখতে ছিল বদ্ধপরিকর। এভাবে দুই পরাশক্তির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিম ইউরোপীয় মিত্র দেশগুলো সমাজতন্ত্রের এ আকস্মিক প্রসারে অত্যন্ত সংশয় বোধ করে। তারা সমাজতন্ত্রের সম্ভাব্য প্রসার প্রতিরোধ করতে রুশ ও চীনের বিরুদ্ধে "ধারক নীতি" বা "Policy of Containment" গ্রহণ করে। এ নীতির মূললক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্রের প্রসার রোধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ট্রুম্যান ডকট্রিন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ কংগ্রেসের এক যৌথসভায় বক্তব্য রাখার সময় তাঁর বিখ্যাত মতবাদটি ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ধারক

নীতি বাস্তবায়ন আরম্ভ করে। তিনি গ্রিস ও তুরস্কের তৎকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ওই দুটো দেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য দানের জন্য সুপারিশ করেন। তিনি কংগ্রেসের কাছে গ্রিস ও তুরস্কের জন্য মোট ৪০ কোটি মার্কিন ডলার সাহায্য দানের প্রস্তাব করেন। যদিও ট্রুম্যান মতবাদের আশু করণীয় ছিল গ্রিক ও তুরস্ককে আর্থিক সাহায্য দেয়া, তবু এর মৌখিক অঙ্গিকার ছিল বিশ্বব্যাপী। এ মতবাদ অর্থনৈতিক এবং প্রয়োজন হলে সামরিক উপায়ে সোভিয়েত আগ্রাসন প্রতিরোধ করার ব্যাপারে মার্কিনীদের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করে। এ মতবাদ সম্পর্কে বলা হয় "It marked a major turning point in American and world history". ট্রুম্যান নীতি ক্রমে বিশ্বের সর্বত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে একটি বলয় রচনা করে। এই বলয়ের বাইরে সোভিয়েত প্রভাবকে সীমিত রাখা হয়। দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম বা বার্লিন যে কোনো স্থানে এই বলয় কমিউনিস্ট শক্তি ভাঙতে চেষ্টা করলে, স্থানীয় 'Proxy War'-এর মাধ্যমে আক্রমণকারীকে বলয়ের বাইরে নিক্ষিপ্ত করা হয়।

মার্শাল প্লান

ট্রুম্যান নীতির পরিপূরক ছিল মার্শাল প্লান, এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "Marshall's Plan is, notwithstanding its apparent 'novelty' only a repeatation of the Truman plan for political pressure with the help of dollars..." উল্লেখ্য যে, তদানীন্তন আমেরিকান পররাষ্ট্র সচিব জর্জ মার্শাল ১৯৪৭ সালের ৫ জুন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'মার্শাল প্লান' ঘোষণা করেছিলেন। মার্শাল বলেছিলেন, "It is logical that the United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health to the world, without which there can be no political stability and no assured peace." তিনি আরো বলেছিলেন যে, যেখানে দারিদ্র্য, হতাশা ও লোকসংখ্যা বেশি সেখানেই কমিউনিজম শাখা-প্রশাখা ছড়ায়। সুতরাং যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের দারিদ্র্য দূর না করলে ইউরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। তাঁর এ পরিকল্পনা ছিল মূলত পশ্চিম ইউরোপে রাশিয়ার সম্প্রসারণ প্রতিরোধে একটি কর্মসূচি। মার্শাল পরিকল্পনা ছিল পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়ারই নামান্তর। লক্ষণীয় যে, প্যারিস সম্মেলনে তৎকালীন রুশ মন্ত্রী মলোটভ অত্যন্ত তীব্রভাবে মার্শাল প্লান-এর সমালোচনা করেছিলেন। অধিকন্তু তিনি এটিকে আমেরিকার 'সাম্রাজ্যবাদী নকশা' এবং "Endclavement of Europe" বলে অভিহিত করেছিলেন।

ব্রাসেলস চুক্তি

এভাবে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা লড়াই ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ ইউরোপের মোট ১৬টি দেশ মার্শাল প্লান-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের চাপে পূর্ব ইউরোপের ৮টি দেশ মার্শাল প্লান-এ যোগদানে বিরত থাকে। এ সব দেশ হচ্ছে যথাক্রমে আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া। ইউরোপ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে থাকে ট্রুম্যান নীতি ও

মার্শাল প্লান সমর্থনকারী ১৬টি দেশ। এগুলো হচ্ছে—ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, গ্রিস, আইসল্যান্ড, লুক্সেমবুর্গ, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ও তুরস্ক। অপর দিকে রয়ে যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া তার তাবেদার আটটি দেশ। মার্শাল প্লান-এর পর 'BENELUX' অর্থাৎ বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবুর্গ একটি সাধারণ শুল্কনীতি গ্রহণ করে বাণিজ্যের উন্নতির জন্য একটি চুক্তি করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এতে যোগ দিলে ব্রাসেলস সন্ধি জোট গঠিত হয়। এতে বলা হয় যে, ৫০ বছরের জন্য স্বাক্ষরকারী দেশগুলো পারস্পরিক আত্মরক্ষা, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলো। পরবর্তীকালে তুরস্ককে এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

মার্শাল পরিকল্পনা এবং ব্রাসেলস সন্ধি জোট গঠন করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন দারুণ ক্ষিপ্ত হয়। সোভিয়েত নেতারা ধারণা করেন যে, মার্শাল প্লান-এর সহায়তায় পশ্চিমের এই দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই রুশবিরোধী জোটে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, ইউরোপের পশ্চিমভাগে অর্থনৈতিক ভাঙনের ফলে সমাজতান্ত্রিক দলগুলো নির্বাচনের যে সফলতা পাচ্ছিল তা বিনষ্ট হবে। তৃতীয়ত, পশ্চিম ইউরোপে রুশ প্রভাববিস্তারের পথ বন্ধ হবে। চতুর্থত, যদি সাবেক পশ্চিম জার্মানিকে মার্শাল প্লান-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে পশ্চিম জার্মানির অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু জ্যামিতিক হারে বাড়বে না, সেই সঙ্গে অস্ত্রবলও বাড়ার সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমের হাতে আণবিক বোমা থাকায় স্বভাবতই রাশিয়া আতঙ্কিত ছিল।

কমিনফর্ম

ব্রাসেলস সন্ধি ও মার্শল প্লান-এর প্রত্যুত্তরে রাশিয়া ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে কমিনফর্ম বা Communist Information Bureau গঠন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে শাসিত ৮টি দেশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কঠিন নিয়ন্ত্রণে রাখা। মার্শাল প্লান-এর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া ছিল চেকোশ্লোভাকিয়ায় বৈধ সরকার উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা। অস্ট্রিয়া থেকে লাল ফৌজ এনে বৈধ সরকার ভেঙে ফেলা হয়। বার্লিন অবরোধ ছিল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্যায়। মার্শাল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৮ সালের ১ এপ্রিল সাবেক পশ্চিম বার্লিনকে স্থলপথে অবরোধ করে। শেষ পর্যন্ত বার্লিন অবরোধ নিষ্ফল হলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম বার্লিনের যোগাযোগকারী স্থলভাগ পুনরায় খুলে দেয়। এটি ছিল মস্কোর নীতিগত ও কৌশলগত পরাজয়।

কমিকন

এরপর ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে "মার্শাল প্লান"-এর প্রতিপক্ষ হিসেবে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে সোভিয়েত আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে মস্কোতে 'পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্য পরিষদ' বা Council for Mutual Economic Assistance (COMECON) গঠন করা হয়। প্রাথমিকভাবে পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া,

হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হলেও পরে পূর্ব জার্মানি, আলবেনিয়া এমনকি উত্তর কোরিয়া ও তদানীন্তন উত্তর ভিয়েতনাম এই দুটো এশিয়ান দেশও এর সদস্য হিসেবে যোগদান করে।

ন্যাটো

এমতাবস্থায় ঠাণ্ডা লড়াই চললেও, যে কোনো সময় তা সশস্ত্র সংঘাতে পরিণত হতে পারত। ব্রাসেলস চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর পক্ষে সোভিয়েত আগ্রাসন প্রতিরোধ করা সম্ভবপর ছিল না। ১৯৪৮ সাল থেকে আমেরিকা ঠাণ্ডা লড়াই ও তজ্জনিত বড় যুদ্ধের আশঙ্কায় নিজস্ব অস্ত্রসজ্জা করছিল এবং আণবিক অস্ত্রভাণ্ডারও মজুদ করছিল। এ সময় ব্রাসেলস চুক্তির ভিতর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুক্ত করাতে পশ্চিমী আত্মরক্ষা ব্যুহ আরো জোরদার হবে মনে করা হয়। এজন্য ১৯৪৯ সালে ন্যাটো চুক্তি দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১টি দেশের সঙ্গে ২০ বছরের জন্য আত্মরক্ষামূলক একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে। এই ১১টি দেশ ছিল যথাক্রমে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, নরওয়ে, আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, পর্তুগাল ও কানাডা। ১৯৫২ সালে গ্রিস ও তুরস্ককে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৫ সালে সাবেক পশ্চিম জার্মানি এর সদস্যপদ লাভ করে। পরবর্তীকালে স্পেন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত হয়। ন্যাটো সম্পর্কে যা হয়েছে: "The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all". অর্থাৎ ন্যাটোভুক্ত একটি দেশের উপর হামলার অর্থ হচ্ছে, ন্যাটোভুক্ত প্রতিটি দেশের উপর হামলা। এতে আরো বলা হয়, এ ক্ষেত্রে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো যৌথভাবে এই হামলা মোকাবিলা করবে। প্রখ্যাত আমেরিকান সেনাপতি ডি আইনজেনহাওয়ারের নেতৃত্বে প্রথম ন্যাটো সংগঠিত করা হয়। ন্যাটোর হাতে ছিল মোট ২৫ ডিভিশন পদাতিক সেনা। সেই তুলনায় সোভিয়েত বলয়ের হাতে ছিল ২৪০ ডিভিশন পদাতিক সেনা। সুতরাং ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোকে আত্মরক্ষা ও "Balance of Power"–এর জন্য আণবিক বোমা বা ক্ষেপণাস্ত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স আণবিক বোমা তৈরি করে। ন্যাটো জোট গঠিত হলে ঠাণ্ডা লড়াই চরম সীমায় পৌঁছে যায়।

ওয়ারশ জোট

সামরিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ন্যাটোর বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের এটি ছিল একটি পাল্টা ব্যবস্থা। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশ রুমানিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, সাবেক পূর্ব জার্মানি, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, সাবেক চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত বিশ বছর মেয়াদি এক চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৫ সালের ১৪ মে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে Warsaw Treaty of Friendship, Co-operation and Mutual Assistance- The Warsaw Pact-এর জন্ম হয়।

সারণি : ৫

আঞ্চলিক পর্যায়ে অস্ত্র আমদানির পরিমাণ, ১৯৯১-১৯৯৩

অঞ্চল	ব্যয় (ডলার, বিলিয়ন)	বিশ্বের মোট আমদানির শতকরা হার
মধ্যপ্রাচ্য	৩১,৬৯০	৪১
পশ্চিম ইউরোপ	১২,৯৪০	১৭
পূর্ব এশিয়া	১০,৬৩৫	১৪
উত্তর আমেরিকা	৫,৮৪০	৮
দক্ষিণ এশিয়া	৪,৫১৫	৬
আফ্রিকা	২,০১৫	৩
দক্ষিণ আমেরিকা	১,৪০০	২
পূর্ব ইউরোপ	১,৩০০	২
অন্যান্য	৬,২১৫	৮
বিশ্ব	৭৬,৫৫০	১০০

সূত্র World Military Expenditure and Arms Transfers, 1993-1994 (Washington, D.C. : US. Arms Cntrol and Disarmament Agency, 1995) পৃষ্ঠা-১০।

ওয়ারশ চুক্তি জোটের শর্তানুসারে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপে তার সেনাদল রাখার অধিকার পায়। কোনো সদস্য প্রতিবেশী দেশে সমাজতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলে ওয়ারশ চুক্তি অনুযায়ী সেই দেশে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তা দমন করা হয়। এভাবে ১৯৫৩ সালে পূর্ব জার্মানি, ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরি, ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত মডেলের সমাজতন্ত্র থেকে বিচ্যুতির অভিযোগে লালফৌজের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল।

এভাবে ইউরোপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে দুই শক্তিশিবিরে বিভক্ত হয়। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মাঝে এক ধরনের বিরোধ রেখা গড়ে ওঠে। উভয় বিরোধী জোটের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করে। উভয় শক্তি জোটই পরস্পর শক্ত অবস্থান দৃঢ় করে। ক্রমান্বয়ে ইউরোপের বাইরেও সমগ্র বিশ্বজুড়ে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বিস্তার অব্যাহত থাকে। বিশেষত, তৃতীয় বিশ্বের নিরপেক্ষ দেশগুলোতে রাজনৈতিক প্রভাব ও জোটভুক্ত করার প্রয়াস ছিল লক্ষণীয়।

যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে কতকগুলো আঞ্চলিক চুক্তি সম্পাদন করে। এগুলো হচ্ছে– ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলোর সাথে Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, সংক্ষেপে RIO Treaty, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সাথে ANZUS চুক্তি (১৯৫১), দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানের জাতীয়তাবাদী সরকারের সাথে Bilateral Security Treaty (১৯৫৩ ও ৫৪)। এছাড়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় SEATO (South-East Asia Treaty Organization) এবং South-East Asia Collective Defence Treaty (১৯৫১) এবং Baghdad Pact (১৯৫৫) উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন NDC বা National Democratic Concept-

ধারণার আলোকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তার প্রভাববলয় বিস্তার অক্ষুণ্ন রাখে। এই তত্ত্ব অনুসারে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পূর্ব-অবস্থাকে বোঝায়। যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী, সেহেতু এই দেশগুলোকে সমর্থন করা যায়, যাতে করে তারা সমাজতন্ত্রের পথে যেতে পারে। এই ছিল সোভিয়েত নীতি।

পরাশক্তিবর্গের বিশ্বজুড়ে পরস্পর বিরোধী নীতির ফলে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ও স্থায়ী যুদ্ধ ও সংঘাতের সূচনা হয়েছিল। ইউরোপের বাইরে কোরিয়া, ভিয়েতনাম, আরব-ইসরাইল, ভারত-পাকিস্তান ও আফ্রিকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বিস্তার ঘটে। এভাবে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে সমগ্র বিশ্ব দুটি বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উত্তেজনা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঠাণ্ডা লড়াই অত্যন্ত প্রবল উত্তেজনাকর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এ সময় ঠাণ্ডা লাড়ইয়ের দুই প্রবল প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। বিশেষ করে আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলোতে তারা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জোর প্রয়াস চালায়। যদিও তৃতীয় বিশ্বের এ দেশগুলো পূর্ব-পশ্চিমের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ নীতি (Nonalignment Policy) অবলম্বন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলোতে সামরিক সহায়তা প্রদান করে। একই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইল ও দক্ষিণ কোরিয়াতে অস্ত্র ও পরমাণু অস্ত্রের সরঞ্জাম সরবরাহ করে। ফলে বিশ্বজুড়ে মার্কিন-সোভিয়েত অত্যন্ত হিংসাত্মক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে কোরিয়ার যুদ্ধ, ১৯৫৪ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও ষাটের দশকে কিউবান মিসাইল সংকটকে কেন্দ্র করে উভয় পরাশক্তিই সরাসরি যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিল। ইউরোপে দুই শক্তি জোট—ন্যাটো ও ওয়ারশতে বিপুলসংখ্যক পারমাণবিক সমরাস্ত্র মজুদ করায় সেখানে পুরো সত্তর দশকে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল এবং এক সময় এখানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল।

সুতরাং পরমাণু শক্তিধর পরাশক্তিবর্গ বিশ্বকে সম্ভাব্য পরমাণু যুদ্ধের বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পরস্পরের মধ্যে সমঝোতার নীতি অবলম্বন করে। উভয় জোটই পরস্পরের সাথে সহাবস্থানে উদ্যোগী হয়। ইতিহাসে পরাশক্তিবর্গের সম্পর্কের এ অধ্যায়কে Peaceful Co-existence বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলা হয়। রুশ নেতা ক্রুশ্চেভ সর্বপ্রথম পশ্চিমা জোটের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা ঘোষণা করেন। বিশেষ করে উভয় পরাশক্তির মাঝে পরমাণু অস্ত্রের বিস্তার, আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের উদ্ভাবন, পরস্পরের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পূর্বাভাস বহন করেছিল। আর পরমাণু যুদ্ধের এ সম্ভাব্য ভীতি উভয়কে সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী করে তুলেছিল।

সারণি : ৬

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পারমাণবিক পরীক্ষার ঘটনাপঞ্জি

১৯৪৯	প্রথম সোভিয়েত পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ (২৯ আগস্ট)। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলে মন্টেবেলো দ্বীপে প্রথম ব্রিটিশ আণবিক বোমার বিস্ফোরণ (অক্টোবর)। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এনিউটেক এটোলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ (নভেম্বর)।
১৯৫৭	ভারত মহাসাগরের ক্রিস্টমাস দ্বীপে ব্রিটেনের প্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ (মে)।
১৯৬০	সাহারা মরুভূমিতে ফ্রান্সের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ (ফেব্রুয়ারি)।
১৯৬৪	চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ঝিনজিয়াং প্রদেশে চীনের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ (অক্টোবর)।
১৯৭৪	ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ (মে)।
১৯৯৩	দক্ষিণ আফ্রিকার স্বীকারোক্তি তারা পারমাণবিক বোমা বানিয়েছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালে তা ধ্বংস করে দেয়া হয় (মার্চ)।
১৯৯৪	উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা (অক্টোবর)।
১৯৯৫	ভূ-গর্ভে চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ (মে)। ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা (মে) ও মরুরোয়া এটলে ফ্রান্স কর্তৃক ভূ-গর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষা (সেপ্টেম্বর)।
১৯৯৬	ফ্রান্স কর্তৃক ষষ্ঠ ও চূড়ান্ত পারমাণবিক পরীক্ষা (জানুয়ারি)। ঝিনজিয়াং প্রদেশে চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ (জুন)।
১৯৯৭	নেভাদা মরুভূমিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিতর্কিত পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা (জুলাই)।
১৯৯৮	ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক পারমাণবিক বিস্ফোরণ (মে)।

দাঁতাত (Detente) বা উত্তেজনা প্রশমন

ষাটের দশকের শুরুতে দুই পরাশক্তির মধ্যে সামরিক উত্তেজনা অত্যন্ত বেশি মাত্রায় প্রসারিত হয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৬১ সালের এপ্রিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্তৃক কিউবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিরোধী অভিযানে সহায়তা প্রদান, একই বছর পূর্ব জার্মানিতে সোভিয়েত সমর্থনে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনকে বিভক্তকারী প্রাচীর (Berlin Wall) নির্মাণ, ১৯৬২ সালে সংঘটিত কিউবান মিসাইল সংকট (Cuban Missile Crisis)—এই উত্তেজনা বৃদ্ধির পশ্চাতে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিউবান মিসাইল সংকট ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ ও উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায়। এ সংকটকে কেন্দ্র করে উভয় পরাশক্তির মধ্যে নতুন সম্পর্কের উদ্ভব হয়। তারা বিশ্বকে পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত করতে ও উভয়ের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন করতে সম্মত হয়। মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ (Hotline) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে উভয় পরাশক্তির মধ্যে এ উত্তেজনা প্রশমন অবস্থাকে দাঁতাত (Detente) বলা হয়। সত্তরের দশকের শেষের দিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের উত্তেজনা মাত্রাহারে প্রশমিত হয়ে আসে। যদিও সত্তর দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্য সংকট, সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ায় সামরিক অভিযান প্রভৃতি বিষয় কিছুটা বিপত্তির সৃষ্টি করেছিল। ১৯৬৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত

ইউনিয়ন শান্তিপূর্ণভাবে মহাকাশ (Outer Space) ব্যবহার সংক্রান্ত এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৬৯ সালে রুশ-মার্কিনের এ সহযোগী মনোভাব পরমাণু বিরোধ চুক্তি স্বাক্ষরে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন এবং কৌশলগত অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি SALT-1 স্বাক্ষর করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৯ সালে উভয় পরাশক্তি ওয়াশিংটনে কৌশলগত অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি SALT-2 স্বাক্ষর করে। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে তথা আশির দশকের শুরুতে রাশিয়া কর্তৃক প্রতিবেশী আফগানিস্তানে সামরিক অভিযানকে কেন্দ্র করে রুশ-মার্কিন সম্পর্ক পুনরায় উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। আফগান সংকটকে কেন্দ্র করে উভয় পরাশক্তিই পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। তবে ১৯৯০ দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভক্তি ও সমাজতন্ত্রের পতনের পর স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

স্নায়ুযুদ্ধকালীন সংকট : কোরিয়া ও কিউবা

স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে দুটো সংকটের কথা বারেবারে আলোচনায় এসেছে। এই দুটো সংকটের একটি হচ্ছে, কোরিয়া, অপরটি কিউবা। কোরিয়া সংকট শেষ পর্যন্ত সেখানে যুদ্ধের জন্ম দিলেও কিউবা সংকটের গভীরতা, ব্যাপ্তি ও প্রভাব ছিল অনেক বেশি। কেননা কিউবা সংকট নিয়ে দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ষাটের দশকের শুরুতে একটা পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল। কোরিয়া ও কিউবা, উভয় সংকটের মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধকালীন দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভাববলয় বিস্তারের রাজনীতিতে লিপ্ত হয়েছিল। ওই দুটো সংকটকে কেন্দ্র করেই দুটি পক্ষের জন্ম হয়েছিল। একদিকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র। উভয় শক্তিই চেয়েছিল উন্নয়নশীল বিশ্বকে নিজেদের প্রভাববলয়ে নিয়ে আসতে। সত্তরের দশকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন, কিউবাকে ওই মুক্তিসংগ্রামে সামরিকভাবে জড়িত হতে উৎসাহিত করা এবং আফ্রিকায় সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসারদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাগ্রহণ করে সমাজতন্ত্র নির্মাণের উদ্যোগের প্রতি সমর্থন, এ সবই ছিল কিউবা সংকটের 'ফলোআপ'। কিউবা সংকটকে কেন্দ্র করে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়নি সত্য, তবে কোরিয়া সংকট পূর্ব এশিয়ায় একটি বড় ধরনের যুদ্ধের জন্ম দিয়েছিল। আর সেই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে গিয়েছিল। ১৯৫০ সালে সেখানে যুদ্ধ হয়েছিল, তাও দুই কোরিয়ার মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়া বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে এটাও একটা উল্লেখ করার মতো ঘটনা। জার্মানি ও কোরিয়া ছিল বিভক্ত সমাজ। কিন্তু ইউরোপে *'ভেলভেট রেভ্যুলুশন'* জার্মানিকে একত্র করেছিল, কিন্তু কোরিয়া একত্র হয়নি। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিনগুলোতে সেটাই ছিল বড় প্রশ্ন দুই কোরিয়া আদৌ একত্র হবে কিনা। ২০০৮ সালে এসেও দুই কোরিয়া একত্র হয়নি। তবে ২০০৭ সালের শেষের দিকে দুই কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে বৈঠক (যা ছিল বিগত ৫৭ বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার) এই একত্রীকরণের পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে বলে অনেকে মনে করেন।

সারণি : ৭

দুই কোরিয়ার মধ্যে পার্থক্য

	উত্তর কোরিয়া	দক্ষিণ কোরিয়া
মাথাপিছু জিডিপি	৯০৪ ডলার	৭৪৬৬ ডলার
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার	- ৪.৩%	৫.৬%
জিডিপিতে ঋণের অংশ	৫০.৩%	১৩.৪%
জিডিপিতে সামরিক খাতে ব্যয়	২৭.৪%	৩.৬%
টেক্সটাইল উৎপাদন	১.৯ মিলিয়ন টন	৬০.৪ মিলিয়ন টন

সূত্র Conway W. Henderson, International Relations Conflict and Cooperation at the Turn of the 21st Century, New York, 1998, P. 241.

স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে কোরিয়া নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল। গত বেশ কয়েক বছর ধরেই কোরিয়া উপদ্বীপ বিশেষ করে উত্তর কোরিয়ার রাজনীতি বারেবারে সংবাদপত্রে আলোচিত হয়ে আসছে। আর এই আলোচনার অন্যতম বিষয় হচ্ছে, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি। সেই সাথে যোগ হয়েছে উত্তর কোরীয় কূটনীতিকদের স্বপক্ষ ত্যাগ, দক্ষিণ কোরীয় সীমান্তে উত্তর কোরীয় গোয়েন্দা তৎপরতা ইত্যাদি। উত্তর কোরিয়া ২০০৭ সালে এসে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি পারমাণবিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। সেই থেকে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ছয় জাতি (জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও দুই কোরিয়া) আলোচনা চলে আসছে। তবে বিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি সেখানে নানা জটিলতার জন্ম দিয়েছিল। ১৯৯৪ সালে দুটো কারণে কোরিয়া সংকট একটি যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। প্রথমটি ছিল উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে উত্তর কোরিয়ার সম্পর্কের অবনতি। আর দ্বিতীয়টি ছিল উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম ইল সুং-এর মৃত্যু। কিম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতা এককভাবে পরিচালনা করে আসছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতা কাদের হাতে থাকবে, এটা নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। সে দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছিল। ছেলে কিম ইল জং উত্তর কোরিয়ার পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সাম্প্রতিককালে কোরীয় উপদ্বীপে যেসব ঘটনা ঘটছিল, তা সেখানে একটি বড় ধরনের সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে। এই সঙ্কটে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মতো দেশও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ায় প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র বসানোর পর থেকেই ওই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। দক্ষিণ কোরিয়ায় প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র বসানোর অর্থ ছিল সরাসরি উত্তর কোরিয়ার উপর চাপ প্রয়োগ করা। এরপর দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন ও দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনীর উদ্যোগে 'টিম স্পিরিট' নামে একটি যৌথ সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর এভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলছিল। এক সময় মার্কিন প্রভাবাধীন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি উত্তর কোরিয়ায় সব ধরনের

প্রযুক্তিগত সাহায্য বাতিল করে দেয়। ফলে উত্তর কোরিয়া উক্ত সংস্থা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল ও সংস্থার একজন পরিদর্শককে তার দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল। এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছিল যে, আন্তর্জাতিক আণবিক সংস্থাকে উত্তর কোরিয়ার প্রতিটি পারমাণবিক প্রকল্প পরিদর্শনের অনুমতি দিতে হবে। উত্তর কোরিয়া ওই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল এই যুক্তিতে যে, এটা তার সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তবে পারমাণবিক প্রকল্পগুলো পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে উত্তর কোরিয়ার কখনোই কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থাকে তার স্বার্থে ব্যবহার করছিল, উত্তর কোরিয়ার আপত্তি ছিল সেখানেই।

কোরীয় উপদ্বীপে ওই উত্তেজনার আলোকে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার কোরিয়া সফর করেছিলেন নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে। তাঁর সফরের উদ্দেশ্য ছিল একটাই–কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা কমানো। এ ব্যাপারে তিনি কিছুটা সাফল্য পেয়েছিলেন। জিমি কার্টার উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া সফর করেছিলেন। তাঁর ওই সফরের মধ্য দিয়েই দুই কোরিয়ার মধ্যে একটি সংলাপের সম্ভাবনার জন্ম হয়েছিল। তিনি উত্তর কোরিয়ার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট কিম-ইল সুং-এর সাথে দেখা করে তার একটি বার্তা দক্ষিণ কোরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট কিম ইয়ং স্যাম-এর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

১৯৮০ সালের পর থেকে পুনরেকত্রীকরণের লক্ষ্যে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে দুই কোরিয়ার তথ্যমন্ত্রীরা তিন তিনবার আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। তবে ১৯৪৫ সালে কোরিয়ার বিভক্তির পর–শীর্ষ পর্যায়ে কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। বলা ভালো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়াকে স্বীকৃতি দেয়নি। উত্তর কোরিয়া এখন স্বীকৃতি চাইছে। দীর্ঘ প্রায় ৬২ বছর কোরিয়া একটি বিভক্ত সমাজ। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া নামে বিভক্ত কোরিয়ার দুটো অংশে দুধরনের সমাজব্যবস্থা চালু রয়েছে। উত্তর কোরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও, দক্ষিণ কোরিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে দক্ষিণ কোরিয়া এই মুহূর্তে অন্যতম একটি শক্তি না হলেও, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রবৃদ্ধি ও তার অর্থনীতিকে একটি শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বঅর্থনীতির উঠতি শক্তি। ১ লাখ ২০ হাজার ৫৩৮ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট উত্তর কোরিয়ার লোকসংখ্যা ২ কোটি ২৪ লাখ ২০ হাজার। অন্যদিকে ৯৯ হাজার ২শ ২২ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট দক্ষিণ কোরিয়ায় লোকসংখ্যা ৪ কোটি ২৮ লাখ। এক সময় যুক্ত কোরিয়া চীন ও জাপানের কলোনি ছিল। ১৮৯৫ সালে চীন কোরিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯০৪-১৯০৫ সালে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যকার যুদ্ধের পর কোরিয়া প্রকৃতপক্ষে জাপানের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯১০ সালের ২৯ আগস্ট জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে কোরিয়াকে সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর মার্কিন ও সাবেক সোভিয়েত বাহিনী কোরিয়ায় ঢুকে পড়ে এবং জাপানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য কৌশলগত কারণে

কোরিয়াকে দুভাগ করে এক অংশে মার্কিন বাহিনী ও অপর অংশে সোভিয়েত বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতেই কোরিয়ার উত্তরাঞ্চলে (আজকে যা উত্তর কোরিয়া) একটি কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে নিউ ন্যাশনাল পার্টির সাথে নবগঠিত কোরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি একীভূত হয়ে কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি গঠন করে। একই সাথে ওয়ার্কার্স পার্টি কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী বেশকিছু গ্রুপ ও উপদল নিয়ে একটি ডেমোক্রেটিক প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট গঠন করে। জাতিসংঘের আহ্বানে সেখানে নির্বাচনের আয়োজন করা হলেও, দেখা গেল নির্বাচন শুধু দক্ষিণ কোরিয়াতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর উত্তর কোরিয়া একটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে তার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছিল। সেই থেকে উত্তর কোরিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে আছে এবং পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রের সাথেই তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে।

১৯০৫ সালে দুই কোরিয়া পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। ১৯৫০ সালের ২৫ জুন উত্তর কোরীয় বাহিনী ৩৮তম সমান্তরাল রেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করলে যুদ্ধ বেধে যায়। জাতিসংঘ সেই যুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়াকে সমর্থন করার জন্য সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। জাতিসংঘ বাহিনী মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে উপস্থিত হলে ১৯৫০ সালের ২৬ নভেম্বর চীন উত্তর কোরিয়ার পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং চীনা সৈন্যরা দক্ষিণ কোরিয়ার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। ১৯৫১ সালের এপ্রিলে জাতিসংঘ বাহিনী ৩৮তম সমান্তরাল রেখা পুনরুদ্ধার করে। ১৯৫১ সালের ২৩ জুন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব কার্যকর হয় দুবছর পর, ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই। যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ঠিক এক মাসের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকে আইনগত রূপ দেয়া হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করে। অন্যদিকে, উত্তর কোরিয়া ১৯৬১ সালে চীনের সাথে একটি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে। গত প্রায় ৫৪ বছরে কোরিয়ার রাজনীতিতে দেখা যায়, দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীর অস্ত্রের একমাত্র উৎস হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে, চীন উত্তর কোরিয়াকে অস্ত্র যুগিয়ে আসছে। যদিও প্রথমদিকে উত্তর কোরিয়া সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেও বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছিল। চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বে উত্তর কোরিয়া কখনও সরাসরিভাবে কোনো পক্ষ নেয়নি। বারবারই পিয়ংইয়ং, বেইজিং ও মস্কোর সাথে ভালো সম্পর্ক রক্ষা করে আসছে। তবে পর্যবেক্ষকদের কেউ কেউ বলছেন, শেষের দিকে উত্তর কোরিয়ার সাথে মস্কোর সম্পর্ক তেমন উষ্ণ ছিল না।

উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক প্রকল্প নিয়ে সে দেশের উপর অব্যাহত চাপ প্রয়োগের একটা প্রেক্ষাপট আছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ব্যাপারে মার্কিন নীতির পরিবর্তন হয়েছে। এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সমর্থন নিয়ে আন্তর্জাতিক আসরে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটি অ্যালায়েন্স গড়ে তুলেছিল।

সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়া এই অ্যালায়েন্সের বিরোধিতা করেছে কিংবা সোভিয়েত-মার্কিন দ্বন্দ্বে সরাসরি সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে কথা বলেছে—এ রকমটি জানা যায় না। উত্তর কোরিয়া চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে সমর্থন না করলেও কখনও সরাসরি বিরোধিতা করেনি। সম্ভবত চীন-উত্তর কোরিয়া মৈত্রীচুক্তি এ ব্যাপারে একটি ভূমিকা পালন করেছিল। এই মৈত্রীচুক্তির ফলে উত্তর কোরিয়া কর্তৃক চীনের বৈদেশিক তথা সামরিক নীতির প্রতি সমর্থনের কথা জানা যায়। চীন-মার্কিন সম্পর্ক দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক আসরে একটি অবস্থান গ্রহণ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর চীন-মার্কিন সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন চীনে মানবাধিকার লংঘনের প্রশ্ন তুলছে। চীনের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের কথাও বলছে মার্কিন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। সুতরাং চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের অবনতির সাথে সাথে অপর একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ উত্তর কোরিয়ার উপর যে চাপ আসবে, তা ধরেই নেয়া হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব স্বাভাবিক কারণেই উত্তর কোরিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন দেখতে চাইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতিতে যদি পরিবর্তন না আসে, তাহলে কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা কমবে না। মার্কিনী এই 'আগ্রাসী' নীতি পরিত্যাগ করতে হবে। একদিকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক আণবিক সংস্থাকে তার নিজস্বার্থে ব্যবহার করে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক প্রকল্পে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে পরিদর্শনের নামে উত্তর কোরিয়ার উপর 'চাপ' প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র একটি পক্ষ অবলম্বন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই ভূমিকা নিন্দাজনক ও তা উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থের পরিপন্থী। মার্কিনী এই ভূমিকা যদি সর্বত্র চলতে থাকে, তাহলে বিশ্বে আবার নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধের জন্ম হবে। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোকে তখন বাধ্য করবে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী একটি শিবিরে তাদের অবস্থান গ্রহণ করতে।

কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা শুধু পূর্ব এশিয়ার স্থিতিশীলতার জন্যই হুমকি নয় বরং তা বিশ্বের স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে তুলেছিল। ওই অঞ্চলে উত্তেজনা যদি স্থায়িভাবে কমানো না যায়, তাহলে তা ধীরে ধীরে ওই অঞ্চলে একটি পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেবে। ফলে ওই অঞ্চলের উন্নয়ন ব্যাহত হবে। উত্তর কোরিয়া এনপিটি বা পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তাররোধ চুক্তি স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার প্রতি যদি এভাবে 'চাপ' প্রয়োগ অব্যাহত থাকে, তাহলে উত্তর কোরিয়া এনপিটি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারে। অব্যাহত এই 'চাপ'-এর পাশাপাশি নিজেদের জ্বালানি চাহিদার কারণেই উত্তর কোরিয়া বাধ্য হয়েছিল পারমাণবিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে এবং শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উত্তর কোরিয়া প্রমাণ করল তাকে হালকাভাবে নেয়া যাবে না। ছয় জাতি আলোচনায় উত্তর কোরিয়াকে জ্বালানি সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। বিনিময়ে ইতোমধ্যে তার একটি পারমাণবিক প্রকল্প বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন দেখতে হবে ভবিষ্যতে দক্ষিণ কোরিয়া তথা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে কিনা।

দুই কোরিয়ার মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই কোরীয় উপদ্বীপের উত্তেজনা হ্রাস করা সম্ভব বলে মনে হয়। ইতোমধ্যে দুই কোরিয়ার নেতারা দ্বিতীয়বারের মতো শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন গত অক্টোবরে (২০০৭)। তিন দিনব্যাপী আলোচনা চলে। দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট রোহ মু হিউন গিয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ায়। রোহ মু হিউন ও কিম জং ইলের মধ্যকার আলোচনায় দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের প্রশ্নে কোনো আলোচনা হয়নি সত্য, কিন্তু এটা একটা পথ করে দিল। আগামি শীর্ষ বৈঠকে বিষয়টি কোনো না কোনোভাবে আলোচিত হবে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের ১২ জুন তৎকালীন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম দাই জং প্রথমবারের মতো শীর্ষবৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন কিম জং ইলের সাথে।

কোরিয়ার সমস্যা কোরিয়ার জনগণের প্রতিনিধিদের হাতেই ছেড়ে দেয়া উচিত। তারাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। কোনো চাপিয়ে দেয়া 'সিদ্ধান্ত' হিতে বিপরীত হতে পারে। এ অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে হলে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন যদি আন্তরিক না হয়, তাহলে উত্তর কোরিয়া তার পারমাণবিক কর্মসূচি থেকে পিছপা হবে না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার উপরও আজ অনেক কিছু নির্ভর করছে। কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসুক, আমরা এটা আশা করব। উত্তর কোরিয়ার সমস্যা অনেক। দেশটিতে গত বেশ কয়েকবছর ধরেই দুর্ভিক্ষ চলছে। খাদ্য ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে পারছে না দেশটি। এর উপরে রয়েছে জ্বালানি সংকট। বিংশ শতাব্দীতে দুই কোরিয়া একত্র হয়নি সত্য, কিন্তু একুশ শতকে এসে দেশ দুটো যে ক্রমেই একত্রীকরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। সবচেয়ে বড় কথা উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে চীনা নীতিতেও পরিবর্তন আসছে। চীন আর আগের মতো প্রতিটি ইস্যুতেই উত্তর কোরিয়াকে সমর্থন করছে না। তবে কবে নাগাদ দেশ দুটি একত্র হবে, তা এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

কিউবা

কিউবা সংকট স্নায়ুযুদ্ধকালীন একটি বড় ধরনের সংকটের সৃষ্টি করেছিল, যা কিনা দুই পরাশক্তি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি পারমাণবিক যুদ্ধের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত উভয় পরাশক্তি সংযম প্রদর্শন করায় পারমাণবিক যুদ্ধ এড়ানো গিয়েছিল। সংকট সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৬২ সালে কিউবায় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ক্ষেপণাস্ত্র বসানোকে কেন্দ্র করে। যদিও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল কিউবার নিরাপত্তার স্বার্থে ওই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো বসানো হয়েছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের ভয় ছিল ওই ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানা সম্ভব। কেননা কিউবার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামির দূরত্ব মাত্র ৯০ মাইল। এখানে মনে রাখতে হবে ১৯৫৯ সালে কিউবায় ফিদেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন সমাজতান্ত্রিক ওই সরকারকে সহজভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। তারা কিউবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের উৎখাতের জন্য ফ্লোরিডায় নির্বাসিত কিউবানদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক কমিটি গঠন করে। তাদের

সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। একটি পরিকল্পনার আওতায় ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে ক্যাস্ট্রো বিরোধী ওই গ্রুপ 'বে অব পিগস' নামে একটি স্থানে অবতরণ করে। কথা ছিল মার্কিন যুদ্ধ বিমান দিয়ে তাদের সাহায্য করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য না করায় 'বে অব পিগস্'-এর অভিযান ব্যর্থ হয়। কিন্তু ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তি অনুযায়ী কিউবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়। ১৯৬২ সালের গ্রীষ্মে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবাকে বোমারু বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করে। অক্টোবর মাসের মধ্যে প্রস্তাবিত ৬৪টি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ৪২টি স্থাপন করা হয়। ওই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরে আঘাত হানা যেত। ওই ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনের ফলে যুক্তরাষ্ট্র আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কেনেডি আর সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভ। যুক্তরাষ্ট্র কিউবা থেকে সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহারের দাবি করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ওই দাবি প্রত্যাখ্যান করে অক্টোবরের দিকে (১৯৬২) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জাহাজ কিউবায় পাঠায়। ফলে যুক্তরাষ্ট্র নৌ-অবরোধ সৃষ্টি করে। মার্কিন যুদ্ধজাহাজ অস্ত্রবাহী সোভিয়েত জাহাজের গতিরোধ করে। ওই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব দেয় যে যুক্তরাষ্ট্র যদি কিউবা আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং নৌ অবরোধ প্রত্যাহার করে, তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষেপণাস্ত্র অপসারণের বিষয় বিবেচনা করবে। ক্রুশ্চেভ অপর আরেকটি শর্ত দেন। সেটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তুরস্ক থেকে ক্ষেপণাস্ত্র অপসারণ করতে হবে। কিন্তু কেনেডি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখলেই আলোচনা শুরু হতে পারে। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ওই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। ফলে বিশ্ব একটি পারমাণবিক যুদ্ধের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। কিউবা সংকট থেকে একটা ভালো ফলাফলও পাওয়া গিয়েছিল। কিউবা সংকটকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে দুই পরাশক্তির মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাসে কিছুটা হলেও সাহায্য করে। ১৯৬৩ সালে দুই পরাশক্তি পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে যে আংশিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তা ছিল ওই আলোচনারই ফল। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি 'হটলাইন' স্থাপিত হয়েছিল, তাও ছিল কিউবা সংকটের ফল।

কিউবা বিপ্লব

এখানে কিউবা বিপ্লব সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। কিউবা বিপ্লব বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন কিংবা ভিয়েতনামে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। কিউবাও একই পথ অনুসরণ করেছিল।

কিউবার বিপ্লবের অনেকগুলো দিক আছে। প্রথমত তৎকালীন বাতিস্তা সরকারের দুনীর্তি, অযোগ্যতা, কর্তৃত্বপরায়ণতা ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাব এবং একই সাথে গুম, হত্যার কারণে বিপ্লবীরা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিউবার স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত

করে। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবীরা কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না প্রথমদিকে। The movement নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে তারা সংগঠিত হয়েছিল। পরে পর্যায়ক্রমে ১৯৬৫ সালে তারা কিউবার কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হয়। তৃতীয়ত, বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে ক্যাস্ট্রো যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলেন (এপ্রিল ১৯৫৯)। উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রে তার সমর্থনে জনমত সংগ্রহ করা। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের স্পষ্ট করে বলেছিলেন তিনি কমিউনিস্ট নন। ফলে কিউবার বিপ্লবের মূলউদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারী বাতিস্তা সরকারকে উৎখাত করা। মূলত ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি কিউবায় বাতিস্তা সরকারের পতনের কিছুদিন আগে ১৯৫৩ সালে এই বিপ্লবের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তবে এটা সত্য ক্যাস্ট্রো নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বাতিস্তা সরকারকে উৎখাত করতে চাননি। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি এই সরকারের উৎখাত চেয়েছিলেন। কিউবার বিপ্লবের ইতিহাস ঘেটে দেখা যায় জেনারেল বাতিস্তার শাসনামলের শেষের দিকে বাতিস্তার শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে একজন আইনজীবী হিসেবে ফিদেল ক্যাস্ট্রো আদালতে একটি আর্জি পেশ করেছিলেন। কিন্তু তার সেই আর্জি বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এরপরই তিনি সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা থেকে বাতিস্তাকে উৎখাতের উদ্যোগ নেন। প্রথম দিকে ১২০০ যুবককে নিয়ে তিনি একটি ব্রিগেড গঠন করেছিলেন। এই ব্রিগেড সদস্যদের নিয়ে ১৯৫৩ সালের ২৬ জুলাই সান্টিয়াগো শহরের মনসাদা ব্যারাক ও বেয়ামো সেনাক্যাম্প আক্রমণ করেন। এতে তিনি ব্যর্থ হন। গ্রেফতার হন। তার ১৫ বছরের জেল হয়। আবার ১৯৫৫ সালে তিনি মুক্তিও পান। এরপর তিনি বিপ্লবকে সংগঠিত করতে চলে যান মেক্সিকোতে। এরপর শুরু হয় চূড়ান্ত বিপ্লবের প্রক্রিয়া। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে 'গ্রানমা' জাহাজে করে ৮০ জন বিপ্লবীকে নিয়ে তিনি ফিরে আসেন কিউবাতে। *সিয়েরা মায়েস্ত্রা* পাহাড়ে আশ্রয় নেন বিপ্লবীদের নিয়ে। সেখান থেকেই বিপ্লব পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৫৭ সালের ১৩ মার্চ বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ ছাত্ররা প্রেসিডেন্ট ভবন আক্রমণ করে। কিন্তু সেই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। এরপর এক পর্যায়ে বিপ্লবীদের হাতে পতন ঘটে বাতিস্তা সরকারের।

ক্যাস্ট্রো বিপ্লবের পর *'ইন্টেগ্রেটেড রেভ্যুল্যুশনারী অর্গানাইজেশন অব ২৬ ম্যুভমেন্ট'* নামে একটি সংগঠনের জন্ম দেন। ওই সময় পিপল্স স্যোসালিস্ট পার্টি তাকে সমর্থন করেছিল। ১৯৬২ সালের মার্চে তিনি গঠন করেন *'ইউনাইটেড পার্টি অব দ্যা কিউবান স্যোসালিস্ট রেভ্যুলেশন'*। এই পার্টিই ১৯৬৫ সালের ৩ অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে বলা ভালো বাতিস্তা দু-দুবার ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৪০-৪৪ সাল পর্যন্ত একবার। ওই সময় কমিনিউস্ট পার্টি তাকে সমর্থন করেছিল। জেনারেল বাতিস্তা ১৯৫২ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এরপর থেকেই তিনি স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন। ক্ষমতা দখল করে ক্যাস্ট্রো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ চালান। ১৯৭৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট হন। ২০০৮ সালে তিনি অবসরে যান। ছোটভাই রাউল ক্যাস্ট্রো এখন সে দেশের প্রেসিডেন্ট। দেশটিতে বর্তমানে এক দলীয় সরকার ক্ষমতায়। অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রদের কাছে যুক্তরাষ্ট্র-কিউবা সম্পর্ক অনেকদিন ধরেই আলোচনার একটি বিষয়। কিউবা কী আদৌ তার সমাজতান্ত্রিক নীতি পরিত্যাগ করবে,

নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবারো হাভানায় সরকারের উৎখাতের উদ্যোগ নেবে—এসব প্রশ্ন বারবার মিডিয়ায় ও বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের লেখনীতে উঠে আসছিল। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ধাঁচের সমাজতন্ত্রের পতনের রেশ ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন সমাজতন্ত্রের পতন ঘটল, তখন বলতে গেলে সারা বিশ্বের দৃষ্টি একরকম নিবদ্ধ ছিল কিউবার দিকে। কেননা কিউবা ছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অন্যতম সমর্থক এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল কিউবার অর্থনীতির অন্যতম উৎস এবং সেই সঙ্গে নিরাপত্তার অন্যতম গ্যারান্টার ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের অবর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে কিউবা টিকে থাকতে পারবে কি না—এ প্রশ্নটিও বারবার উচ্চারিত হয়েছে। একই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের মুখে থেকে কিউবা তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে কি না, এটা নিয়েও প্রশ্ন ছিল। আরো একটি প্রশ্ন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে আলোচিত হচ্ছিল তা হচ্ছে কিউবা কি আদৌ তার সমাজতান্ত্রিক নীতিতে কোনো পরিবর্তন আনবে? কেননা চীন ও ভিয়েতনামের মতো দেশেও স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর পরিবর্তন এসেছে। এই দুটো দেশ এখন আর ধ্রুপদী মার্কসবাদ অনুসরণ করে না। তাই খুব সংগতকারণেই প্রশ্ন ছিল কিউবা, চীন বা ভিয়েতনামের পথ অনুসরণ করবে কি না? ইতোমধ্যে ওবামা কিউবা সফর করেছেন (২০১৬)। এর আগে আরেকজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিউবা গিয়েছিলেন ১৯২৮ সালে।

কিউবা-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল কিউবার নিরাপত্তাহীনতা। যুক্তরাষ্ট্র কখনই কিউবায় একটি সমাজতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকার করে নেয়নি। বরং কিউবায় বিপ্লবের পর (১৯৫৯), কিউবা সরকার যখন সারা ল্যাতিন আমেরিকা জুড়ে বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে চাইল, চে গুয়েভারা যখন 'বিপ্লব' সম্পন্ন করার জন্য কিউবা সরকারের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে বলিভিয়ায় গেলেন (সেখানেই তাকে পরে হত্যা করা হয়), তখন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের কাছে ভিন্ন একটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র কখনই চায়নি তার প্রভাবাধীন এলাকায় অন্য কোনো 'শক্তি' প্রভাব খাটাক। 'মনরো ডকট্রিন'-এর আদলে যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছে এ এলাকায় তথা ল্যাতিন আমেরিকায় তার পূর্ণকর্তৃত্ব। কিন্তু কিউবার বিপ্লব যুক্তরাষ্ট্রের এই হিসেব নিকেশে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্র কিউবা বিপ্লবের মাত্র দুবছরের মধ্যে ১৯৬১ সালে ভাড়াটে কিউবানদের দিয়ে কিউবা সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা চালায়। সিআই-এর অর্থে পরিচালিত এই অভিযান *'বে অফ পিগস'*-এর অভিযান হিসেবে খ্যাত। বলাই বাহুল্য ওই অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেমে থাকেনি। ঠিক এর পরের বছর ১৯৬২ সালের অক্টোবরে 'কিউবা সংকট' একটি পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছিল। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করেছিল কিউবায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বসিয়েছে, যা তার নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করেছে, এটা বিবেচনায় নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র একটি নৌ-অবরোধ আরোপ করে যাতে করে কিউবায় কোনো ধরনের মারণাস্ত্র সরবরাহ করা না যায়। এই নৌ-অবরোধ অনেকটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রকে একটি যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন দাবি করে যুক্তরাষ্ট্রকে তুরস্ক থেকে তাদের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহার করে

নিতে হবে। দীর্ঘ ১৩ দিন এই নৌ-অবরোধ বহাল ছিল। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ক থেকে মিসাইল প্রত্যাহার করে নিলে সোভিয়েত ইউনিয়নও কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সরিয়ে নেয়। এর মধ্যে দিয়ে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা কমে গেলেও, সংকট থেকে গিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। দীর্ঘ ৫৪ বছর ধরে এই অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে কিউবা 'যুদ্ধ' করে আসছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পরও মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গিতে এখন অব্দি কোনো পরিবর্তন আসেনি।

প্রেসিডেন্ট ওবামা সম্পর্কোন্নয়নের ও বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা বললেও, এটি খুব সহজ হবে না। কেননা ওবামাকে এ সংক্রান্ত একটি আইন পাস করাতে হবে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে কংগ্রেসে তার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। কংগ্রেসের উভয় কক্ষ এখন নিয়ন্ত্রণ করে রিপাবলিকানরা। রিপাবলিকানরা ওবামার উদ্যোগের ব্যাপারে খুশি নন। আমি একাধিক কংগ্রেস সদস্য তথা সিনেটরের বক্তব্য দেখেছি, যেখানে তারা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ওবামার এই উদ্যোগের সমালোচনা করেছেন। সিনেটর জন মেককেইন ও সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ওবামার বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে সংকুচিত করবে। অন্যদিক সিনেটর রয় ব্লান্ট মনে করেন, এই ঘোষণা ক্যাস্ট্রোকে ক্ষমতায় রাখতে সাহায্য করবে। ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটর রবার্ট মেনডেজ মনে করেন প্রেসিডেন্ট ওবামার ওই সিদ্ধান্ত হচ্ছে কিউবার মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ও স্বৈরাশাসনকে স্বীকার করে নেয়ার সামিল। সিনেটর মেনডেজ নিজে কিউবান আমেরিকান। এতে করে ধারণা করা স্বাভাবিক যে কিউবার উপর থেকে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোনো আইনকে কংগ্রেস অনুমোদন দেবে না। ফলে ওবামার ঘোষণা ও উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত একটি ঘোষণা হিসেবেই থেকে যেতে পারে! যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতাদের দাবি কিউবায় আরো বেশি গণতন্ত্রায়ন। আরো বেশি অর্থনৈতিক উদারীকরণ। মানবাধিকার পরিস্থিতির আরো উন্নতি। একই সাথে রাজনৈতিক সংস্কার। এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা। বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের শর্তে কিউবা সবকিছু 'উন্মুক্ত' করে দেবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে গরবাচেভের সংস্কার কর্মসূচির ফলাফল তাদের অজানা নয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, সংস্কার আনতে গিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গিয়েছিল। চীন ও ভিয়েতনামে অর্থনৈতিক সংস্কার এসেছে। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কার সেখানে আসেনি। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সংস্কার কর্মসূচির 'পেরেস্ত্রোইকা' বাস্তবায়ন করছে ভিয়েতনাম ('দইমই')। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিলে টিপিপি (মুক্তবাণিজ্য) চুক্তি করেছে। চীনের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামকে ব্যবহার করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে ভিয়েতনাম-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। আজ যুক্তরাষ্ট্র যখন কিউবার সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে চাইছে, তখন এ প্রশ্নটিও উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সৎ কিনা? ল্যাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে কর্তৃত্ব বাড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ইতোমধ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে বেশ কয়েকজন ভেনিজুয়েলার ভিআইপির ব্যাপারে। সম্পদ আটক থেকে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ ভেনিজুয়েলার মারাত্মক মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতির। এটা সত্য, হুগো শ্যাভেজের মৃত্যুর পর

ভেনিজুয়েলায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এর চাইতেও খারাপ পরিস্থিতি বিরাজ করছে কলম্বিয়ায় কিংবা মেক্সিকোতে, যেখানে ২০১৪ সালে ৪৩ জন স্কুল শিক্ষার্থীকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। কিন্তু সেখানে কোনো বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। ভেনিজুয়েলার বিষয়টি যে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক, তা আর কাউকে বলে দিতে হয় না। এখন খুব সংগত কারণেই ভেনিজুয়েলার উপর মার্কিনী 'চাপ' যদি বাড়ে, তাহলে কিউবাকে দেয়া তাদের আর্থিক সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে তা কিউবার অর্থনীতিকে আঘাত করবে।

কিউবার সাথে সম্পর্ক উন্নত করে খোদ যুক্তরাষ্ট্রও উপকৃত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যখাত মারাত্মক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র পর্যাপ্ত ডাক্তার, নার্স কিংবা স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করতে পারছে না। স্বাস্থ্যকর্মীদের একটা বড় অংশ আসছে বাইরে থেকে। এ ক্ষেত্রে কিউবার স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা জগৎবিখ্যাত। তারা যুক্তরাষ্ট্রের এই চাহিদা পূরণ করতে পারে। ২০০২ সালে ফিদেল ক্যাস্ট্রো এ ধরনের একটি প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তা গ্রহণ করেনি। ২০১৪ সালে পশ্চিম আফ্রিকায় মারাত্মক ইবোলো রোগ ছড়িয়ে পড়ায়, কিউবার স্বাস্থ্যকর্মীরা সেখানে গিয়েছিলেন। এখন কিউবার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের উন্নত হলে, যুক্তরাষ্ট্র স্বাস্থ্যখাতে উপকৃত হতে পারে।

তবে মূল সমস্যাটিই হচ্ছে মানসিকতার। যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতাদের মানসিকতায় কী পরিবর্তন আসে, সেটাই দেখার বিষয় এখন। গত ১৪ আগস্ট (২০১৫) হাভানায় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে মার্কিন পতাকা উত্তোলনকালে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব জন কেরী বলেছিলেন কিউবা এখন আর শত্রু নয়, বন্ধু। বাস্তবক্ষেত্রে এই 'বন্ধুত্ব' কতটুকু প্রতিফলিত হয়, সেটাই দেখার বিষয় এখন। ওবামার কিছু কিছু বক্তব্যও এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি কি মনে করেন রাউল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বাধীন কিউবায় পরিবর্তন এসেছে? এর অর্থ কী? কিউবা কি আসলেই সব 'উন্মুক্ত' করে দিয়েছে? আমার মনে হয় না। অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় 'কমান্ড' এখনও বজায় রয়েছে। এখানে ভিয়েতনামের 'দইমই' স্ট্রাইলে কিছু কিছু পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, এটা সত্য। বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বিনিয়োগ উন্মুক্ত নয়।

দু দেশের মাঝে এখনও বেশ কিছু বিষয়ে ন্যূনতম ঐকমত্যের অভাব রয়েছে। ওবামার হাভানা সফরের সময়ও তা লক্ষ করা গেছে। মানবাধিকার ইস্যু কিংবা গুয়ান্তানামো বে-তে যুক্তরাষ্ট্রের কারাগার, কিউবাতে রাজনৈতিক বন্দি ইত্যাদি ইস্যুতে দুই রাষ্ট্রপ্রধান হাভানায় সংবাদ সম্মেলনে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এসব ইস্যুতে দুটো দেশের দৃষ্টিভিঙ্গ আলাদা আলাদা। সংবাদ সম্মেলনে রাউল ক্যাস্ট্রো জানিয়েছেন তার দেশে কোনো রাজনৈতিক বন্দি নেই। ওয়াস্তোনামো বে কিউবার কাছে হস্তান্তরিত করারও কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি ওবামা। তবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের। কিউবায় মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এটাও স্বীকার করেননি ক্যাস্ট্রো। স্পষ্টতই এসব ইস্যুতে দুটো দেশের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। যুক্তরাষ্ট্র যাদেরকে 'রাজনৈতিক বন্দি' হিসেবে গণ্য করছে, কিউবা তা করছে না। মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে দেখে কিউবা সেভাবে দেখে না। ফলে মতপার্থক্য রয়েই গেছে।

তবে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই মতপার্থক্য সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। বিশ্ব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে একজন নয়া প্রসিডেন্ট হোয়াইট হাউজে যাবেন। তার মনোভাবের উপর এখন অনেক কিছু নির্ভর করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়া ও কিউবা সংকটে দুই পরাশক্তি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনীতে অবতীর্ণ হয়েছিল। কোরিয়া সংকটকে কেন্দ্র করে সেখানে একটি যুদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু কিউবা সংকট নিয়ে কোনো যুদ্ধ হয়নি। এক অর্থে কোরিয়া ও কিউবায় উদ্ভূত সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। কোরিয়া একত্রীকরণের প্রশ্নটি এখনও ঝুলে আছে। আর কিউবাতে এখনও যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে রেখেছে। স্নায়ুযুদ্ধচলাকালীন ওই দুটো সংকটই বিশ্বরাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি

১৯৮৯ সালের ২ এপ্রিল The New York Times-এর এক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের কথা ঘোষণা করেছে। একই বছর ৩ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বুশ ও সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ মাল্টায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে এক ঘোষণার পর তাদের মধ্যে বিদ্যমান প্রায় অর্ধ শতকের বেশি সময় ধরে চলতে থাকা এ-দ্বন্দ্বের অবসানের কথা সরকারিভাবে স্বীকার করেন। মূলত স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হচ্ছে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের অবসানের পশ্চাতে তত্ত্বগত বাস্তবতা জড়িত আছে বলে অনেকের ধারণা। বহু সমীক্ষকের মতে, The debate over the end of the cold war like the debate over its origin. তবে যাই হোক না কেন স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ছিল সমাজতন্ত্রের উপর পুঁজিবাদী পশ্চিমা গণতন্ত্রের এক ধরনের বিজয়। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে পুঁজিবাদী ধনতন্ত্র বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অধ্যাপক ফ্রানসিস ফুকিয়ামা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The End of History and the Last Man', (১৯৯২) সেই কথাটাই বলেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের কতিপয় দেশে ধনতান্ত্রিক ধারায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো এখন গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের বিপরীতে গণতন্ত্রের স্লোগান জোরালো হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি দু'প্রবল প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব হ্রাস করেছে। বিশ্ব জুড়ে দ্বি-মেরু শক্তির (Bipolar Power System) অবসান করেছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে অনেক মেরু কেন্দ্রিক শক্তিব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানে বিশ্বব্যাপী পরাশক্তিদ্বয়ের যে প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পেয়েছে, তা বেশ কিছু মাঝারি শক্তির উত্থানকে সম্ভবপর করেছে। এসব মাঝারি শক্তি মূলত সামরিক শক্তির জোরে অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রভাব নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে তাই সামরিক দ্বন্দ্বের চেয়ে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব বেশি মাত্রায় পুঞ্জীভূত হচ্ছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে জার্মানির নেতৃত্বে ইউরোপ, চীন ও জাপানের নেতৃত্বে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপসংহার

বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আগের রূপটি নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি এবং সমাজতন্ত্রের অবসান হওয়ার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই সনাতন ঠান্ডা লড়াইয়ের মৃত্যু ঘটে। বর্তমান বিশ্বে প্রকৃতঅর্থে যুক্তরাষ্ট্রই মূলত একক পরাশক্তি। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বনিয়ন্ত্রণের যে স্বার্থসম্বলিত দ্বন্দ্ব ছিল সেগুলো এখন আর নেই। বর্তমান বিশ্বরাজনীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে। রাশিয়া তার নিজস্ব এলাকায় প্রভাববিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে না। তবে একুশ শতকের গোড়াতেই যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের তারতম্য লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন ন্যাটোর সম্প্রসারণ নীতি, পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলোর ন্যাটোর সদস্যপদ লাভ, কাসোভো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ন্যাটোর সামরিক হস্তক্ষেপ, চেচনিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণকে কেন্দ্র করে রুশ-মার্কিন সম্পর্কের কিছুটা অবনতি লক্ষ করা যায়। এদিকে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে সন্ত্রাসবিরোধী তৎপরতা শক্তিশালী হচ্ছে। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র 'সন্ত্রাস বিরোধী' যুদ্ধের কথা ঘোষণা করেছে, সেহেতু মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে এক ধরনের মার্কিন বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। এর মধ্য দিয়ে নতুন করে এক ধরনের 'স্নায়ুযুদ্ধের' জন্ম হয় কিনা, সেটাই দেখার বিষয় এখন।

সহায়ক গ্রন্থ

১. D.S. Mcbllan, W.C. Olson and F.A. Sonderman, The Theory and Practice of International Relations, New York, 1983.
২. D. Rees, The age of Containment : The Cold War, 1945, London, 1967
৩. Charles W. Kegley Jr. and Eugne R. Withkopf, World Politics Trends and Transformation, New York, 1981
৪. Vinay Kumar Malhotra, International Relations, New Delhi, Ammol Publications, 1997.
৫. Peter Calvocoressi, World Politics since 1945. London and New York, Longman, 1984.
৬. W.W. Rostow, The United States in the World Arena, New York, 1960.
৭. Sylvia Woodly Edgington, "The State of Socialist Orientation-A Soviet Model for Political Development', Soviet Review, 8, 1981.
৮. মো. আব্দুল হালিম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯৫
৯. প্রভাতাংশু মাইতি, ইউরোপের ইতিহাসের রূপরেখা, কলিকাতা, ২০০০।

অষ্টম অধ্যায়

জাতিসংঘের উত্থান ও ভূমিকা

The UN is in need of overhaul-a real cleanup.

Madeline Albright
(US Ambassador to the UN, June 1993)

বিংশ শতাব্দীতে জাতিসংঘের জন্ম ও বিকাশ ছিল উল্লেখ করার মতো একটি ঘটনা। দীর্ঘ ৫০ বছর এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন কারণে বারবার আলোচনায় এসেছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘের জন্ম হলেও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সংস্থাটি কতটুকু সফল হয়েছিল, সেটা ছিল একটা বড় প্রশ্ন। জাতিসংঘের পূর্বসূরি *লীগ অফ নেশনস*-এর জন্ম (১৯১৯) হয়েছিল একটি মহাযুদ্ধের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) শেষ পর্যায়ে। কিন্তু *লীগ অফ নেশন্স*-এর অবলুপ্তি ঘটেছিল যুক্তরাষ্ট্রের অসহযোগিতার কারণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পর পরই একই উদ্দেশ্য নিয়ে জন্ম হয়েছিল জাতিসংঘের। কাঠামোগতভাবে দুটো সংস্থার মধ্যে অনেক মিল থাকলেও, যেখানে *'লীগ অফ নেশনস্'* ছিল মূলত একটি ইউরোপীয় সংস্থা, সেখানে জাতিসংঘ একটি বিশ্বসংস্থায় পরিণত হয়েছে। *লীগ অফ নেশনস্*-এর ব্যর্থতা ছিল অনেক বেশি, জাতিসংঘের ব্যর্থতা সেখানে তুলনামূলকভাবে কম। আর এসব কারণেই মনে করা হচ্ছে একুশ শতকে জাতিসংঘের একটি বড় ভূমিকা থাকবে। তবে জাতিসংঘের ভূমিকা বুঝতে হলে ১৯৪৫ সাল পরবর্তী বিশ্বরাজনীতির ধারাবাহিকতা বুঝতে হবে।

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে একটি বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘের জন্ম। ২০১৬ সালের অক্টোবরে জাতিসংঘ তার জন্মের ৭১ বছর পার করেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জাতিসংঘের জন্ম একটি বড় সম্ভাবনার জন্ম দিলেও, জাতিসংঘ সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। তবে এর গুরুত্ব ছিল বিংশ শতাব্দীতে। এবং একুশ শতকে এসেও এর প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থতা, দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য দূর করা, মধ্যপ্রাচ্যে উগ্রপন্থী ইসলামিক রাজনীতির বিকাশ, বিশ্বব্যাপী দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি, জাতিসংঘে সিদ্ধান্ত গ্রহণে

পশ্চিমাশক্তি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব করার প্রবণতা রোধ করার ব্যর্থতা একুশ শতকে জাতিসংঘের ভূমিকাকে একটি প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে। গত বেশ কবছর ধরেই বিভিন্ন ফোরামে এটা বারবার বলা হচ্ছে যে জাতিসংঘে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর স্বার্থরক্ষা করতে পারছে না। জলবায়ু পরিবর্তনে সাগর পাড়ের দেশগুলো বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে থাকলেও, জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০১৫ সালের নভেম্বরে প্যারিসে একটি জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিশ্বের উষ্ণতারোধকল্পে কোনো কার্যকরীব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসে যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসে, তখন এ প্রশ্নটাই ঘুরে-ফিরে আলোচিত হতে থাকে যে, জাতিসংঘের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? বলতে দ্বিধা নেই, উন্নতবিশ্ব, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ক্ষমতাধর ৫টি দেশ তাদের নিজেদের স্বার্থেই জাতিসংঘকে টিকিয়ে রাখছে। তবে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ১৯৪৫ আর ২০১৬ এক নয়। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিসকো শহরে যে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছিল, এত দিনে তার কর্মপরিধি বেড়েছে। ১৯৪৫ সালে মাত্র ৫০টি দেশ নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজকে তার সদস্য সংখ্যা ১৯৬টি।

জাতিসংঘ যে উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থরক্ষা করতে পারছে না, এ অভিযোগ অনেক পুরনো। তবে জাতিসংঘের সাফল্য যে একেবারে নেই, তা বলা যাবে না। ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ ও কুয়েতকে শত্রুমুক্ত করা, এল. সালভাদর, কম্পুচিয়া কিংবা নামিবিয়ায় পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া ও শান্তিফর্মুলায় রাজি করানোর মতো ঘটনার মধ্যে দিয়ে এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী যে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠছে, তাতে জাতিসংঘের একটা ভূমিকা রয়েছে। সাবেক যুগোস্লাভিয়ার গৃহযুদ্ধ থামাতে সেখানে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানো, কম্পুচিয়ায় গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে সেখানে জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েন ও পরবর্তীতে সেখানে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা, এমনকি নেপালেও নির্বাচন আয়োজনে সহযোগিতা করার মধ্যে দিয়ে জাতিসংঘ তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সারা বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে আফ্রিকায় যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করার মধ্যে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি উদ্যোগও লক্ষ্যণীয়। তবে ব্যর্থতার পাল্লাটা যেন ভারী। অতিসম্প্রতি হাজার হাজার সিরীয় ও ইরাকি শরণার্থী যখন ইউরোপে প্রবেশ করে এক অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, জাতিসংঘ এদের দেশত্যাগ ঠেকাতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্র ২০০১ সালে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' অংশ হিসেবে আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে যে যুদ্ধের শুরু করেছিল, জাতিসংঘ দীর্ঘ ১৪ বছর পরও সেই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেনি। ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের অনুমোদন ছাড়াই ইরাক দখল করে নিয়েছিল ও সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করেছিল, যা ছিল জাতিসংঘ চার্টারের বরখেলাপ। ২০১১ সালে তথাকথিত 'মানবাধিকার রক্ষায় হস্তক্ষেপ'—এই অভিযোগ তুলে লিবিয়ায় বিমান হামলা চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। এই হামলায় গাদ্দাফি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং রাষ্ট্রটি এখন কার্যত একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অস্ত্রবাজরা এখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সেখানে কোনো কেন্দ্রীয় প্রশাসন নেই। অথচ একই অভিযোগ উঠেছে সিরিয়া ও

ইরাকে গড়ে ওঠা তথাকথিত একটি 'জিহাদি রাষ্ট্র'-এর বিরুদ্ধে, যার নেতৃত্বে রয়েছে সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামিক স্টেট-এর জঙ্গিরা। অভিযোগ আছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলি শক্তির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে এই জঙ্গিগোষ্ঠী 'ইসলামিক স্টেট'-এর উত্থান ঘটেছে। এরা হাজার হাজার সিরীয় নাগরিককে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করছেন। অথচ এখানে তথাকথিত 'মানবাধিকার রক্ষায় হস্তক্ষেপ'-এর তত্ত্ব প্রয়োগ করছে না যুক্তরাষ্ট্র। এমনকি জাতিসংঘের কোনো উদ্যোগও আমরা লক্ষ করছি না। জাতিসংঘের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ বৃদ্ধিতে শক্তিশালী কোনো উদ্যোগ নেই। স্থায়ী পরিষদে রয়েছে ৫টি দেশ (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, চীন ও রাশিয়া) ও ১০টি অস্থায়ী দেশ। অস্থায়ী দেশগুলো দুবছর পর পর অঞ্চল ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়। কিন্তু স্থায়ী পরিষদের একটি রাষ্ট্র 'ভেটো' প্রয়োগ করে যেকোনো সিদ্ধান্তের মৃত্যু ঘটাতে পারে। কিন্তু অস্থায়ী সদস্য দেশগুলো তেমনটি পারে না। তাই অনেক দিন থেকেই উন্নয়নশীল বিশ্ব স্থায়ী পরিষদে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু আজও তা নিশ্চিত হয়নি। তবে অনেকেই স্মরণ করতে পারেন জাতিসংঘের উদ্যোগে অনেক আগেই Commission on Global Governance নামে একটি কমিশন গঠন করেছিল। ওই কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল জাতিসংঘে কীভাবে সংস্কার আনা যায়, সে ব্যাপারে একটি সুপারিশ করা। সিদ্ধার্থ রামপাল ও ইনগভার কার্লসন ছিলেন ওই কমিশনের যৌথ চেয়ারম্যান। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে কমিশন তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। ওই কমিটির সুপারিশে নিরাপত্তা পরিষদে একধরনের 'স্ট্যান্ডিং' সদস্য রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল, যার সদস্যসংখ্যা হবে পাঁচ। এর মাঝে ২টি দেশ আসবে উন্নত দেশ থেকে, আর বাকি ৩টি দেশ আসবে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে। কিন্তু তাদের কোনো 'ভেটো' ক্ষমতা থাকবে না। কিন্তু দীর্ঘ ২০ বছর পার হয়ে যাবার পরও এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হয়নি। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলো 'ভেটো' ক্ষমতাসহ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ চায়। যেমন ভারতের কথা বলা যেতে পারে। ভারত এখন এশিয়ার চীনের পর দ্বিতীয় অর্থনীতি। ২ ট্রিলিয়ন ডলারের (২ লক্ষ কোটি ডলার) অর্থনীতি ভারতের। ভারতের পাশাপাশি জাপানও এখন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হতে চায়। এ লক্ষ্যে জাপানের সংবিধান সংশোধন করে এই প্রথমবারের মতো বিদেশে জাপানি সেনা মোতায়েনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর এবং ৫টি পশ্চিমা শক্তির সমর্থন এতে পাওয়া যাবে– এটা মনে করার কোনো কারণ নেই।

জাতিসংঘের অনেক ব্যর্থতা আছে। সীমাবদ্ধতা আছে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে সমস্যা আছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতিসংঘের কর্মসূচি হালকাভাবে নেয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কিছুটা হলেও সফল হয়েছে। যেমন বলা যেতে পারে Millenium Development Goals কর্মসূচির কথা (MDG)। এই MDG গোলের টার্গেট ছিল উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো। ১৬ বছর আগে জাতিসংঘ এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল। এই কর্মসূচির সময়সীমা শেষ। ফলে ২০১৫ সালে Sustainable Development Goals কর্মসূচি অনুমোদিত হয়েছে। এর আগে এমডিজি বা Millenium Development Goals-MDG নামে যে কর্মসূচি

জাতিসংঘ গ্রহণ করেছিল, তা ২০১৫ সালে শেষ হয়ে যায়। এ জন্যই প্রয়োজন ছিল এসডিজি কর্মসূচি গ্রহণ করার। গেল নভেম্বরে (২০১৫) প্যারিসে বসেছিল Cop-21 সম্মেলন। বিশ্বের উষ্ণতারোধকল্পে প্যারিসে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য এই দুটো বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে গেল বছর (২০১৫) প্রধানমন্ত্রী দুটো পুরস্কার গ্রহণ করেছেন— চ্যাম্পিয়ান অব দ্য আর্থ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য ইন্টারন্যাশনাল টেলি-কমিউনিকেশন ইউনিয়ন কর্তৃক প্রবর্তিত আইসিটি পুরস্কার। বাংলাদেশের জন্য দুটো পুরস্কারের গুরুত্ব অনেক।

বাংলাদেশের জন্য এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন যেমনি গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি চ্যালেঞ্জও বটে। এখানে বলা ভালো এমডিজি বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (২০১৫ সালে শেষ হয়ে গেছে) অর্জনের পর জাতিসংঘে প্রণয়ন করেছে এসডিজি, যা ২০১৫ সালের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অনুমোদিত হয়েছে। এমডিজি অর্জনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে (মোট ৮টি ক্ষেত্রে) বাংলাদেশের সফলতার যে চিত্র ওই সময়ে (২০১৫) প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় দারিদ্রতার হার কমিয়ে আনা হয়েছে ২৪ দশমিক ৫ শতাংশে। প্রাথমিক শিক্ষার হার এখন শতকরা ৮১ ভাগ। শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার) যেখানে ছিল ১৪৬ (১৯৯০ সালে), সেখানে এখন তা ৪৬-এ। অর্থাৎ এমডিজির ৮টি ক্ষেত্রের অনেকটিতে বাংলাদেশ সফল হয়েছে। এখন এসডিজি অর্জনের পালা। উল্লেখ্য, এসডিজির নির্ধারিত ১৭টি এজেন্ডার মধ্যে রয়েছে দারিদ্রতার হার বিলোপ, ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, গুণগত শিক্ষা, নারী-পুরুষের সমতা, বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যবিধান, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ইত্যাদি। এটা বাংলাদেশের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা এমডিজির ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলো তাদের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ০.৭ ভাগ সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু পাওয়া গিয়াছিল মাত্র ০.৪ ভাগ। তাও আবার ধনী দেশগুলো দিয়েছিল তাদের জিডিপির মাত্র ০.২ ভাগ। ফলে একটা প্রশ্ন থেকেই গেল যে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সাহায্য দরকার হবে তা পাওয়া যাবে কি না? না পেলে বাংলাদেশ কেন, কোনো অনুন্নত দেশই এসডিজি-এর লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা হবে তাই গুরুত্বপূর্ণ।

এসডিজি-এর পাশাপাশি প্যারিসে জলবায়ু শীর্ষক Cop-21 (Committee of Parties-21) নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। কপ-২১ আলোচনাটি প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩০ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত (২০১৫)। ১৯৯৭ সালে কিয়োটো সম্মেলনে বিশ্বের উষ্ণতা হ্রাস করার ক্ষেত্রে একটি ঐকমত্যে পৌঁছলেও ধনী দেশগুলোর অসহযোগিতার কারণে, তা পরে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। জাতিসংঘের মতে কার্বন হ্রাসের মাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কমিয়ে আনতে হবে। এ ব্যাপারে প্যারিসে একটি চুক্তি হয়েছে। এটা না হলে অনুন্নত দেশগুলো, বিশেষ করে সাগর পাড়ের দেশগুলোর জন্য খারাপ সংবাদ অপেক্ষা করছিল। বাংলাদেশের জন্য প্যারিস সম্মেলন ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণকে দায়ী করা হয়। আর এজন্য দায়ী শিল্পোন্নত পশ্চিমাবিশ্ব। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশ এর জন্য দায়ী

নয়। উন্নত বিশ্বের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বিশ্ব জিডিপির শতকরা ৭৫ ভাগ, আর তারা কার্বন নিঃসরণ করে ৫১ ভাগ। বাংলাদেশ এসব উন্নতবিশ্বের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। বাংলাদেশের উপকূলে প্রতিবছর ১৪ মিলিমিটার করে সমুদ্রের পানি বাড়ছে। গত ২০ বছরে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮ সেন্টিমিটার। সমুদ্রের পানি বেড়ে যাওয়ায় উপকূলের মানুষ অন্যত্র, বিশেষ করে ঢাকা শহরে বস্তিতে বসবাস করতে শুরু করেছে। গবেষকরা বলছেন আগামীতে প্রতি ৭ জনে ১ জন মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। বাংলাদেশ কোপেনহেগেন কপ সম্মেলনে এসব উদ্বাস্তু মানুষদের Universal Natural Person হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু এ দাবি গ্রহণযোগ্য হয়নি। জলবায়ু সমস্যা মোকাবিলায় উন্নতদেশগুলো কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সাহায্য, টেকনোলজি ট্রান্সফার ইত্যাদি প্রশ্নে কোনো কমিটমেন্ট পাওয়া যায়নি। ফলে প্যারিস সম্মেলনের সাফল্য নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা থেকেই গেল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু সমস্যার কারণে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হবে, তা বিশ্বসভায় তুলে ধরেছেন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন থেকে বাংলাদেশের তেমন কিছু পাওয়ার নেই। বাংলাদেশের অর্জন এতে কী? সাম্প্রতিক সময়ে এই বিতর্কটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে যে, বড় বড় সংকটের সমাধানের ব্যাপারে (যেমন সিরিয়া সংকট ও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনী হস্তক্ষেপ, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত, আফ্রিকার দারিদ্রতা কমানো) জাতিসংঘের ভূমিকা তেমন একটা নেই। অথচ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত অনুন্নত বিশ্বের সংখ্যা বেশি। এদের ব্যাপারে জাতিসংঘ কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবে না এটা আশা করা যায় না।

জাতিসংঘ ৭১ বছরে পা দিয়েছে। সময়টা একেবারে কম নয়। প্রতিবছর একটি শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করে আমরা অনেক ভালো ভালো কথা শুনি বটে, কিন্তু তা উন্নয়নশীল বিশ্বের কোনো মঙ্গল ডেকে আনতে পারেনি। বরং সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে গেছে, প্রাচীন ঐতিহ্য নষ্ট করা হয়েছে, কিংবা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু জাতিসংঘ তা বন্ধ করতে পারেনি। শিশু আইলান কুর্দির মতো শত শত শিশুর জীবন রক্ষা করতেও পারেনি জাতিসংঘ। তাই আগামী ৭০ বছর অর্থাৎ ২০৮৫ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ টিকে থাকতে পারবে, এটা নিশ্চিত হতে পারছি না। এক কথায় যদি বলা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতিসংঘ। কিন্তু জাতিসংঘ বিশ্বের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, আমরা তা বলতে পারি না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় রাষ্ট্রের বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা বাড়ছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে যুদ্ধ শুরু করার ব্যাপারে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণের ক্ষেত্রে এই অনুমতি নেয়নি। জাতিসংঘের চার্টারে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় কোনো রাষ্ট্রের 'হস্তক্ষেপ' না করার কথা বলা হলেও, আমরা দেখেছি সিরিয়া ও ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পের ব্যাপারে 'অন্য রাষ্ট্র' বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করছে। ফলে জাতিসংঘ অনেকটা বড় রাষ্ট্রগুলোর ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পরিচালিত হচ্ছে। খুব কম ক্ষেত্রেই ছোট রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে।

জাতিসংঘের মূলনীতি

জাতিসংঘ সনদের মূলনীতিতে ৪টি ধারা রয়েছে। এগুলো হলো: ১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং এতদউদ্দেশে শান্তিভঙ্গের হুমকি নিবারণ ও দূরীকরণের জন্য এবং আক্রমণ অথবা অন্যান্য শান্তিভঙ্গের কার্যকলাপ দমনের জন্য কার্যকরী যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে আন্তর্জাতিক বিরোধ বা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতির নিষ্পত্তি বা সমাধান; ২. বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম-অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণনীতির ভিত্তিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রসার এবং বিশ্বশান্তি দৃঢ় করার জন্য অন্যান্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ; ৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা মানসিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশসাধন; ৪. এইসব সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জাতিসমূহের প্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধনের কেন্দ্র হিসেবে কার্য পরিচালনা করা।

মূলনীতিতে আরো বলা হয়েছে, 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে' জাতিসংঘ ৭টি কাজ করবে। এগুলো হলো ১. সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা নিশ্চিত করবে; ২. সদস্য রাষ্ট্রের অধিকারসমূহ ও সুবিধাদি নিশ্চিত করবে; ৩. সকল রাষ্ট্র তাদের আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করবে; ৪. আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবে; ৫. সকল রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা মেনে চলবে; ৬. জাতিসংঘ বহির্ভূত রাষ্ট্রসমূহ যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে মূলনীতিগুলো মেনে চলে, সে জন্য সচেষ্ট থাকবে; ৭. এই সনদ জাতিসংঘকে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেয়নি।

লীগ অব নেশনস এবং জাতিসংঘের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

যে যে বিষয় নিয়ে সংস্থা দুটোর মধ্যে মিল রয়েছে তা এরকম ১. লীগ অব নেশনস এবং জাতিসংঘ যুদ্ধভিত্তিক মৈত্রী এর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে; ২. আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে উভয়ই শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। উভয় সংগঠনই আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রথমে আলাপ আলোচনা, মধ্যস্থতা প্রভৃতি পন্থা গ্রহণের নীতি অনুসরণ করে; ৩. লীগ এর চুক্তিপত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের চার্টার-এও একই কথাকে অনেক বেশি জোর দিয়ে বলা হয়েছে; ৪. দুটি সংগঠনেই সদস্যপদ লাভের জন্য প্রায় একই রকমের বিধি রয়েছে; ৫. লীগ অব নেশনস এবং জাতিসংঘ উভয়ই যুদ্ধকে রোধ করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল; ৬. লীগ অব নেশনস এবং জাতিসংঘ এ দুটি সংগঠনই আন্তর্জাতিক পরিসরে সকল সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

তবে সংস্থা দুটোর মধ্যে অমিলও রয়েছে। অমিলগুলো অনেকটা এরকম ১. লীগ অব নেশনস্-এর ক্ষমতা একটু বেশি কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু জাতিসংঘের কার্যাদি বিভিন্ন সংস্থার ওপর ন্যস্ত থাকায় কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে : ২. লীগ আন্তর্জাতিক

সারণি : ৮

জাতিসংঘের ক্রমবিকাশ

১৯৪১	ইন্টার অ্যালাইড ডিক্লিয়ারেশন (১২ জুন)। রুজভেল্ট ও চার্চিল কর্তৃক আটলান্টিক চুক্তি স্বাক্ষর (১৪ আগস্ট)।
১৯৪২	২৬টি দেশ কর্তৃক আটলান্টিক চুক্তির প্রতি সমর্থন (১ জানুয়ারি)। প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ নামটি ব্যবহার।
১৯৪৩	সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর (৩০ অক্টোবর)। চুক্তিতে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনে ঐকমত্য। পরে তেহরান শীর্ষ সম্মেলনে একই অভিমত পোষণ (১ ডিসেম্বর)।
১৯৪৪	ওয়াশিংটনে ডুম্বারটন ওক্স শীর্ষ সম্মেলনে (সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র) বিশ্বসংস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে, কাঠামোর ব্যাপারে ঐকমত্য (৭ অক্টোবর)।
১৯৪৫	ইয়াল্টাতে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন (১১ ফেব্রুয়ারি)। বিশ্বসংস্থা গঠন ঐকমত্য। সানফ্রানসিসকোতে ৫০টি দেশের শীর্ষ সম্মেলন (২৫ এপ্রিল)। জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন (২৫ জুন)। জাতিসংঘের আত্মপ্রকাশ (২৪ অক্টোবর)।
১৯৪৬	সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত (লন্ডন, ১০ জানুয়ারি)। নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম বৈঠক (ওয়েস্ট মিনিস্টার, লন্ডন, ১৭ জানুয়ারি)। আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ও মানবজাতির ধ্বংসকারী সকল ধরনের পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংসের আহ্বান সম্বলিত সাধারণ পরিষদের প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ (২৪ জানুয়ারি)। নরওয়ের ট্রাইগেভ লি প্রথম মহাসচিব নির্বাচিত (১ ফেব্রুয়ারি)।
১৯৪৮	প্যালেস্টাইনে জাতিসংঘের প্রথম অবজার্ভার মিশন স্থাপিত (জুন)। সাধারণ পরিষদে বিশ্বমানবাধিকার ঘোষণা সম্বলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (১০ ডিসেম্বর)।
১৯৪৯	জাতিসংঘের উদ্যোগে ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর (৭ জানুয়ারি)। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের মূলভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন (২৪ অক্টোবর)
১৯৫০	নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুপস্থিতিতে কোরিয়া যুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়াকে সমর্থনের জন্য আহ্বান (২৭ জুন)
১৯৫৩	জাতিসংঘ কমান্ডের সাথে চীন-উত্তর কোরিয়া কমান্ডের চুক্তি স্বাক্ষর (২৭ জুলাই)।
১৯৫৬	সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠিত। সুয়েজ সংকটকে সামনে রেখে এই বাহিনী গঠন করা হয় (৬ নভেম্বর)।
১৯৬০	আরো ১৭টি দেশের (এর মধ্যে ১৬টি আফ্রিকার) জাতিসংঘে যোগদান (সেপ্টেম্বর)।
১৯৬১	কংগোতে বিমান দুর্ঘটনায় জাতিসংঘের মহাসচিব দাগ হ্যামার সোল্ডের মৃত্যু (১৮ সেপ্টেম্বর)।
১৯৬৩	দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ (৭ আগস্ট)।
১৯৬৪	সাইপ্রাসে জাতিসংঘের শান্তিসেনা পাঠাতে নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি (৪ মার্চ)।

১৯৬৬	রোডেশিয়ার বর্ণবাদী সরকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ (১৬ ডিসেম্বর)।
১৯৬৭	নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২নং সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যাতে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিবাদমান গ্রুপগুলোর মধ্যে আলোচনার আহ্বান (২৩ নভেম্বর)।
১৯৬৮	সাধারণ পরিষদে এনপিটি চুক্তি অনুমোদন (১২ জুন)।
১৯৭১	সাধারণ পরিষদে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অন্তর্ভুক্তি (২৫ অক্টোবর)।
১৯৭২	জাতিসংঘের পরিবেশগত সম্মেলন অনুষ্ঠিত (জুন)।
১৯৭৪	সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পিএলওকে প্যালেস্টাইন জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান (১৩ নভেম্বর)।
১৯৭৫	মেক্সিকো সিটিতে প্রথম জাতিসংঘ মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত (জুন-জুলাই)।
১৯৭৮	অস্ত্র সীমিতকরণ প্রশ্নে সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন (মে-জুন)।
১৯৭৯	নারীর বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের বৈষম্য (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি) অবসানে সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন (১৮ ডিসেম্বর)।
১৯৮০	হু'র (WHO) ঘোষণা : বিশ্ব থেকে স্মল পক্স উচ্ছেদ (৮ মে)।
১৯৮১	ধর্মীয় কারণে যে কোনো ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ (২৫ নভেম্বর)।
১৯৮২	১১৭টি দেশ জাতিসংঘ কর্তৃক সমুদ্র সীমানা আইনে স্বাক্ষর (১০ ডিসেম্বর)।
১৯৮৪	আফ্রিকায় দুর্ভিক্ষ নিরসনে মহাসচিবের উদ্যোগ (ডিসেম্বর)।
১৯৮৫	নাইরোবিতে জাতিসংঘ মহিলা দশক শীর্ষক শীর্ষ সম্মেলন (জুলাই)।
১৯৮৭	ওজোন স্তর রক্ষা শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর (সেপ্টেম্বর ১)।
১৯৮৯	নামিবিয়ায় জাতিসংঘের তত্ত্বাবধায়ক দল প্রেরণ ও সেখানে নির্বাচন পরিচালনা করা (এপ্রিল)।
১৯৯০	শিশুদের অধিকার শীর্ষক সম্মেলন (২ সেপ্টেম্বর)।
১৯৯১	এঙ্গোলায় ১৬ বছরের গৃহযুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘের উদ্যোগ ও সেখানে জাতিসংঘের মিশন প্রেরণ (৩১ মে)। জাতিসংঘের সদর দফতরে এল, সালভাদরের সরকার ও বিরোধী ন্যাশনাল লিবারেশন ফোর্সের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর।
১৯৯২	ধরিত্রী শীর্ষ সম্মেলন (রিও ডি জেনেরিও) ও এজেন্ডা-২১ গ্রহণ। এ সম্মেলনে ১০৪টি রাষ্ট্রের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা যোগ দেন (জুন)। ঘালীর নিবারক কূটনীতি।
১৯৯৩	ইরিত্রিয়ার রেফারেন্ডাম ও স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যবেক্ষণ। কম্পুচিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা (মে)। ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত (জুন)।
১৯৯৪	বেইজিংয়ে চতুর্থ বিশ্বনারী শীর্ষসম্মেলন (৪ সেপ্টেম্বর)। কায়রোতে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন (১২ সেপ্টেম্বর)।
১৯৯৫	জাতিসংঘের ৫০ বছর উপলক্ষে সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন (২২-২৪ অক্টোবর)।
১৯৯৬	কফি আনান জাতিসংঘের নয়া মহাসচিব। সিটিবিটি চুক্তি স্বাক্ষর।
১৯৯৮	ইরাকের ব্যাপারে জাতিসংঘের ভূমিকা নিন্দিত।

সংস্থা হিসেবে গঠিত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু জাতিসংঘে সকল বৃহৎ রাষ্ট্রই যোগদান করেছে; ৩. লীগের চুক্তির লক্ষ্য হিসেবে বিভিন্ন সরকার এবং তাদের উন্নতির বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘের সনদে পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর উন্নতি সাধনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে; ৪. সদস্যপদ লাভের ক্ষেত্রে উভয় সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। উভয় সংগঠনেরই সদস্যপদ লাভ করতে হলে মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। কিন্তু জাতিসংঘের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করতে হলে সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন; ৫. চুক্তিসমূহ নবায়নের ক্ষেত্রে লীগের একটি শর্ত ছিল। ১১নং ধারায় বলা হয়েছিল যে, পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর চুক্তিসমূহ নবায়নের জন্য পরামর্শ দান করতে পারবে। কিন্তু জাতিসংঘে এ ধরনের কোনো বিশেষ কথার উল্লেখ নেই; ৬. মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে জাতিসংঘের যে প্রয়াস লক্ষ করা যায়, লীগের সেরূপ ছিল না; ৭. লীগের যেখানে পরিষদ, কাউন্সিল এবং সচিবালয় প্রধান বিভাগ ছিল, সেখানে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত, সচিবালয়, অছি পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এই ৬টি প্রধান বিভাগ রয়েছে। ৮. লীগের চুক্তিতে কাউন্সিল এবং সাধারণ সভার মধ্যে ক্ষমতা পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এবং নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট আছে; ৯. লীগ কাউন্সিলের সদস্যভুক্তির পদ্ধতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যভুক্তির পদ্ধতির চেয়ে অনেক উদার ছিল।

জাতিসংঘের ভূমিকা

নতুন বিশ্বব্যবস্থায় জাতিসংঘের ভূমিকা এখন বিভিন্ন মহলে আলোচিত হচ্ছে। বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাতে করে জাতিসংঘের একটি গ্রহণযোগ্য ভূমিকা এখন আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। নতুন বিশ্বব্যবস্থার আলোকে জাতিসংঘের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, কিংবা বৃহৎশক্তির প্রভাববলয়ের বাইরে থেকে জাতিসংঘ তার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারবে কিনা, এ নিয়ে পর্যবেক্ষকদের মধ্যে রয়েছে সন্দেহের অবকাশ। পর্যবেক্ষকদের কারো কারো মতে জাতিসংঘ দীর্ঘদিন যাবৎ বৃহৎশক্তির স্বার্থে, বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে, কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের অভিমত যেহেতু দুই বৃহৎশক্তির মাঝে আর কোনো দ্বন্দ্বের সুযোগ নেই, সেহেতু জাতিসংঘের জন্য নিরপেক্ষভাবে কাজ করার একটা সুযোগের সৃষ্টি হতে পারে। ঘটনা যেদিকেই গড়াক না কেন, সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। কিন্তু এটা সত্য, স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘের সম্ভাব্য ভূমিকা এখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে আলোচনার অন্যতম বিষয়। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে যে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছিল, এতদিনে তার কর্মপরিধি বেড়েছে। ১৯৮৫ সালে মাত্র ৫০টি দেশ নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজকে তার সদস্য সংখ্যা ১৯২টির মতো। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গিয়ে যে ১৫টি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছে, তারাও আজ জাতিসংঘের সদস্য।

দুই মেরুভিত্তিক এই বিশ্বব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু 'সাব-সিসটেমের' জন্ম হয়েছে যারা তাদের ভূমিকা ও অবস্থানের কারণে বিশ্বরাজনীতিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এ ধরনের 'সাব-সিসটেমের' মধ্যে রয়েছে (১) চীন, (২) ভারত, (৩) ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি। চীন একুশ শতকে অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। তাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার এখন অনেক বেশি। উপরন্তু জনবলের কারণে চীন একটি শক্তি হিসেবেই গণ্য হবে। বিশ্বে চীন মূলত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে সমর্থনের চাইতে এখন রাষ্ট্রপর্যায়ে সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেয় বেশি। চীন যে ধ্রুপদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে থাকছে না, এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। চীনে যতদিন সেনাবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির পেছনে তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখবে, ততদিন পার্টি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে। সেনাবাহিনী সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে চীনের অবস্থা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মতোও হতে পারে। তবে চীন একটা উঠতি শক্তি। বিশ্বব্যবস্থায় তাকে অস্বীকার করা যাবে না। চীনের পরে আসে ভারতের প্রশ্নটি। ভারত এ অঞ্চলের অন্যতম আঞ্চলিক শক্তি। বিশ্বের চতুর্থ সেনাবাহিনী ভারতের। নৌবাহিনীর অবস্থান বিশ্বে ষষ্ঠ এবং বিমানবাহিনীর অষ্টম। ভারত হচ্ছে পৃথিবীর সপ্তম বৃহৎরাষ্ট্র। উপরন্তু ভারত পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। শিল্প উৎপাদনের দিক দিয়ে ভারতের অবস্থান সপ্তম। প্রযুক্তিগত দিক দিয়েও ভারত অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এক ধরনের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও রয়েছে সেখানে। ভারতের পুঁজি এখন আফ্রিকাসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র খাটছে। ভারত আগামী দিনে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর উপর তার প্রভাব অব্যাহত রাখবে। ভারত নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদের জন্যও দাবি করছে। সুতরাং নতুন 'সাব-সিসটেম'-এ ভারত একটা অন্যতম শক্তি। আরেকটি সাব-সিসটেমের জন্ম হতে পারে আফ্রিকায়। এক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমিকা আগামি দিনে লক্ষ করার মতো। একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে যা যা দরকার দক্ষিণ আফ্রিকার সব রয়েছে। দীর্ঘদিন দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল বিশ্বরাজনীতিতে একরকম 'বহিষ্কৃত'। এখন বর্ণবাদের সেখানে অবসান হয়েছে। এপ্রিলে ('৯৪) সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট। ক্ষমতা ছেড়ে দেবার পর তিনি এখন বিশ্বনেতায় পরিণত হয়েছেন। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ দেখিয়েছে। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা আগামী দিনে একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। জায়ারের সংকট সমাধানে দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমিকা আফ্রিকার আঞ্চলিক রাজনীতিতে তার অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করেছে।

ইদানিংকালে জাতিসংঘের ভূমিকা আলোচিত হলেও অতীতেও জাতিসংঘের ভূমিকা কম বিতর্কের জন্ম দেয়নি। জাতিসংঘ উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থরক্ষা করতে পারছে না—এ ধরনের অভিযোগ তো হরহামেশাই শোনা যাচ্ছিল। জাতিসংঘের দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘ সবচেয়ে বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছিল। জাতিসংঘের এই সাফল্যের সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছে এল.

সালভাদর ও কম্পুচিয়া সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে জাতিসংঘের একটা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন। এল. সালভাদর ও কম্পুচিয়ায় পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া ও শান্তি ফর্মুলায় রাজি করনোর মতো ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী যে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাতে জাতিসংঘের একটা ভূমিকা থেকে যাচ্ছে। সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার গৃহযুদ্ধ থামাতে সেখানে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানো কিংবা কম্পুচিয়ার গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে সেখানে জাতিসংঘের বাহিনী মোতায়েনের মধ্য দিয়েই জাতিসংঘ তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থতাও আছে। বিশেষ করে বসনিয়ার গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে জাতিসংঘের তেমন তৎপরতা লক্ষ করা যায়নি, যেমনটি দেখা গিয়েছিল উপসাগরীয় যুদ্ধের বেলায়।

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জাতিসংঘের দীর্ঘ ইতিহাসে ব্যর্থতার ইতিহাসই বেশি। দুই বৃহৎশক্তির মধ্যে যখন স্নায়ুযুদ্ধের জন্ম হয়েছিল, তখন জাতিসংঘ এই স্নায়ুযুদ্ধের অবসানকল্পে তেমন কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি। অস্ত্র প্রতিযোগিতা যখন বেড়েছিল, তখন জাতিসংঘ নীরবদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন কিংবা কম্পুচিয়ায় ভিয়েতনামী আগ্রাসন ঠেকাতে জাতিসংঘ পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে এটাও সত্য, সোভিয়েত আগ্রাসন জাতিসংঘে নিন্দিত হয়েছিল। একই সঙ্গে জাতিসংঘ কম্পুচিয়ার সাবেক হেং সামরিনের পুতুল সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি কখনো। স্বীকৃতি দিয়েছিল পলপট সরকারকে। এ-কারণেই জাতিসংঘের ইতিহাসে ব্যর্থতা যেখানে বেশি, সেখানে জাতিসংঘ কী নতুন বিশ্বব্যবস্থায় তার ভূমিকা নিশ্চিত করতে পারবে? বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থকে কী নিশ্চিত করতে পারবে জাতিসংঘ? বিংশ শতাব্দীর শেষদিনগুলোতেও এ প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

জাতিসংঘের কাঠামোয় পরিবর্তন

একুশ শতক শুরু হবার অনেক আগে থেকেই একটা কথা খুব বেশি করে শোনা গিয়েছিল, আর তা হচ্ছে জাতিসংঘের কাঠামোয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী সংস্থায় উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। যদি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যতম প্লাটফর্ম হিসেবে ধরে নিই, তাহলে বলা যেতে পারে যে, বিশ্বের ১৪৮টি দেশ এখন উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। এই ১৪৮টি দেশের জনসংখ্যা প্রায় ২৫০ কোটি। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের কিছু কম। অথচ এই বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী দেশগুলোর ক্ষমতা জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় খুবই সীমিত। জাতিসংঘের মূলক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদের হাতে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ ৫টি—যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স। এদের হাতে রয়েছে 'ভেটো' পাওয়ার। এরা সাধারণ পরিষদে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তে 'ভেটো' দিয়ে তার মৃত্যু ঘটাতে পারে। এর বাইরে রয়েছে ১০টি নির্বাচিত দেশের সদস্যপদ। এরা দু বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। তবে এদের কোনো 'ভেটো' পাওয়ার নেই। এরা শুধু, ভোট দিতে পারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব খাটাতে পারে না। অর্থাৎ 'ভেটো' দিতে পারে না।

সারণি : ৯

জাতিসংঘ ও লীগ অফ নেশন্‌স-এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য

লীগ অফ নেশন্‌স	জাতিসংঘ
১. স্থায়িত্ব ছিল দুই দশক	এখনও টিকে আছে।
২. সাফল্য বেশি নয়। ২১টি সংকটের মাঝে ৭টিতে সফল হয়েছিল।	ব্যর্থতা চোখে লাগার মতো।
৩. মূলত ইউরোপকেন্দ্রিক সংগঠন। চারভাগের তিনভাগ বিরোধ ইউরোপকে কেন্দ্র করে।	একটি বিশ্বসংস্থা। বিরোধ শুধু ইউরোপ-কেন্দ্রিক নয়।
৪. মূল দায়িত্ব ছিল ইউরোপকেন্দ্রিক একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন।	কর্মপরিধি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। ব্যাপক বিষয় কর্মপরিধিতে অন্তর্ভুক্ত।
৫. সংস্থায় ইউরোপের পর ল্যাতিন আমেরিকার প্রাধান্য। ৬৪ সদস্য বিশিষ্ট সংস্থায় ইউরোপের সদস্য ছিল ২৮, আর ল্যাতিন আমেরিকার ২১।	সদস্য সংখ্যা ১৯২। আফ্রিকার প্রাধান্য বেশি।
৬. যুক্তরাষ্ট্র সংস্থা থেকে সরে দাঁড়ায়।	যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ বাজেটের ২৪ ভাগ যোগায়।
৭. স্থায়ী পরিষদে ইউরোপের প্রাধান্য বেশি।	স্থায়ী পরিষদে তিন মহাদেশের প্রাধান্য রয়েছে।
৮. স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল না।	স্থায়ী পরিষদে বিভিন্ন ইস্যুতে মতপার্থক্য রয়েছে।
৯. সংস্থার কাজ ছিল রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা।	সংস্থার কাজ ব্যাপক।
১০. সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন ছিল।	নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন।
১১. আন্তর্জাতিক বিচারালয় অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল না।	সংস্থার ৬টি বিভাগের একটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিচারালয়। উপরন্তু অছি পরিষদ ও অর্থনৈতিক সামাজিক পরিষদ সংস্থার অংশ, যা লীগ অফ নেশনসে ছিল না।
১২. সব বিষয়ই নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদে আলোচনা করা যেত।	নিরাপত্তা পরিষদে কোনো বিষয় আলোচনা বা সিদ্ধান্ত নিলে ওই বিষয় নিয়ে সাধারণ পরিষদে আলোচনা করা যায় না।
১৩. সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো।	দুই-তৃতীয়াংশের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৪. নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে লীগ ব্যর্থ হয়েছিল।	নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অগ্রগতি হয়েছে। ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো CTBT ও NPT চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।
১৫. শান্তিরক্ষা বাহিনী ছিল না।	শান্তিরক্ষা কার্যক্রম এখন সংস্থার মূলকাজের একটি।
১৬. আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লীগ কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি।	আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের (ইরাক) মতো ব্যবস্থা নিতে পেরেছে।
১৭. পরিবেশ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা ছিল না।	পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা মূলকাজের একটি।

নিরাপত্তা পরিষদের এই কাঠামোর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে, সেখানে উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব নেই। এ কারণেই দাবি উঠেছিল স্থায়ী সদস্যপদের। এই স্থায়ী সদস্যপদের দাবিদার এখন ভারত, নাইজেরিয়া, ব্রাজিল ও মিশর। ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটি, নাইজেরিয়ার ১০ কোটি, ব্রাজিলের ১৫ কোটি, আর মিশরের ৬ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর যেসব দেশ প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের জাতিসংঘে একটা ভূমিকা থাকা উচিত। জাতিসংঘের কাঠামোগত সংস্কার কিভাবে সাধন করা যায়, তা বিবেচনা করে দেখার জন্য জাতিসংঘ একটি কমিশন গঠন করেছিল। ওই কমিশনের নাম Commission on Global Governance। সিদ্ধার্থ রামপাল ও ইনগভার কার্লসন যৌথভাবে ওই কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কমিশন ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। তাদের রিপোর্টে কিছু প্রস্তাবও ছিল। কমিশন নিরাপত্তা পরিষদে নতুন এক ধরনের 'স্ট্যান্ডিং' সদস্য রাখার প্রস্তাব করেছিল যার সদস্য সংখ্যা হবে পাঁচ। এখানে সদস্যপদ পরিবর্তিত হবে না। তবে তাদের কোনো 'ভেটো' ক্ষমতা থাকবে না। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এই স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ২টি দেশ আসবে উন্নত-শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে আর বাকি ৩টি দেশ আসবে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলো থেকে। একই সাথে অস্থায়ী সদস্যপদ বাড়িয়ে ১৩টিতে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ তখন গিয়ে দাঁড়াবে ১৫-এর বদলে ২৩টিতে। কিন্তু এই প্রস্তাবের ব্যাপারে খুব একটা সাড়া পাওয়া যায়নি। কেননা 'স্ট্যান্ডিং কমিটিতে' কারা প্রতিনিধিত্ব করবে, সে ব্যাপারে দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের দাবি আজ শুধু উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকেই ওঠেনি, একই সঙ্গে জাপান ও জার্মানিও স্থায়ী সদস্যপদের অন্যতম দাবিদার। জাপান পৃথিবীর অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি। জাপানের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্যই অন্যতম সমস্যা নয়, খোদ জাপানের নিজ দেশের জন্যও অন্যতম সমস্যা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাপানি পুঁজি খাটছে। পর্যবেক্ষকদের ধারণা বিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাপানিদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গিয়েছিল। এ অঞ্চলের রাজনীতি জাপান নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে। জাপান ইতোমধ্যে সামরিক শক্তিরূপেও আবার আবির্ভূত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৯২ সালে প্রথমবারের মতো জাপানি সেনা কম্পুচিয়ায় মোতায়েন করা হয়েছিল। সেখানে তারা শান্তিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। এজন্য জাপানে শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হয়েছিল। জাপানি সংবিধানে, বিদেশে জাপানি সেনা মোতায়েন নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের ফলে সেই নিষেধাজ্ঞা এখন আর বজায় নেই। অন্যদিকে জাপানের পাশাপাশি জার্মানিও আজ অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি। ইউরোপীয় ইউনিয়নে তাদের ভূমিকা বাড়ছে। জার্মানি প্রকাশ্যেই নিরাপত্তা পরিষদের একটি স্থায়ী সদস্যপদ দাবি করেছিল। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদে জার্মানি আর জাপানের অন্তর্ভুক্তির দাবি সমর্থন করেছিলেন।

জাতিসংঘে প্রশাসনিক সংস্কার

জাতিসংঘ সম্পর্কে একটা বড় অভিযোগ হচ্ছে, সেখানে প্রচুর অপচয় হচ্ছে এবং আদৌ কোনো প্রশাসনিক সংস্কার হয়নি। এই অভিযোগ তুলে যুক্তরাষ্ট্র তার দেয়া চাঁদা বন্ধ করে দিয়েছিল। সাবেক মহাসচিব কফি আন্নান গত ১৭ মার্চ ('৯৭) ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে ১০ দফা কর্মসূচি পেশ করেছিলেন। কফি আন্নানের ঘোষিত ওই সংস্কার কার্যক্রমে রয়েছে ১. দ্বিবার্ষিক বাজেট থেকে ১২ কোটি ৩০ লাখ ডলার ছাঁটাই, ২. প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার মাধ্যমে এক হাজার পদের বিলোপ সাধন ও লোক ছাঁটাই, ৩. বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ তৎপরতার যথাযথ সমন্বয় সাধনের জন্য 'কান্ট্রি টিম, লিডারদের অবস্থান শক্তিশালী করা, ৪. জাতিসংঘ সচিবালয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দপ্তরসমূহের কাজ সুসংহত করা, ৫. সাধারণ পরিষদ সংক্রান্ত দপ্তর এবং সম্মেলন বিষয়ক কার্যাবলির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরী সহায়তাদানের বিষয়টি যথাযথ করা, ৬. 'পাবলিক ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট'-কে নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে 'অফিস অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া সার্ভিসেস'-এ রূপান্তরিত করা, ৭. প্রশাসনিক, আর্থিক কর্মচারী বিষয়ক এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেবা কাজসমূহ সুসংহত করা, ৮. জাতিসংঘকর্মীদের জন্য একটি নতুন আচরণবিধি তৈরি করা, যার আওতায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে, ৯. জাতিসংঘ সচিবালয়কে যেসব দলিলপত্র তৈরি করতে হয় তার পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ কমিয়ে আনা এবং ১০. জাতিসংঘ বাজেটের শতকরা ৩৮ ভাগ প্রশাসনিক ব্যয় এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করে উদ্বৃত্ত সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় করা। কিন্তু স্পষ্টতই এ ব্যাপারে তেমন কিছু অগ্রগতি হয়নি। বলাই বাহুল্য, কাঠামোগত সংস্কারের ব্যাপারে এই দশ দফায় কোনো বক্তব্য নেই।

একুশ শতকের জাতিসংঘ

নতুন এই শতাব্দীতে জাতিসংঘের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, কোন কোন বিষয়গুলোকে জাতিসংঘ গুরুত্ব দেবে, এ নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। তবে বেশ কিছু বিষয় রয়েছে, যে ব্যাপারে জাতিসংঘের একটি ভূমিকা থাকা উচিত বলে অনেকে মনে করেন। যেমন বলা যেতে পারে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা, উন্নয়নশীল বিশ্বের ঋণ পরিস্থিতির কথা, ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য কমানো, নারী উন্নয়ন কিংবা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি ইত্যাদি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি বড় ধরনের সমস্যা। ১৯৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা যেখানে ছিল ২শ' ৮০ কোটি, ২০০০ সালে তা ৫শ' ৯০ কোটিতে উন্নীত হয়। জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বাংলাদেশে ভয়াবহ জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল শতাব্দী শেষ হবার আগেই। বাংলাদেশের মতো অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের অবস্থাও হবে একই। এদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে একটি বড় ধরনের সমস্যা। জনসংখ্যার এই বিস্ফোরণের ফলে গরিব দেশ থেকে এক ব্যাপক জনগোষ্ঠীর উন্নতবিশ্বে অভিবাসন ঘটবে। বিশ্বে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন কারণে শরণার্থী হয়েছেন। এর বাইরে আছে আরো ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ, যারা ইতোমধ্যে ধনী ও উন্নতদেশগুলোতে আশ্রয় পেয়েছে এবং যাদেরকে অর্থনৈতিক শরণার্থী

হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। জাতিসংঘ শরণার্থীদের জন্য ১৯৯৫ সালে খরচ করেছিল ১৩ বিলিয়ন ডলার। আগামীতে এই অর্থের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। জাতিসংঘ ১৯৪৫ সালে জনসংখ্যা সমস্যাকে চিহ্নিত করলেও মাত্র ১৯৯৪ সালে জনসংখ্যা তহবিল গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসংখ্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সম্মেলনে মেয়েদের কর্মসংস্থানসহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী বছরগুলোতে জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের দায়িত্ব আরো বাড়বে। এখানে পরিবেশগত সমস্যা নিয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে পরিবেশগত সমস্যার ব্যাপারে সারা বিশ্বব্যাপী একটি সচেতনতা দেখা যায়। এ ব্যাপারে জাতিসংঘের দুটো উদ্যোগের কথা আমরা বলতে পারি— বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন (রিও ডি জেনেরিও এজেন্ডা-২১, গৃহীত হয়েছিল, অন্যদিকে কিয়োটোতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও, সেই চুক্তি শিল্পোন্নত দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অসহযোগিতার কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। জাতিসংঘের ব্যর্থতা এ কারণে যে তারা ওই চুক্তি বাস্তবায়নে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে বাধ্য করাতে পারেনি। ওই দুটো সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, একুশ শতকে পরিবেশগত সমস্যা হবে বিশ্বের এক নম্বর সমস্যা। বিশ্বে তাপমাত্রা বাড়ছে। এর ফলে ঘূর্ণিঝড়, অকাল বন্যা, খরা, নানা ধরনের রোগব্যাধি বাড়ছে। সমুদ্রের পানি বেড়ে যাবার ফলে অনেক দেশের নিম্নাঞ্চল ও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল তলিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষতি হতে পারে সবচেয়ে বেশি। এ কারণেই জাতিসংঘের ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ।

ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য কমানোর একটি উদ্যোগ জাতিসংঘকে নিতে হবে। ১৯৯৫ সালে বিশ্বব্যাংক অস্ট্রেলিয়াকে মাথাপিছু সম্পদের দিক থেকে ধনী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, সেখানে মাথাপিছু আয় ধরা হয়েছিল ৮৩৫০০০ ডলার। অন্যদিকে ইথিওপিয়া ছিল সর্বনিম্নে, মাথাপিছু সম্পদ সেখানে মাত্র ১৪ হাজার ডলার। দরিদ্রতা, খরা ইত্যাদি কারণে ইথিওপিয়ার মতো গরিব দেশগুলোতে মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। জাতিসংঘকে আজ বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে। প্রয়াত অধ্যাপক মাহবুবুল হক একবার 'হিউম্যান সিকিউরিটি' বা জননিরাপত্তার প্রস্তাব রেখেছিলেন। তাতে তিনি নিজ দেশে চাকরি ও আশ্রয় নিশ্চিত করার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি জাতিসংঘের আওতাধীন একটি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করারও আহ্বান জানিয়েছিলেন। জাতিসংঘের কাছে বিষয়টি যে গুরুত্বপূর্ণ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে জাতিসংঘের ভূমিকা আগামী দিনে আরো বাড়বে। দ্বন্দ্ব নিরসনে রাষ্ট্রের কিংবা আঞ্চলিক শক্তির ব্যর্থতা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের অধীনে ১৩টি শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু এর পরের বছরগুলোতে আরো ১৩টি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের এই কার্যক্রমে ৫২৮০০০ জন সিভিল ও সেনাবাহিনীর সদস্য জড়িত ছিলেন। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এই কার্যক্রমে খরচ হয়েছে ৮৩ বিলিয়ন ডলার। ২০০০ সালে এই হিসাব অনেক বেশি। ১৯৯৪ সালে শুধু

সাবেক যুগোশ্লাভিয়া ও ১৫টি দেশে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম চালাতে জাতিসংঘের খরচ হয়েছিল ৩২ বিলিয়ন ডলার। খরচের শতকরা ৩১ ভাগ বহন করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। জাতিসংঘ ফাণ্ড সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। জাতিগত দ্বন্দ্ব, আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব আরো বেড়েছিল। সুতরাং জাতিসংঘের দায়িত্ব আগামীতে আরো বাড়বে।

বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপারটি ছিল গত শতাব্দীতে অন্যতম একটি আলোচিত বিষয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে এবং সেসব দেশের সরকার অনেক ক্ষেত্রেই মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত। মানবাধিকার নিশ্চিত করার প্রশ্নে জাতিসংঘকে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। মানবাধিকার লংঘনের সাথে গণহত্যার প্রশ্নটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বসনিয়া, কসোভো, কঙ্গো, রুয়ান্ডা কিংবা বুরুন্ডিতে একটি সংঘবদ্ধ দল এই গণহত্যা চালিয়েছিল। এদের বিচার করা প্রয়োজন। জাতিসংঘের উদ্যোগে ইতোমধ্যে একটি আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালত গঠন করা হয়েছে। এটি কার্যকারী হলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই গণহত্যার প্রবণতা কমে যাবে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের ঋণ সমস্যা একাধিকবার আন্তর্জাতিক সংকটের সৃষ্টি করেছিল। মূলত, ১৯৮০ সাল থেকেই এই সংকট শুরু হয়। এই সংকট এখনও আছে। এই সংকটের ফলে আজ সাহারা আফ্রিকার দেশগুলোর জাতীয় আয় শতকরা ৪০ ভাগ, আর ক্যারিবিয়ান ও ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলোর জাতীয় আয় শতকরা ৪৫ ভাগ কমে গেছে। এ জন্য মুক্তবাজার অর্থনীতিকে দায়ী করা হচ্ছে। ১৯৯১ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণের পরিমাণ ছিল ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। ২০০০ সালে এর পরিমাণ ২ ট্রিলিয়ন ডলারকে ছাড়িয়ে যায়। ঋণ পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় উন্নয়নশীল বিশ্বের উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্যও হ্রাস পায়। একই সাথে এদের জিডিপির প্রবৃদ্ধিও থেমে যায়। আর উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো বাধ্য হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে তাদের বাজেট কমাতে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর এই ঋণ সমস্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। এই ঋণ সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন এবং জাতিসংঘকেই এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে।

জাতিসংঘকে আরো গ্রহণযোগ্য ও জাতিসংঘে উন্নয়নশীল বিশ্বের ভূমিকা বাড়ানোর জন্য ইউএনডিপির সাবেক অর্থনীতিবিদ প্রয়াত ড. মাহবুবুল হক ১৯৯৫ সালে দুই কক্ষবিশিষ্ট একটি সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব করেছিলেন। এর এককক্ষে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব থাকবে, আর অন্যকক্ষে সিভিল সোসাইটিগুলো তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে (Mahbubul Haq, The UN cannot Fight Tomorrow's Battle with Yesterday's Weapons,- The Earth Times, New York, October 21-30, 1995. P.14)। এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। বর্তমানে দুই কক্ষবিশিষ্ট সাধারণ পরিষদের কথা তেমন একটা শোনা যায় না। একুশ শতকে জাতিসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি। জাতিসংঘ যদি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে জাতিসংঘ তার গ্রহণযোগ্যতা হারাবে।

সারণি : ১০

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম

1. **UNTSO** United Nations Truce Supervision Organization June 1948-	2. **UNMOGIP** United Nations Military Observer Group in India January 1949-
3. **UNEF I** First United Nations Emergency Force November 1956- June 1967	4. **UNOAIL** United Nations Observation Group in Lebanon June 1958-December 1958
5. **ONUC** United Nations Operation in the Congo July 1960-June 1964	6. **UNSF** United Nations Security Force in West New Guinea (West Irian) October-1962-April 1963
7. **UNYOM** United Nations Yemen Observation Mission July 1963-September 1964	8. **UNFICP** United Nations Peacekeeping Force in Cyprus March 1964-
9. **DOMREP** Mission of the Representative of the Secretary General in the Dominican Republic May 1965-October 1966	10. **UNIPOM** United Nations India-Pakistan Observation Mission September 1965- March 1966
11. **UNEFH** Second United Nations Emergency Force October 1973-July 1979	12. **UNDOF** United Nations Disengagement Force Observer Force June 1974-
13. **UNIFIL** United Nations Interim Force in Lebanon March 1978	14. **UNGOMAP** United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan May 1988-March 1990
15. **UNIIMOG** United nations Iran-Iraq Military Observer Group August 1988-February 1991	16. **UNAVEM I** United Nations Angola Verification Mission; January 1989-June 1991
17. **UNTAG** United Nations Transition Assistance Group April 1989-March 1990	18. **ONUCA** United Nations Observer Group in Central America November 1989- January 1992
19. **UNIKOM** United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission April 1991-	20. **UNAVEM II** United Nations Angola Verification Mission II : June 1991- February 1995

21. **ONUSAL** United Nations Observer Mission in El Salvador July 1991-April 995	22. **MINURSO** United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara April 1991–
23. **UNAMIC** United Nation's Advance Mission in Cambodia October 1991-March 1992	24. **UNPROFOR** United Nations Protection Force March 1992-December 1995
25. **UNTAC** United Nations Transitional Authority in Cambodia March 1992- Sep 1993	26. **UNOSOM I** United Nations Operation in Somalia I April 1992-March 1993
27. **ONUMOZ** United Nations Operation in Mozambique December 1992- December 1994	28. **UNOSOM II** United Nations Operation in Somalia II March 1993-March 1995
29. **UNOMUR** United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda June 1993-September 1994	30. **UNOMIG** United Nations Observer Mission in Georgia August 1993
31. **UNOMIL** United Nations Observer Mission in Liberia September 1993	32. **UNMIH** United Nations Mission in Haiti September 1993-June 1996
33. **UNAMIR** United Nations Assistance Mission for Rwanda October 1993-March 1996	34. **UNASOG** United Nations Aouzou Strip Obsever Group May 1994-June 1994
35. **UNMOT** United Nations Mission of Observers in Tajikistan December 1994-	36. **UNAVEM III** United Nations Angola Verification Mission III February 1995-
37. **UNCRO** United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia March 1995- January 1996	38. **UNPREDEP** United Nations Preventive Deployment Force March 1995-
39. **UNMIBH** United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina December 1995	40. **UNTAES** United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja, and Western Sirmium January 1996-
41. **UNMOP** United Nations Mission of Observers in Prevlaka January 1996-	42. **UNSMIH** United Nations Support Mission in Haiti July 1996-
43. **MINUGUA** United Nations Verification Mission in Guatemala January 1997-	

সূত্র : Conway W. Henderson, International Relations Conflict and Cooperation at the Turn of the 21st Century, Boston, 1998, P-401.

উপসংহার

বিগত শতাব্দীতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। একটি ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের উত্থান আর অন্যটি ১৯৯১ সালে সেই সোভিয়েত ইউনিয়নেই সমাজতন্ত্রের পতন। এ প্রেক্ষাপটে নতুন যে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠছে, তাতে করে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রকে এককশক্তি হিসেবে মনে করা হলেও, বাস্তবগত কারণে যুক্তরাষ্ট্র আর এককশক্তি নয় এবং বেশ কিছু আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব ঘটেছে, যারা আঞ্চলিক তথা বিশ্বরাজনীতিতে প্রভাব ফেলছে। ফলে আগামী দিনে এক ধরনের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার জন্ম হতে পারে, যা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণেই জাতিসংঘের ভূমিকা আজ ব্যাপক। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছিল। কিন্তু ইরাকের উপর ক্রমবর্ধমান মার্কিনী হামলা ঠেকাতে ও দেশটির দখল (২০০৩) ঠেকাতে জাতিসংঘের ব্যর্থতা তার গ্রহণযোগ্যতাকে হ্রাস করেছে। এই গ্রহণযোগ্যতা এখন বাড়ানো প্রয়োজন। জাতিসংঘ আজ যাতে কোনো বিশেষ দেশ বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত না হয়, সে ব্যাপারে লক্ষ রাখা দরকার।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

1. Javier Perez de Cuellar, "The United Nations and World Politics", in Charles W. Kegley Jr. and Eugene R. Wittkopf (ed) "The Global Agenda Issues and Perspectives', New York, 1984
2. Inis L. Claude Jr., "The Changing United Nations", New York, 1967
3. Jock A. Finlayson and Mark W. Zacher, The United Nations and Collective Security 'Retrospect and Prospect', Los Angeles, 1980
4. David A. Kay (ed), 'The United Nations Political System', New York, 1970
5. John G. Stoessinger, "The United Nations and the Superpowers China, Russia, and America", New York, 1977

নবম অধ্যায়

চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

All kinds of arguments against the peasant movement must be speedily set right. The erroneous measures taken by the revolutionary authorities concerning the peasant movement must be speedily changed. Only thus can any good be done for the future of the revolution.

Mao Zedong
(Quoted in William T. De Bary ed. Source
of Chinese Tradition, 1960)

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। বিপ্লবের মাধ্যমে নিষ্পেষিত জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্তিকামী, স্বাধীনচেতা জনগণ দেশের প্রচলিত স্বৈরাচারী, অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছে। এখানে অবশ্য একটি কথা বলা প্রয়োজন, জনগণের ভিতর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা না থাকলে, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ না নিলে কোনো বিপ্লবই সফল হতে পারে না। বিংশ শতাব্দীতে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। কৃষিভিত্তিক একটি সমাজেও যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে, চীনা বিপ্লব সেটা প্রমাণ করেছিল। সেইসাথে বিংশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছিল চীনা সমাজতন্ত্রের নয়ারূপ—সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি। প্রতিটি বিপ্লবের ন্যায় চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্বব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে চীন হচ্ছে দ্বিতীয় রাষ্ট্র যেখানে রাশিয়ার পর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হলেও রাশিয়ায় যেভাবে সমাজতন্ত্র বিকশিত হয়েছে, চীনে সেভাবে হয়নি। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে কৃষকশ্রেণীর ভূমিকা ছিল বড়। চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটেছিল এবং পরিবর্তে সেখানে সমাজতান্ত্রিক শাসন-

ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। চীনের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মাও জে দং। মূলত, তাঁর দূরদর্শিতা ও সফল নেতৃত্বের কারণেই চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফলতা পেয়েছিল। পরবর্তীকালে আশির দশকে সেই সমাজতন্ত্রকে আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আরেক অবিসংবাদিত নেতা দেং জিয়াও পিং। চীনে বর্তমানে 'বাজার নির্ভর সমাজতন্ত্র' বিনির্মাণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তার ভিত্তি রচনা করেছিলেন দেং জিয়াও পিং। বলতে বাধা নেই চীন এখন আর ধ্রুপদী মার্কসবাদ অনুসরণ করে না। মার্কসবাদ মাওবাদের সাথে বাজারনির্ভর অর্থনীতির কিছু কিছু উপাদান সংযোজিত হয়েছে। এটাই চীনা সমাজতন্ত্রের সৌন্দর্য।

চীনের ইতিহাস

সমাজতান্ত্রিক চীন বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জাতিসংঘের ভেটো প্রদানকারী ৫টি দেশের মধ্যে চীন একটি। এর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১২০ কোটির উপরে। চীনে ৫৬টি জাতি রয়েছে এবং দেশের শতকরা ৯৪ ভাগ লোক হান জাতির। অন্যান্য জাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে– থাই, লি, লমু, তাতার, তিব্বতী, তোং, কাজাক, উজবেক প্রভৃতি। প্রাচীনকালে অন্যান্য দেশের মতো চীনেও রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সিয়া রাজবংশই ছিল চীনের সর্বপ্রথম রাজবংশ (খ্রিস্টপূর্ব একবিংশ থেকে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তদশ শতাব্দী)। পর্যায়ক্রমে ছিল, হান, সুই, থাং, সোং, ওয়াং, আনশ, ইউয়ান, মিং, মাঞ্চু রাজবংশ চীনে শাসনক্ষমতায় ছিল। *(চিয়ান পোজান, শাও স্যুন চেং, হু হুয়া, চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পেইচিং, চীন, ১৯৮৯)*। মূলত, চীনের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর অর্থনীতি। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অন্যান্য দেশের সাথে চীনের বাণিজ্যিক বা কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে ১৭৯৩ সালে লর্ড ম্যাকারটনি নামে একজন দূতকে চীনে পাঠানো হয় ব্রিটেনের সাথে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। কিন্তু তদানীন্তন চীন সম্রাট ছিং সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসনকাল শুরু হলে তারা চীনে আফিম ব্যবসা শুরু করে। ১৯৩৯-৪২ সময়সীমায় সংঘটিত ইঙ্গ-চীন যুদ্ধকে আফিমযুদ্ধ বা Opium War হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সংঘর্ষের মূলে আফিম সমস্যা ছিল না, সমস্যা ছিল চীনা সাম্রাজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থির করা। ওই যুদ্ধে চীন পরাস্ত হয় এবং ১৮৪২ সালে নানকিং সন্ধি (Treaty of Nanking) দ্বারা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ওই সন্ধি অনুযায়ী চীন হংকং বন্দর ইংল্যান্ডকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ও অপর ৫টি বন্দরে ইউরোপীয় বণিকদের অবাধ বাণিজ্যাধিকার প্রদান করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে রয়েছে তাইপিং বিদ্রোহ (১৮৫০) ও দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ (১৮৫৬-৫৮)। ব্রিটেন ও ফ্রান্স যৌথভাবে ১৮৫৬ সালে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চীন সম্রাট তিয়েন সিয়েন সন্ধি (Treaties of Tientsin, 1958) চুক্তি করতে বাধ্য হন। ওই চুক্তিতে চীনকে ক্ষতিপূরণ ও ১৬টি বন্দর বিদেশি বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য করা হয়। বন্দরগুলোতে বিদেশিদের উদ্ধত আচরণ, অর্থনৈতিক শোষণ, খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের আচরণের

প্রতিবাদে ১৯০০ সালে সংঘটিত হয় বক্সার বিদ্রোহ। বক্সার বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল ও চীনে বিদেশিদের প্রভুত্ব আরো বেড়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগে কোরিয়ার অধিকার নিয়ে চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫) ছিল আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মূলত, ওই যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের ফলে চীনের জনসাধারণের মাঝে রাজতন্ত্র বিরোধী চেতনা শক্তিশালী হয় ও সংস্কারের পক্ষে দাবি শক্তিশালী হয়। বিভিন্ন বিদেশি শক্তির সাথে চীনের যুদ্ধ এবং শোচনীয় পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে চীনে বিপ্লবী ধারণার সূত্রপাত ঘটতে থাকে। পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারিত হয় এবং তারা বুঝতে পারে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কারণে চীন শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারছে না। এ কারণে তারা রাজতন্ত্রের অবসান এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ ঔপনিবেশিক শক্তি উচ্ছেদ এবং চীনের মুক্তির জন্য সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে তাদের নেতৃত্বে ছিলেন সুন চোং শান (সান ইয়াৎ সেন)। তিনি সংস্কার আন্দোলনের পরিবর্তে বিপ্লবী পন্থা অনুসরণ করে। গুপ্ত সমিতি গঠন করেন এবং বিদেশে বসবাসকারী চীনাদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহের পরিকল্পনা করেন। ১৯০৫ সালে আরো বহু বিপ্লবীদের সাথে টোকিও শহরে একত্র হয়ে গঠন করে *"চোংকুও কেমিং থোং মেং হুই"* বা চীনা বিপ্লবী সংঘ। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ডা. সুন চোং শান-এর এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল ব্যাপক। তাঁর নীতি ছিল তিনটি, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকা। দলে দলে তরুণরা এই আন্দোলনে শরিক হয়। বাহ্যত এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল চীনের মাঞ্চু রাজবংশের রাজা ছিং-এর পতন। বিপ্লবীরা ১৯১২ সালের জানুয়ারিতে অচিরেই নানচিং দখল করে ও ডা. সুন চোং সানকে সভাপতি বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে। এদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা মাঞ্চু রাজবংশ রক্ষার জন্য কিছু সাংবিধানিক সংস্কার ঘোষণা করে এবং ইউয়ান সি খাই নামের একজন সেনাপতির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন। এভাবেই চীন বিভক্ত হয়ে যায়। দক্ষিণে সুন চোং শান ও উত্তরে ইউয়ান সি খাই-এর কর্তৃত্ব বজায় থাকে। পরবর্তীকালে ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সমঝোতার ফলে সম্রাট স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করেন ও ইউয়ান সি খাই সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সান ইয়াৎ সেন তার দলের নাম রাখেন *কুয়ো মিং তাং* (Kuo Ming Tang)। আর এভাবেই প্রায় তিনশ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। চীন এই বিপ্লবকে বুর্জোয়া বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। চীনা জনগণকে আরো উদ্দীপিত করার ক্ষেত্রে এই বিপ্লব একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। উল্লেখ্য যে, ডা. সুন চোং শানই ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছেন সান ইয়াৎ সেন হিসেবে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত

১৯১৭ সালে রাশিয়া বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। চীন রাশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র হওয়ার কারণে কমিউনিজমের হাওয়া চীনের জনগণের মাঝে এসে পড়ে। তারা মার্কসীয় মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে মার্কসবাদী পাঠচক্র গঠন করেন। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপক, লি তা চাও এবং ছেন তু সিউ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রদের মধ্যে মাও জে দংও মার্কসবাদী পাঠচক্রে যোগ

দেন। সাংহাইয়ে ১৯১৮ সালে এবং পিকিংয়ে ১৯১৯ সালে এই রকম পাঠচক্র গঠিত হয়। সাংহাইয়ে ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয় এবং পিকিং ও ক্যান্টনে এরূপ গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। মাও জে দং ১৯২০ সালে হুনানে মার্কসবাদী পাঠচক্র ও 'সোস্যালিস্ট ইয়ুথ লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত, এভাবে চীনের জনগণের মধ্যে মার্কসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

কমিউনিস্ট পার্টি গঠন

১৯২১ সালের ১ জুলাই সাংহাইয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে জন্মলাভ করে। এক্ষেত্রে কমিন্টর্ন নামে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা দুজন প্রতিনিধিকে চীনে প্রেরণ করে। তারা চীনের বিভিন্ন মার্কসবাদী সংস্থাসমূহকে একত্র করেন এবং সাংহাইয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হন। ১৯২১ সালের ১ জুলাই সাংহাই-এ আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ১৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাও জে দং অন্যতম। ওই কংগ্রেসে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছেন তু সিউ-কে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয় এবং পার্টির সংবিধান রচিত হয়। প্রাথমিকভাবে সরাসরি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে লেনিনের তত্ত্ব অনুসারে স্থির করা হয় যে, ঔপনিবেশিক অনগ্রসর সব দেশে শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিত ও শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে চলতে হবে। এরই ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২৩ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট

১৯২৩ সালের জুন মাসে কুয়াংচৌতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ওই কংগ্রেসে কুয়ো মিং তাং পার্টির সাথে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বলা হয় পার্টির যুবলীগের সদস্যরা কুয়ো মিং তাং পার্টিতে যোগ দিয়ে পার্টির পক্ষে কাজ করতে পারবে। কমিউনিস্ট পার্টি সান ইয়াৎ সেনকে নতুনভাবে সরকার গঠন করতে বলে। অবশ্য পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সরকারও কুয়ো মিং তাং-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়। ১৯২৫ সালের ১২ মার্চ সান ইয়াৎসেনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিয়াং কাইশেক (চিয়াং চিয়েশি) *কুয়ো মিং তাং-এর* নেতৃত্ব লাভ করে।

বিদেশি হস্তক্ষেপ এবং শ্রমিক গ্রেফতারের প্রতিবাদে সাংহাইয়ে ১৯২৫ সালের ২৯ মে শ্রমিকরা ধর্মঘট ডাকে এবং বিশাল মিছিল বের করে। মিছিলের উপর ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক গুলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে ওঠে। 'ব্রিটিশ ও জাপানি পণ্যবর্জন' কর্মসূচি শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টি এবং *কুয়ো মিং তাং*-এর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় এবং যুক্তফ্রন্টের এই নেতৃত্ব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু মিছিল ও ধর্মঘটের কারণে হংকংয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে কুয়ো মিং তাং বাহিনী ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে উত্তরাঞ্চলে

সামরিক অভিযান শুরু করে এবং সেখানে সমরনায়কদের পতন ঘটে। এ সময় *কুয়ো মিং তাং*-এর সাথে কমিউনিস্টদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায় এবং যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি বৃদ্ধিতে চিয়াং কাইশেক আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং ১৯২৭ সালের ২২ মার্চ সাংহাইয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং বহু কমিউনিস্টকে হত্যা করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মাও জে দং কমিউনিস্ট পার্টিকে সুসংহত করার লক্ষ্যে লালফৌজকে আরো শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেন। চিয়াং কাইশেকের কমিউনিস্ট নিধন কর্মসূচি প্রতিরোধের লক্ষ্যে মাও জে দং কৃষকভিত্তিক কৌশল অবলম্বন করেন। মূলত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা তিনি লালফৌজ গঠন করেন।

বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাও জে দং ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতা তাঁদের কিছুসংখ্যক যোদ্ধাদের নিয়ে চিয়াংসি প্রদেশে গমন করেন। সেখানে তাঁরা স্থানীয় কৃষকদের সহায়তায় ওই প্রদেশের অংশবিশেষকে Base Area-তে পরিণত করেন। কিন্তু ১৯৩০ ও ১৯৩৪ সালে চিয়াং কাইশেকের উন্নত সেনাবাহিনী ওই এলাকা থেকে কমিউনিস্টদের বিতাড়িত করে। ফলে ১৯৩৪ সালে মাও জে দংকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করা হয় এবং মাও-এর গেরিলা যুদ্ধের কৌশল পরিহার করে কুয়ো মিং তাং বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়। ফলে উন্নততর কুয়ো মিং তাং বাহিনীর কাছে কমিউনিস্ট বাহিনী পরাজিত হয়। চৌ-এন-লাই এবং লি-লি সান এই সম্মুখযুদ্ধের পক্ষপাতি ছিলেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন এবং মাও জে দং-এর নীতি গ্রহণ করেন। সম্মুখযুদ্ধে কমিউনিস্টদের পরাজয়ের ফলে চিয়াং কাইশেক আবার কমিউনিস্ট নিধনে তৎপর হন। তিনি ১৯৩০ সালে চীনা কমিউনিস্টদের নিধনের উদ্দেশ্যে পর পর বহু আক্রমণ চালাতে থাকেন। এ সময় অর্থাৎ ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উত্তর পূর্ব চীনের দুমিলিয়ন বর্গকিলোমিটার ভূমি এবং ৩০ মিলিয়ন অধিক লোকসম্পন্ন লিয়াওনিং, চিলিন ও হেইলোংচিয়াং প্রদেশ তিনটি জাপান দখল করে মাঞ্চুরিয়া নাম দিয়ে সেখানে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। চিয়াং কাইশেক এই বৈদেশিক আক্রমণের মুখে বিপর্যয়ের প্রাক্কালে দেশের কমিউনিস্টদের উপর উপর্যুপরি হামলা কিছুদিনের জন্য বন্ধ করতে বাধ্য হন। কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াং কাইশেকের কাছে সহযোগিতার প্রস্তাব পাঠালে তিনি তা মেনে নেন। কিন্তু পরবর্তী বছরই তিনি কমিউনিস্ট নিধননীতি পুনরায় শুরু করেন এবং কমিউনিস্টদের জিয়াংজি অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ওই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, জার্মানি এবং ইতালির সহায়তা নিয়ে কুয়ো মিং তাং বাহিনী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান শুরু করে। কুয়ো মিং তাং বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখ লাল ফৌজের মূলবাহিনী চিয়াংসি বিপ্লবী ঘাঁটি ছেড়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে বিখ্যাত লং মার্চ শুরু করে। লং মার্চটি কুয়াং তোং, হুনান এবং কুয়াংসি অতিক্রম করে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে কুইচৌ এর জুন-ই নামক স্থানে পৌঁছে। এরপর বহু বাধা অতিক্রম করে লং মার্চটি ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে উত্তর সেনসীতে পৌঁছল। একই সঙ্গে ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে লাল ফৌজের বাহিনী উত্তর সেনসীতে মূলবাহিনীর

সাথে যোগ দিল। এ বিরাট যুদ্ধ নীতিই ইতিহাসে 'লং মার্চ' নামে পরিচিত। প্রায় ৮ হাজার মাইলব্যাপী এই লং মার্চে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ অংশ নেয়। ১১টি প্রদেশের মধ্য দিয়ে এই লং মার্চ অগ্রসর হয় এবং এটা প্রথমে পশ্চিমদিকে ও পরে উত্তরদিকে পরিচালিত হয়। এই লং মার্চটি ৫টি পর্বতমালা এবং উমেং-এর উচ্চ পাহাড় ও খাড়া পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেছিল। তাঁরা উচিয়াং, চিনশা, তাতু নদীর মতো প্রাকৃতিক বাধাকে জয় করেছিলেন। জনমনুষ্যহীন লাজি বিশাল জলাভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছিলেন এবং বিপজ্জনক গিরিপথ ভেদ করেছিলেন। লং মার্চের এই সাফল্য বিপ্লবীদের আরো উদ্বুদ্ধ করেছিল ও চীনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে তারা আরো একধাপ এগিয়ে গিয়েছিল।

১৯৩৫ সালের ৬ জানুয়ারি লালফৌজ সুনাই দখল করার পর সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং মাও জে দংকে পুনরায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়েছিল। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সোভিয়েত' বা মুক্তাঞ্চল স্থাপিত হয় এবং ইয়েনানকে এর রাজধানী করা হয়। পাশাপাশি উত্তর সেনসীতে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাও জে দং গ্রামাঞ্চলের ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদের নিয়ে সম্মিলিত সরকার গঠন করেন, যাকে বলা হতো জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব বা নয়াগণতন্ত্র। এ সরকারের কর্মকাণ্ড গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভূমিসংস্কার এবং কৃষকদের মাঝে জমি বণ্টন ছিল এদের মূলকাজ। এছাড়াও ওই সরকার হাসপাতাল, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে এবং সশস্ত্রবাহিনী গঠন করে।

১৯৩৬ সালে চিয়াং কাইশেকের সাথে কমিউনিস্টদের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এর প্রেক্ষাপট আমাদের জানা দরকার। মাও জে দং মূলত জাপান সাম্রাজ্যের আগ্রাসনকে রুখে দেয়ার সংগ্রামে সহযোগিতা করার জন্যে চিয়াং কাইশেকের নিকট বার বার আবেদন করেছিলেন। চিয়াং কাইশেক এই আবেদনে সাড়া দেননি। তিনি জিয়ান থেকে কমিউনিস্টদের বিতাড়নের পরিকল্পনা করেন। চিয়াং কাইশেক কুয়ো মিং তাং বাহিনীর সৈন্যদের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকেন। কিন্তু কুয়ো মিং তাং বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ছিল মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসী। তারা নিজেদের মধ্যে আত্মকলহের পরিবর্তে জাপানিদের বিতাড়ন সঙ্গত মনে করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে চিয়াং কাইশেক তাঁর নিজের সৈন্যবাহিনীর হাতে আটক হন। তবে চৌ এন লাই-এর মধ্যস্থতায় তিনি মুক্ত হন। চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্টদের সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠনে রাজি হন এবং তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান করা হয়। কিন্তু চিয়াং কাইশেক দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টকে আন্তরিকভাবে মেনে নেননি। গ্রামাঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে চিয়াং কাইশেক সুদৃষ্টিতে দেখেননি। তাই চিয়াং কাইশেকের সৈন্যবাহিনীর সাথে কমিউনিস্টদের সংঘাত শুরু হয় এবং ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্টদের কর্তৃত্ব এবং শহর অঞ্চলে চিয়াং কাইশেকের বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। ওই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।

১৯৩৭ সালে জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ দখল করে। চীন থেকে জাপানিদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে মাও জে দং যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

চীনের জনগণের বিরুদ্ধে চীনাদের যুদ্ধ করা উচিত নয়, চীনের যুদ্ধ করতে হবে জাপানের বিরুদ্ধে। ১৯৩৭-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মাও জে দং তাঁর লালফৌজদের নিয়ে জাপানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। জাপান ১৯৪৫ সালে আত্মসমর্পণ করে। কমিউনিস্টরা চীনের অনেক অঞ্চলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কাঠামো নিয়ে কমিউনিস্ট এবং জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৫-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চীনে গৃহযুদ্ধ চলে। মাও জে দং গ্রামাঞ্চল নিয়ে শহর ঘেরাও করার নীতি প্রয়োগ করেন। চিয়াং কাইশেক যদিও যুদ্ধের প্রথম দিকে কিছুটা সফল হন, কিন্তু স্বৈরাচারী মনোভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতির জন্য তাঁর পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট বাহিনীর সংঘবদ্ধ আক্রমণের মুখে কুয়ো মিং তাং বাহিনী বিপন্ন হয়ে ওঠে। তারা বিভিন্ন প্রদেশে পরাজয় বরণ করে একসময় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

১৯৪৯ সালে চীনের মূল ভূ-খণ্ডে মাও জে দং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চিয়াং কাইশেক রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি লি জোং রেনকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করেন। চিয়াং কাইশেক এ সময় কমিউনিস্ট এবং কুয়ো মিং তাং-এর মধ্যে সমগ্র চীনকে ভাগাভাগি করার প্রস্তাব দেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং কুয়ো মিং তাং-এর রাজধানী নানচিং দখল করে। চিয়াং কাইশেক তাঁর বাহিনী নিয়ে ক্যান্টনে আশ্রয় নেন এবং পরে মার্কিন সহযোগিতায় ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে সাবেক ফরমোজা ও বর্তমানে তাইওয়ানে স্থায়ী আশ্রয়গ্রহণ করেন। মাও জে দং ওই বছর ১ অক্টোবর চীনকে গণপ্রজাতন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করেন।

চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ছিল। চীনা রাষ্ট্রের চরিত্র কী হবে, এ সম্পর্কে ১৯৪০ সালেই মাও জে দং একটি ধারণা দিয়েছিলেন। "নয়াগণতন্ত্র সম্পর্কে" শীর্ষক এক প্রবন্ধে মাও জে দং উল্লেখ করেছিলেন, "এটা খুব স্পষ্ট যে চীনের বর্তমান সমাজের চরিত্র যেহেতু ঔপনিবেশিক, আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক, তাই চীনের বিপ্লবকে অবশ্যই দুইভাগে ভাগ করতে হবে। প্রথম পর্বের কাজ হলো, সমাজের এই ঔপনিবেশিক, আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ত তান্ত্রিক রূপকে একটা স্বাধীন, গণতান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তন করা, দ্বিতীয় পর্বের কাজ হলো, বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা (Selected Work of Mao Zedong, Foreign Languages Press, Beijing, 1975, Vol. II, P. 342)। এখানে আমাদের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি থাকতে পারে চীনের তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক সমাজ' নিয়ে। আমরা পশ্চিমাবিশ্বে বহু দল, ব্যক্তি খাত, তথা বাজার অর্থনীতিনির্ভর যে 'গণতন্ত্র' বিকশিত হতে দেখেছি, চীনে কিন্তু ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের পর সে ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মাও জে দংও এমনটি চাননি। তাদের ভাষায় "গণতন্ত্র' হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির একক নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সমাজব্যবস্থা, সেখানে বহু দলের কোনো অস্তিত্ব নেই। সেই সমাজব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী কমিউনিস্ট

পার্টি শ্রমজীবী মানুষের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। আর সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বলতে বোঝানো হয়েছিল সকল ধরনের উৎপাদনব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হবে। আর এর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের অবসান ঘটবে। একই সাথে চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল বিশ্ব বিপ্লবেরই একটা অংশ। চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাওবাদ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। চীনা বিপ্লবের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, সেখানে কৃষকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। মাও জে দং মনে করতেন চীনের সমাজব্যবস্থা যেহেতু কৃষিনির্ভর, সেহেতু কৃষকরাও শিল্প-কারখানার শোষিত মানুষদের মতো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারেন। মার্কস যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কল্পনা করেছিলেন, সেখানে কৃষকদের ভূমিকা উহ্য ছিল। কল-কারখানার শ্রমিকদের ভূমিকাকে মার্কস দেখেছিলেন বড় করে। মাও জে দং মার্কসবাদকে চীনা সমাজের আলোকেই নতুন করে উপস্থাপন করেছিলেন।

চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তাৎপর্য

প্রতিটি বিপ্লবের ন্যায় চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও বিশ্বব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছিল। মানবসমাজের বিবর্তনের ধারায় ওই বিপ্লব যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সংঘটিত বিশ্বের সমস্ত ঘটনার মধ্যে চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। এই বিপ্লবের প্রভাব, প্রতিক্রিয়া কেবল চীনের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এর দ্বারা অন্যান্য দেশের মুক্তি-আন্দোলনও প্রভাবিত হয়েছে। চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। প্রথমত, চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্বের ওই অঞ্চলের এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্ত করেছিল। দ্বিতীয়ত, চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মার্কসবাদের প্রায়োগিক মূল্য প্রমাণ করেছে মার্কসবাদ যে ইউরোপীয় দর্শন নয় এবং এর সার্বজনীন প্রয়োগে যোগ্যতা আছে। বিপ্লবের মধ্যে তা প্রমাণিত হয়েছিল। যদিও এখানে মাও নতুন কিছু উপাদান যুক্ত করেন। তৃতীয়ত, চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মার্কসবাদের সৃজনশীল ও প্রয়োজনীয় গুরুত্বকে তুলে ধরেছিল। মার্কসবাদে সমাজ বিবর্তনের সাধারণ নিয়মের পাশাপাশি জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মাও জে দং এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। মূলত, মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ফলেই চীনের বিপ্লব সাফল্য লাভ করেছিল। চতুর্থত, এই বিপ্লবের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছিল কৃষকশ্রেণীর দ্বারা বিপ্লব সম্ভব। কৃষকশ্রেণীর কর্মকাণ্ড, দৃঢ় সংকল্প, দক্ষতা, রাজনৈতিক চেতনা সংগঠিত প্রয়াসই বিপ্লবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এই বিপ্লব সেটাই প্রমাণ করেছিল। পঞ্চমত, সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কেবল কমিউনিস্ট পার্টি যে শোষণভিত্তিক সমাজের অবসান ঘটাতে পারে, চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তা প্রমাণ করেছিল। কেননা চীনের গণবিপ্লব সফল হয়েছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সার্থক নেতৃত্বের কারণেই।

চীনের গণবিপ্লব ও অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এবং অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবেই চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। উভয় বিপ্লব পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটালেও এদের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সাদৃশ্যসমূহ

ক. রাশিয়া ও চীন উভয় দেশেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল;

খ. উভয় দেশের বিপ্লবের নেতৃত্ব সর্বহারাশ্রেণীর হাতে ছিল;

গ. উভয় বিপ্লবের ক্ষেত্রেই শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী বন্ধনকে মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল;

ঘ. দুটি বিপ্লবেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল– "রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল এবং সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা;

ঙ. শ্রেণীশাসন ও শোষণের অবসান এবং মার্কসীয় মতাদর্শ অনুসারে সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল দুটি বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য;

চ. উভয় বিপ্লবের মাধ্যমেই মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছিল।

বৈসাদৃশ্যসমূহ

ক. ভিন্ন ভিন্ন আর্থসামাজিক অবস্থায় বিপ্লব দুটি সংঘটিত হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ায় আর চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক, আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে;

খ. দুটি বিপ্লবের মধ্যেশ্রেণীবিন্যাস ও কৌশলগত পার্থক্য ছিল। অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু চীনে তা হয়নি। চীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাও জে দং-এর ধারণা অনুযায়ী নয়াগণতন্ত্র;

গ. দুটি বিপ্লবের প্রাথমিক লক্ষ্য ভিন্ন ছিল। অক্টোবর বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল– পুঁজিবাদের অবসান। অপরদিকে, চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের অবসান;

ঘ. চীনের বিপ্লবে পাতিবুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়ারাও সাহায্য করেছিল, কিন্তু রাশিয়ায় বুর্জোয়ারা বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিল;

ঙ. অক্টোবর বিপ্লবের মূলকেন্দ্র ছিল শহর। তাই শহরেই প্রথম বিপ্লব ঘটেছিল এবং পরে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অপরদিকে চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কেন্দ্র ছিল গ্রাম। মাও জে দং গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও-এর নীতি অনুসরণ করেছিলেন;

চ. চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবার পূর্বে গৃহযুদ্ধ বিরাজমান ছিল। কিন্তু রাশিয়াতে বিপ্লব শেষ হবার পর গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল।

চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপর অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব

রাশিয়ার মহান অক্টোবর বিপ্লব বিশ্বের ইতিহাসে একটি নবযুগের সম্ভাবনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপর এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। অনেকের মতে, অক্টোবর বিপ্লবের ধারাবাহিক ফলে ছিল চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আবার কারো মতে, সবরকম গণবিপ্লবের সাধারণ পথের সন্ধান দিয়েছে ওই অক্টোবর বিপ্লব। ওই বিপ্লব রাশিয়ার সুদীর্ঘকালের স্বৈরাচারী জার শাসনের অবসান ঘটিয়েছে এবং প্রমাণ করেছিল সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তি পতনের উর্ধ্বে নয়। ওই বিপ্লব পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের উপনিবেশগুলোর শ্রমজীবী ও নিপীড়িত মানুষের মনে বিপ্লবী চেতনা উজ্জীবিত করেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বীজবপন করেছিল। মহান অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যের পরই দুনিয়ার সর্বত্র বিশেষত উপনিবেশগুলোতে মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়। অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহাসিক সাফল্য চীনের জনগণকে উজ্জীবিত করেছিল এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। প্রকৃতপক্ষে, অক্টোবর বিপ্লবের পরই চীনের মুক্তিকামী মানুষ মুক্তির সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছিল এবং চীনের শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে, যা চীনের জনগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। চীনের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, যুব-ছাত্র সম্প্রদায় অক্টোবর বিপ্লবের মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর পৃথিবীর যে দেশেই নিপীড়িত মানুষ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সামিল হয়েছে, সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন সব রকম সহযোগিতা করেছে। চীনের গণবিপ্লবের সব পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাহায্য করেছে।

বিপ্লব পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর চীনে ব্যাপক কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল। ওইসব কর্মসূচি সমাজতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী করার জন্য নেয়া হলেও, কোনো কোনো কর্মসূচি পরবর্তীকালে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করে। ওইসব কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

ক. **শুদ্ধি অভিযান :** ১৯৫৩ সালের পর মাও জে দং দলের মধ্যে শুদ্ধি অভিযান চালান। দল যাতে দ্বিধাবিভক্ত হতে না পারে এজন্য সমাজতন্ত্র বিরোধীদেরকে তিনি দল থেকে বের করে দেন। এরপর তিনি রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, শিল্প, ভূমি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কার্যপ্রণালি ঘোষণা করেন। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। দরিদ্র কৃষকদের তিনি শিক্ষার সুযোগ দেন এবং বিনাবেতনে শিক্ষা ও বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

খ. **শত ফুল ফুটতে দাও :** ১৯৫৬ সালে মাও জে দং চীনে "শতফুল ফুটতে দাও" নীতি অনুসরণ করেন। অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা প্রকাশে বুদ্ধিজীবীশ্রেণীকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি সমাজতন্ত্র বিরোধী সকল বুদ্ধিজীবীদের নিকট থেকে

কমিউনিস্ট পার্টির নীতির সমালোচনা আহ্বান করেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি নিজেকে সব সময় সঠিক বলে মনে করে না এবং সমালোচনা শুনতে আগ্রহী।

গ. **Great Leap Forward Programme :** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্থায়ী বিপ্লব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মাও জে দং বিশ্বাস করতেন। স্থায়ী বিপ্লবের মধ্যে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে চেষ্টা করা হয় তা-ই Great Leap Forward নামে পরিচিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়া-ই ছিল এই তত্ত্বের মূলউদ্দেশ্য। এর অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো ছিল– দেশকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে দেয়া, ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে জনগণের অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো, কৃষিভিত্তিক চীনে শিল্পের প্রসার ঘটানো, জমিগুলোকে ব্যক্তি মালিকানা থেকে সরকারি মালিকানায় নিয়ে যাওয়া ও কতকগুলো কমিউনে ভাগ করা। Great Leap Forward-এর ফলে সৃষ্ট অরাজকতা চীনের অর্থনীতিতে মারাত্মক বিপর্যয় বয়ে আনে। ফলে সেই বিপর্যয় রোধ করার জন্য ডানপন্থীদের প্রভাব কমানোর জন্য মাও জে দং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেন।

ঘ. সাংস্কৃতিক বিপ্লব :

Great Leap Forward ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে চরমপন্থি ও মধ্যপন্থিদের মধ্যে বড় রকমের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং মাও জে দং পুনরায় সমালোচনার শিকার হন। ফলে তিনি ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এর পদক্ষেপ হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে তিনি তাঁর মতবিরোধীদের ও আমলাদের অপসারণ এবং জনগণের চিন্তাধারা ও মনোবলকে আরো বিপ্লবীরূপে গড়ে তোলার জন্য ১৯৬৫ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে এক আন্দোলনের সূচনা করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল– "রাষ্ট্র পর্যায়ের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি সাধন করা।" ১৯৬৬ সালের মধ্যভাগে মাও জে দং কমিউনিস্ট পার্টির কট্টরপন্থিদের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করে সমগ্র চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঢেউ ছড়িয়ে দেন। তিনি তাঁর অনুসারী ছাত্রদের নিয়ে 'রেডগার্ড' নামে আধা সামরিক বাহিনী গঠন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল– সংশোধনবাদ নির্মূল করা, চীনা জনগণের মধ্যে বুর্জোয়া চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ রোধ করা, চীনের সর্বস্তরে বিপ্লবীধারা অব্যাহত রাখা। বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাও জে দং-এর অনুসারীরা উগ্রপন্থার আশ্রয় নেন। বিপ্লবের নামে উর্ধ্বতন দলীয় ও সরকারি কর্মকর্তাদেরকে তাদের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। এর মধ্যে চীনের রাষ্ট্রপ্রধান লিং সাউ চি-কে ১৯৬৮ সালে দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সকল পদ থেকে অপসারণ করা হয়। মাও জে দং-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে চীনে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। এ কারণে মাও জে দং রেডগার্ডদের বাড়াবাড়ি দমনের জন্য ১৯৬৭ সালে সেনাবাহিনী আহ্বান করেছিলেন।

উপসংহার

চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চীন তথা বিশ্বব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। চীনে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক

শাসনব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে চীনের শোষিত জনগণ তাদের অধিকার পেয়েছিল। ভূস্বামীদের অত্যাচার থেকে তারা মুক্তি পেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, উপনিবেশিক শোষণ এবং পুঁজিবাদের ধারক চিয়াং কাইশেকের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল চীনের জনগণ। মাও জে দং-এর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সময়উপযোগী পদক্ষেপের ফলেই চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিয়েও কথা থেকে যায়। চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ভারত, এমনকি সুদূর ল্যাতিন আমেরিকার পেরুতে বিপ্লবীদের 'মাওবাদী বিপ্লবে' উদ্বুদ্ধ করলেও, সাংস্কৃতিক বিপ্লব খোদ চীনে এবং বহির্বিশ্বে চীনের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছিল। ওই সময় অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে চীনের বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। যদিও এটা বলা হয়ে থাকে যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় পার্টির ভেতরে অতিবামদের একটা অংশ মাও জে দংকে ব্যবহার করে ক্ষমতা নিজেদের হাতে করায়ত্ত করতে চেয়েছিল। এদের উপর মাও জে দং-এর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। মাও জে দং-এর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চীনে তথাকথিত "চার কু-চক্রীর" জন্ম হয়েছিল।

চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও কালের ধারাবাহিকতায় সেখানে কিছু কিছু সংস্কার সাধিত হয়। চীনের সমাজতন্ত্রের মূলনীতিগুলো ঠিক রেখে সেখানে এক ধরনের বাজার অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। ফলে চীনের জনগণ স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ব্যক্তিগত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারছেন। সমাজতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতি এ দুই-এর সমন্বয়ে চীন ধীরে ধীরে বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলা হচ্ছে একুশ শতক হবে চীনের। আগামী বিশ থেকে ত্রিশ দশকের মধ্যে চীন অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। তবে আগামী দিনে চীনে কোন্ ধরনের সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, সমাজতন্ত্রের বর্তমান ধারা একইভাবে থাকবে, নাকি সেখানে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটবে এটা দেখার জন্য আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. Piter Callocoresi, 'World Politics since' 1945, 4th Edition Longman New York 1982.
২. অরুণ কুমার সেন, সুশীল কুমার সেন, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, 'চীনের শাসন ব্যবস্থা', কলকাতা, ১৯৮২.
৩. হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'চীনের ইতিহাস' কলকাতা, ১৯৯৩
৪. চিয়ান পোজান, শাও স্যুন চেং, হু হুয়া, 'চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', বেইজিং, চীন ১৯৮৯।

দশম অধ্যায়

ভিয়েতনাম যুদ্ধ

It is scarcely possible anywhere in the world today to raise a body of reasoned support for the opinion that war is a justifiable activity.

John Keegan
(A History on Warfare 1994).

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ছিল একটি দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী যুদ্ধ। ওই যুদ্ধের সফল পরিণতি ভিয়েতনামের জনগণের কাছে তথা বিশ্ববাসীর কাছে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম একটি আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ভিয়েতনাম হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি অপেক্ষাকৃত ছোট দেশ। দখলদারত্বের বিরুদ্ধে দেশটির সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। চীন, জাপান, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারত্ব তথা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশটি জয়ী হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে দেশটি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও, অচিরেই দেশটি ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের ও পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। একসময় বিদেশি প্রভুরা তাদের স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য দেশটি ভাগ পর্যন্ত করেছিল। ১৯৭৬ সালের ২ জুলাই দুই ভিয়েতনাম একত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। ষাট ও সত্তরের দশকে ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে নিন্দা ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ওই সময়কার রাজনীতিতে তা ছিল উল্লেখ করার মতো ঘটনা। ওই সময় উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিটি দেশে ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে জনমত গড়ে উঠেছিল। এমনকি উন্নতবিশ্বের তরুণসমাজও ছিল ওই যুদ্ধের বিপক্ষে। যার পরিণতিতে ওই সময় সারা বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেমনি ধিক্কারধ্বনি শোনা গিয়েছিল, ঠিক তেমনি ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষেও জনমত গড়ে উঠেছিল। ওই সময় ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ, অত্যাধুনিক বোমার ব্যবহার সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যায়, ভিয়েতনাম যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন ত্রিশ লাখেরও বেশি মানুষ, যার মধ্যে ছিলেন ৫৭ হাজার মার্কিন সেনা। ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের আগে ১৯৭৩ সালের ২৭

জানুয়ারি প্যারিসে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিতহয়েছিল। ওই শান্তিচুক্তির কারণে হেনরি কিসিঙ্গার ও লি ডাক থো ১৯৭৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। এরা দুজন ছিলেন শান্তি আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনামের মুখ্য আলোচক। যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম থেকে সেনা প্রত্যাহারের আগে উত্তর ভিয়েতনামের সেনাবাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনামের তৎকালীন রাজধানী সায়গন (পরবর্তীকালে হো চি মিন নগরী) দখল করে নেয়। ১৯৭৬ সালেই দুই ভিয়েতনাম একত্র হয়ে সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বলা ভালো, ১৯৫৪ সালের জেনেভা সম্মেলনের মধ্যে দিয়েই ভিয়েতনামকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল।

দাসতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী জনগণের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। ইতিহাস থেকে জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব ১৭৯ সালে দক্ষিণ চীনের জায়গীরদার ও চীনা সেনাপতি ত্রি উ দা আজকের ভিয়েতনাম দখল করেছিলেন। ভিয়েতনামের বীরযোদ্ধা লাই বনের নেতৃত্বে প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র ভান জুয়ান প্রতিষ্ঠিত হয় ৫৪৪ সালে। কিন্তু ৬০৩ সালে লাই বনের স্বাধীন সরকার চীনা সামন্তশক্তির প্রবল চাপের মুখে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। দশম শতকের প্রারম্ভে প্রথম বছর থেকেই শুরু হয় দীর্ঘস্থায়ী গণঅভ্যুত্থান। ৯৩৮ সালে নো কুয়ান নিজেকে ভিয়েতনামের স্বাধীন রাজা হিসেবে ঘোষণা দেন। চীনে লী রাজবংশের আমলে ১২২৫ সাল পর্যন্ত ভিয়েতনাম বারবার চীনা সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এরপর মঙ্গোলীয়রা (১২৫৭) ভিয়েতনাম আক্রমণ করে। ১২৮৮ সালে কুবলাই খাঁর নেতৃত্বাধীন সর্বশেষ আক্রমণে মঙ্গোলীয়রা পরাজিত হয়। এর পরপরই ভিয়েতনামে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সময় চীন থেকে মঙ্গলদের বিতাড়িত করে মিঙ রাজবংশ চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা ১৪০৬ সালে পুনরায় ভিয়েতনাম দখল করে নেয়। এবং ১৪২৭ সালে তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভিয়েতনাম থেকে বিতাড়িত হয়। ভিয়েতনামে লে লোই'র নেতৃত্বে নতুন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ওইসময় কৃষক অভ্যুত্থান হয় এবং ১৭৪১ থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত কৃষক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়ে নগুয়েন হু কাও ভিয়েতনামে রূপকথার নায়কে পরিণত হন। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাজা ষোড়শ লুই-এর শাসনামলেই ভিয়েতনামে তাদের খুঁটি গাড়ে। ১৭৮৭ সালে তারা একটি চুক্তি করে। ওই চুক্তি বলে ভিয়েতনামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ফরাসিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ধীরে ধীরে ফরাসিরা তাদের অধিকার সংহত করে ১৮৫৮ সালে ও তার পরের বছর সায়গন দখল করে নেয়। ১৮৮৪ সালে ভিয়েতনামের শেষ স্বাধীন রাজাকে তার আশ্রিত সরকারে পরিণত করে। বাহ্যত ওই সময় থেকেই ভিয়েতনাম ফরাসিদের সরাসরি উপনিবেশে পরিণত হয়। একই সাথে তারা লাওস ও কম্পুচিয়া দখল করে তিনটি দেশকে একত্র করে ইন্দোচীন নাম দেয়। ইতিহাস বলে ফরাসি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী জনগণ ১৮৬০ সাল থেকেই গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। পর্যায়ক্রমে সেই গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব চলে যায় ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। আর এই কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন হো চি মিন। ভিয়েতনামের ইতিহাস থেকে জানা যায় হো চি মিন বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। নগুয়ের ভ্যান কুং, নগুয়েন তাত

থান, নগুয়েন আই কুয়োক, লাই সই, ভুয়ং সন নিহি, লিনভ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম তিনি ব্যবহার করতেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য। প্রথম দুটো বাদে বাকি নামগুলো ছিল তাঁর ছদ্মনাম। হো চি মিনের জন্ম ১৮৯০ সালের ১৯ মে, আর মৃত্যু ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে তিনি হো চি মিন নামধারণ করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের সাথে জড়িত থাকলেও, তার জীবনের একটা বড় সময় কেটেছে প্যারিসে, মস্কোতে ও চীনে। তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা কমিনটার্নের প্রতিনিধি হিসেবে ওইসব দেশে কাজ করেছেন। প্যারিসে থাকাকালীন (১৯১১ সালের পর) নির্বাসিত ভিয়েতনামী দেশপ্রেমিকদের দ্বারা গঠিত 'আন্তঃ-ঔপনিবেশিক ইউনিয়ন' নামে যে সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল, তার সাথে জড়িত ছিলেন হো চি মিন। এই সংস্থাটি ছিল কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। এরপর ১৯২৪ সালের দিকে চীনের ক্যান্টনে প্রবাসী ভিয়েতনামী তরুণদের নিয়ে হো চি মিন গঠন করেন 'ভিয়েতনাম বিপ্লবী যুবসমিতি'। এই যুবসমিতিই ছিল ইন্দোচিন কমিউনিস্ট পার্টি। এরপর ১৯৩০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি হংকংয়ের কাছে কৌলুনে ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের এক সম্মেলনে গঠিত হয় 'ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টি'। কিন্তু অক্টোবর মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম অধিবেশনে পার্টির নাম বদলে রাখা হয় 'ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট পার্টি।' ১৯৪০ সালের দিকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ অংশ নেয়ার জন্য হো চি মিন ভিয়েতনামে ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইন্দোচিন প্রত্যক্ষভাবে জাপানের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় ১৯৪০ সালের আগস্টে। ওই সময়ে নভেম্বর মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সপ্তম প্লেনামে জাপানি ফ্যাসিবাদী ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত হয়। ওই সময় পার্টি চীনের কোয়াঙে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ভিয়েতনামী বিপ্লবীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ভিয়েতনামী কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম দিকে চীন ও রাশিয়া দুটো দেশ থেকেই সাহায্য পেয়েছে। ১৯৪১ সালের শেষ দিক থেকে ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আট মাস ধরে গেরিলা যুদ্ধ চলে। ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে এই যুদ্ধের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পায়। এদিকে ১৯৪৫ সালের ৯ মার্চ জাপানিরা সমগ্র ইন্দোচিনে তাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। কিন্তু ভিয়েতনামের গেরিলাদের অগ্রযাত্রা তারা রোধ করতে পারেনি। ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারা হ্যানয় অবরোধ করেন ও শত্রুমুক্ত করেন। হো চি মিন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। পুরো উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ উত্তর ভিয়েতনামে ওই সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, বাও দাইকে প্রধান করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে গঠিত হয় আরেকটি সরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ বাহিনীর সহায়তায় ফরাসিরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের তাবেদার সরকারের উপর 'চাপ' অব্যাহত রাখে। ১৯৫৪ সালের প্রথমদিকে ভিয়েতকংদের আক্রমণে ফরাসি ঘাঁটি দিয়েন বিয়েন ফু'র পতন ঘটে। এর রেশ ধরেই ১৯৫৪ সালের ২০ আগস্ট জেনেভা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে যে চুক্তি হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে, ১. সপ্তদশ অক্ষরেখা বরাবর ভিয়েতনামকে দুভাগে ভাগ করা হবে। উত্তর ভিয়েতনামে হো চি মিন সরকার ও দক্ষিণে বাও দাই সরকার

ক্ষমতা পরিচালনা করবে; ২. ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে সেখানে গণভোটের মাধ্যমে ভিয়েতনামের ভাগ্য নির্ধারণ হবে; ৩. লাওস ও কম্পুচিয়ার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিন দেশের সমন্বয়ে একটি কমিশনও (ভারত, পোল্যান্ড ও কানাডা) গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। কেননা দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি গণভোটের মাধ্যমে বাও দাইকে পদচ্যুত করে নাগো দিয়েন দিয়েম নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি নির্বাচনের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। দিয়েম সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করেছিল। ১৯৬৩ সালে একটি অভ্যুত্থানে দিয়েম সরকারের পতন ঘটেছিল। এরপর দক্ষিণ ভিয়েতনামে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৬৪ সালে টংকিং উপসাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর উপর উত্তর ভিয়েতনামের বোমাবর্ষণের ফলে যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণের নির্দেশ দেয়। এর আগে ১৯৬১ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ওই যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল। এমনি এক পরিস্থিতিতে উত্তর ভিয়েতনামের উদ্যোগে দক্ষিণ ভিয়েতনামে গঠিত হয়েছিল জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট বা National Liberation Front। এদিকে ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন প্রভাবাধীন একটি নির্বাচনে নগুয়েন ভন থিও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। শহরাঞ্চলে থিও সরকারের কিছুটা প্রভাব থাকলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো চলে গিয়েছিল লিবারেশন ফ্রন্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে। ফলে উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ ও বিপ্লবীদের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য প্যারিসে শান্তি আলোচনা শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭৩ সালের ২৭ জানুয়ারি একটি চুক্তির মারফত যুদ্ধের সাময়িক বিরতি হয়। এরপর ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট থিও পদত্যাগ করলে জেনারেল ভ্যান মিন তার স্থলে প্রেসিডেন্ট হন। অন্যদিকে, উত্তর ভিয়েতনামে হো চি মিনের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন টুন ডাক থাঙ। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকার ১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিল সায়গন দখল করে। এর মধ্য দিয়েই দুই ভিয়েতনামের একত্রীকরণের পথ প্রশস্ত হয়। একই সাথে লাওস ও কম্পুচিয়াতেও সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা আন্দোলন সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই জাতি দীর্ঘদিন ছিল পরাধীন। তাই তারা যখন মুক্তি আন্দোলন শুরু করেছিল, তখন বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। উপরন্তু মার্কিন নাপাম বোমাবর্ষণে সাধারণ শিশুরাও যখন মারা যাচ্ছিল ভিয়েতনামে, তখন বিশ্ববাসীর নীরব সমর্থন নিয়ে ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টি সে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। কিন্তু ১৯৭৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত যে সময়সীমা সেই সময়সীমায় ভিয়েতনামের অনেক সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক আসরে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। যেমন ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে কম্পুচিয়ায় সামরিক আগ্রাসন। এমনকি ভিয়েতনাম ১৯৭৯ সালে চীনের সাথেও একটি বিবাদে জড়িয়ে গিয়েছিল। চীন ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভিয়েতনাম আক্রমণ করেছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভিয়েতনাম ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে। সোভিয়েত

ইউনিয়নের সাথে ভিয়েতনামের ২৫ বছর মেয়াদি একটি সামরিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এমনকি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে সংস্কার কর্মসূচি চালু হলে, ভিয়েতনামও এক ধরনের সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে। একটি সমাজতান্ত্রিক সরকারও যে আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি ভিয়েতনামও সেই প্রমাণ রেখেছিল ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে কম্পুচিয়া দখল করে। ওই সময় কম্পুচিয়ায় ক্ষমতাসীন ছিল পল পট ও হেঙ সামরিনের নেতৃত্বাধীন কট্টরপন্থি একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার, যারা 'খেমার রুজ' নামে পরিচিত ছিলেন। তারা ১৯৭৫ সালে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করে একটি 'নতুন ধারার সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেন। মধ্য ষাটের দশকে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মতো খেমার রুজরাও ক্ষমতাসীন হয়ে বুদ্ধিজীবীদেরসহ হাজার হাজার লোককে গ্রামে প্রেরণ করেন এবং গ্রামে সরকারি খামারগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করতে বাধ্য করেন। রাজধানী তারা খালি করে দেন। তাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে তাদের শাসনামলে কয়েক লক্ষ লোক কম্পুচিয়ায় প্রাণ হারিয়েছিল। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই ভিয়েতনাম ১৯৭৮ সালে দেশটি দখল করে ক্ষমতা থেকে খেমার রুজদের উৎখাত করে। তারা ক্ষমতায় বসায় হুন সেনকে। কিন্তু জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা হুন সেন সরকারকে দীর্ঘদিন সমর্থন করেনি। বরং ১৯৮২ সালে খেমার রুজ, দক্ষিণপন্থি ন্যাশনাল ফ্রন্ট ও প্রিন্সসিহানুকের নেতৃত্বে যে প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল, সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মতোই ১৯৮৯ সালে ভিয়েতনাম কম্পুচিয়া থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। উল্লেখ্য, কম্পুচিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে খেমার রুজরা 'চীনা লাইন'-এর প্রতিনিধিত্ব করত, অন্যদিকে হুন সেনরা প্রতিনিধিত্ব করত 'সোভিয়েত-ভিয়েতনাম লাইন'। বলা যেতে পারে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব ছিল, তার প্রতিফলন ঘটেছিল ইন্দোচীনে। ভিয়েতনাম, কম্পুচিয়া ও লাওসে ক্ষমতাসীনরা 'প্রো-সোভিয়েত ইউনিয়ন' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে ভিয়েতনামের মুক্তিআন্দোলন ছিল অনেকগুলো আলোচিত ঘটনার একটি। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা গ্রহণ ও 'সোভিয়েত লাইন' গ্রহণ করলেও, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতনের মতো ভিয়েতনামে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেনি। তারা চীনের মতোই নিজস্ব আঙ্গিকে এখন সমাজতন্ত্রকে ধরে রেখেছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. মহসিন শস্ত্রপানি, বিপ্লবী হো চি মিন, ঢাকা, ১৯৭৩

২. আবুল কালাম, ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে, বিপ্লবী যুদ্ধের কলাকৌশল, ঢাকা, ১৯৮৫

৩. George C. Herring, America's Longest War The United States and Vietnam, 1950-1975, 1979.

৪. Stanley Kornow, Vietnam : A History, 1983.

একাদশ অধ্যায়

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন

What distinguishes the North-South from the East-West confrontation is not the identity of the principals, but the geographic space in which they meet and the object over which they confront each other.

Hans J. Morgenthau, 1977

বিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম, যা 'ন্যাম' নামে পরিচিত। এই ন্যাম আন্দোলন দুটি পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বলয়ের বাইরে থেকে বিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক রাজনীতিতে তাদের অবদান রেখে গেছে। ন্যাম এর সতেরতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে চলতিবছর ভেনিজুয়েলায়। তেহরানে ১৬তম ন্যাম সম্মেলনের (২০১২) পর যে প্রশ্নটি এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তা হচ্ছে, ন্যাম কি আদৌ উন্নয়শীল বিশ্বের স্বার্থরক্ষা করতে পারবে? তেহরানে এই শীর্ষ সম্মেলনটি (২০১২) অনুষ্ঠিত হয়েছিল এমন এক সময় যখন ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ইসরাইলি বিমান হামলার সম্ভাবনা দিনে দিনে বাড়ছিল। মার্কিন প্রশাসন যে ইসরাইলকে উসকানি দিয়েছিল এটা ছিল দিবালকের মতো স্পষ্ট। কিংবা বলা যেতে পারে পাকিস্তানে অব্যাহত পাইলটবিহীন দ্রোন বিমান হামলার কথা। ইরান তার জ্বালানি চাহিদা মেটাতে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চেয়েছিল। এটা তার অধিকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল চায় না ইরান একটি পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হোক। পাকিস্তানে কট্টরপন্থি তালেবানরা নিংসন্দেহে অন্যায় করছে ও সীমান্তবর্তী এলাকায় নিজস্ব প্রশাসন চালু করে ফেডারেল রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। কিন্তু একটি স্বাধীন দেশে মার্কিনী দ্রোন বিমান হামলা চালায় কীভাবে? কোনো আন্তর্জাতিক আইন কি এই হামলার অনুমতি দেয়? জাতিসংঘের সনদে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে একটা রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কি এই সনদ মানছে? লিবিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-মার্কিন বিমান যখন বোমাবর্ষণ করেছিল, তখনো সেদিন জাতিসংঘের

অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো। এমনকি কর্নেল গাদ্দাফিকে যখন হত্যা করা হলো, সেদিনও আন্তর্জাতিক আইন ছিল উপেক্ষিত। গাদ্দাফি যদি তার জনগণের উপর অত্যাচার করে থাকেন, তার বিচার করবে সে দেশের জনগণ। কিন্তু লিবিয়ার জ্বালানি সম্পদের প্রতি আগ্রহশীল শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো গাদ্দাফিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়নি। আজ সিরিয়ার পরিস্থিতিও ঠিক তেমনি। সিরিয়ার পরিস্থিতি লিবিয়া থেকে কোনো পার্থক্য নেই। প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর সিরিয়ার পতন মানেই ইরানের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলা। তেহরানের পতনটা তখন সহজ হয়ে যাবে মাত্র। লক্ষ করলে দেখা যাবে যেসব দেশ আজ আক্রান্ত হচ্ছে, তারা সবাই উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে। আজ যারাই ক্ষমতা থেকে উৎখাত হচ্ছেন, তাদের কারো সাথেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভালো ছিল না। অথবা বলা যেতে পারে, তারা মার্কিনী নীতির কঠোর সমালোচক ছিলেন। কোনো একটি ক্ষেত্রে ন্যাম তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারেনি। তেহরানে ন্যাম সম্মেলন হোক, এটাও যুক্তরাষ্ট্র চায়নি। এমনকি জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন এ সম্মেলনে যোগ দেবেন, এটাও চায়নি ওয়াশিংটন। বান কি মুন যোগ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও সকল বাধা উপেক্ষা করে ন্যাম সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় প্রকাশ্যে বক্তৃতায় ইরানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। এটাই সঠিক নীতি। বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতিতে জোট নিরপেক্ষতার উপর জোর দেয়। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে ১২০টি দেশ ন্যাম-এর সদস্য হলেও, খুব কমসংখ্যক দেশের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপ্রধান তথা সরকারপ্রধান পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব হয়েছিল। সম্ভবত ন্যামের ইতিহাসে এই প্রথমবার এত কমসংখ্যক সরকার তথা রাষ্ট্রপ্রধান যোগ দিয়েছিলেন। তবে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথাও উল্লেখ করা যায়। 'আরব বসন্ত'-এর নেতা মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুরসির যোগদান ছিল ১৯৭৯ সালের ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর কোনো মিসরীয় নেতার প্রথম ইরান সফর। ন্যামের সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বও চোখে পড়েছিল। সিরিয়ার সংকটের জন্য মুরসি দায়ী করেছিলেন সিরীয় নেতৃত্বকে, যে কারণে সিরিয়া মুরসির ভাষণ বয়কট করেছিল। সিরিয়ার সমস্যার সমাধানের জন্য মুরসি একটি আঞ্চলিক সম্মেলনের ডাক দিয়েছিলেন, যেখানে ইরানও থাকবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব সমর্থন করেনি। আর এখন মুরসিও ক্ষমতায় নেই। সেখানে ক্ষমতায় এসেছেন সিসি।

যারা ন্যাম-এর ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা রাখেন, তারা জানেন বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে একটা পর্যায়ে ন্যামকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখাপেক্ষী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এটা নিয়ে ন্যাম সদস্যদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়। অন্য কিছু রাষ্ট্র চেয়েছিল ন্যামকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি নিয়ে যেতে। শেষপর্যন্ত কোনো পক্ষই সফল হয়নি। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের অবর্তমানে ন্যামকে আবার যুক্তরাষ্ট্রের 'মিত্র' হিসেবে চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

ন্যাম-এর একটা বড় সমস্যা হচ্ছে, ন্যাম-এর নিজস্ব কোনো সচিবালয় নেই। নেই কোনো কর্মকর্তা। তিন বছর পর পর শীর্ষ সম্মেলন হয়, একটা ঘোষণা দেয়া হয় এবং এই তিন বছর সম্মেলন আয়োজনকারী দেশ সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। ন্যাম-এ ধনী দেশগুলো আছে। এই দেশগুলো তেল সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু গরিব দেশগুলোর

ব্যাপারে তাদের অবদান একরকম নেই বললেই চলে। আমরা দক্ষিণ এশিয়ার কথা বলতে পারি। পৃথিবীর দরিদ্রতম অঞ্চলগুলোর একটি হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া। ১৯৮১ সালে যেখানে এই অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৫৪৯ মিলিয়ন, সেখানে ২০০৫ সালে এ সংখ্যা বেড়েছে ৫৯৫ মিলিয়নে। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জনপ্রতি দৈনিক আয় মাত্র ১ ডলার ২৫ সেন্ট যা জাতিসংঘের মানদণ্ড অনুযায়ী চরমদরিদ্র। সেই সাথে এই অঞ্চলে ২৫০ মিলিয়ন (অর্থাৎ ২৫ কোটি) শিশু অপুষ্টির শিকার। ৩০ মিলিয়ন শিশু স্কুলে যায় না। তিন ভাগের ১ ভাগ মহিলা রক্তশূন্যতায় ভোগে। যদি শুধু ভারতের কথা বলি, ভারতে ২০০৪ সালে যেখানে ২৭.৫ ভাগ লোক দরিদ্র ছিল, ২০১০ সালে তা বেড়েছে ৩৭.০২ ভাগে। ৩০ বছরের মধ্যে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে, এটা যেমনি সত্য, ঠিক তেমনি এটাও সত্য জনগোষ্ঠির প্রায় ৫৬ ভাগের সেখানে কোনো টয়লেট নেই। ৩৯ ভাগ জনগোষ্ঠীর নেই কোনো রান্নাঘর। দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্রতা দূরীকরণে ন্যাম কোনো ভূমিকা রাখেনি। ভারত ন্যাম-এর অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯৬১ সালে অধুনালুপ্ত যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে যে ন্যাম-এর জন্ম, ওই সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের একজন ছিলেন জওহরলাল নেহেরু, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। আজ ৫৫ বছর পর ২০১৬ সালে ন্যাম যখন শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয় তখন বিশ্ব অনেক বদলে গেছে বটে। কিন্তু মূল স্পিরিট, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বিদেশি আগ্রাসন ইত্যাদি প্রশ্নে নিপীড়িত মানুষের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম থেমে নেই। নতুন চরিত্রে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ আবির্ভূত হয়েছে। বিদেশি আগ্রাসন আরো বেড়েছে। সুতরাং প্রাসঙ্গিকতা থাকবেই। তবে এই আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করতে হলে, নিজেদের মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্য কমাতে হবে। আগ্রাসনের প্রশ্নে সব রাষ্ট্রগুলোকে এক হতে হবে। আজ দারিদ্রতা দূরীকরণে ন্যাম-এর ধনী রাষ্ট্রগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। সেই সাথে ঋণ সমস্যার সমাধান, বাণিজ্য সম্পর্কিত সমস্যার একটা সমাধান, জনসংখ্যা রোধ, উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ, উন্নয়নশীল বিশ্ব ও উন্নতবিশ্বের মাঝে একটা অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে ন্যাম একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ন্যাম-এর প্রয়োজনীয়তা যেমনি ছিল, আজ 'দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধ' চলাকালীন সময়েও এর ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে সিরীয় সংকট, ইউক্রেনে এক ধরনের 'পক্সিওয়ার' দুটি বড় শক্তি, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যকার যুদ্ধকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। ইউক্রেন ও জর্জিয়ার উপর চাপ বাড়ছে ন্যাটোতে যোগ দেয়ার। ইতোমধ্যে সাবেক পূর্ব ইউরোপের সব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো (যারা একসময় ওয়ারর্শ জোটের সদস্য ছিল) ন্যাটোতে যোগ দিয়েছে। রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশ ইউক্রেন ও জর্জিয়া এখনো ন্যাটোতে যোগ দেয়নি। এরা যদি ন্যাটোতে যোগ দেয়, তাহলে তা রাশিয়ার 'ঘাড়ে নিশ্বাস, ফেলার সামিল হবে। রাশিয়া তা কখনোই চাইবে না। অন্যদিকে সিরিয়ায় আসাদকে ক্ষমতায় রাখতে চায় রাশিয়া। যুক্তরাষ্ট্র তা চায় না। ফলে দ্বন্দ্ব বাড়ছে। অনেকে এই যুদ্ধকে 'দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধ' বা স্নায়ুযুদ্ধ-২ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এমনি এক পরিস্থিতিতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বাড়বেই।

উৎপত্তি ও বিকাশ

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ভারত-চীন সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য পাঁচটি নীতি গৃহীত হয়েছিল। এই পাঁচটি নীতি 'পঞ্চশীলা' নামে পরিচিত। 'পঞ্চশীলা' নীতি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পথকে আরোও ত্বরান্বিত করেছিল। এই পাঁচটি নীতি হলো ১। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান; ২। ভূখণ্ডজাত অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা; ৩। অনাগ্রাসন; ৪। অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা; ৫। সমতা ও পারস্পরিক সুবিধা। এই 'পঞ্চশীল' নীতির ওপর ভিত্তি করেই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। তবে বান্দুং সম্মেলন ও কায়রো সম্মেলনে জোট গঠনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা এবং নেতা ছিলেন ভারতের পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ন, মিশরের নাসের এবং ঘানার নক্রমা।

বান্দুং সম্মেলন

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত বান্দুং সম্মেলন। ১৮ থেকে ২৬ এপ্রিল ওই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং আফ্রো-এশিয়ার বেশ কটি দেশ এতে অংশ নিয়েছিল। সম্মেলনে ১০টি নীতি গৃহীত হয়। এগুলো হচ্ছে ১. মৌলিক মানবাধিকার এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন; ২. সকল জাতির সার্বভৌমত্ব এবং ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপন; ৩. সকল বর্ণ ও জাতির সমানাধিকারের স্বীকৃতি; ৪. অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা; ৫. জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী একক বা যৌথভাবে সকল জাতির আত্মরক্ষার অধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন; ৬. যৌথভাবে কোনো বৃহৎশক্তির স্বার্থরক্ষা করা এবং এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশের উপর চাপ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকা; ৭. কোনো দেশের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা অথবা রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকা; ৮. শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসা; ৯. পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতা এবং ১০. ন্যায়-নীতি ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

পরবর্তীকালে বান্দুং সম্মেলনের রেশ ধরে কায়রোতে আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কায়রো সম্মেলন

কায়রো সম্মেলনে ৫টি নীতি গৃহীত হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে ১. সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহাবস্থান এবং জোট নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে স্বাধীন নীতি অনুসরণ; ২. নিরবচ্ছিন্নভাবে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দান; ৩. বৃহৎশক্তি নিয়ন্ত্রিত বহুপাক্ষিক সামরিক জোটের সদস্য না হওয়া; ৪. আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা চুক্তির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন; ৫. সামরিক ঘাঁটি স্থাপনা যেন বৃহৎশক্তির বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা।

এভাবেই অনেক আলাপ-আলোচনা, বিচার-বিবেচনা, নীতি নির্ধারণের পর এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক পরিবেশে দুই বৃহৎশক্তির কাছ থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে নিজস্ব একটি

সংগঠন গড়ে তোলে। ১৯৬১ সালের ১ সেপ্টেম্বর বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলন এবং সেই সাথে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনভুক্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে অনেক অভিন্ন সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যাগুলো মূলত এ সমস্ত দেশের অভিন্ন ঔপনিবেশিক অতীত দ্বারা সৃষ্ট। সমস্যা-গুলোর সমাধানের মূলকথা হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি ত্বরান্বিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক আসরে স্বাধীন ও সম্মানজনক অবস্থান গ্রহণ, যা শুধু ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব। যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ তাদের অভিন্ন পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে একটি আলাদা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সত্তা ও গোষ্ঠীতে একত্র হয়েছে, তা হচ্ছে : (ক) নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পূর্ণকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশে অধিকার সমুন্নত রাখা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চাপমুক্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা; (খ) আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সমতা, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের পূনর্গঠন ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রায়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম; (গ) উন্নতবিশ্বের সাথে পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার ভিত্তিতে ব্যাপক সংযোগ সৃষ্টি করা এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহে নিজেদেরকে সক্রিয় রাখার মাধ্যমে বিশ্বে নিজেদের একটা ইতিবাচক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা; (ঘ) বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যৌথ কূটনৈতিক তৎপরতা চালু রাখা।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠন নয়। এটা চুক্তিভিত্তিক কোনো আলাদা জোটও নয়। এর কোনো সনদ বা গঠনতন্ত্র নেই, নেই কোনো স্থায়ীদপ্তর। কিন্তু এ সত্ত্বেও এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের জন্য গড়ে উঠেছে একটি সুনির্দিষ্ট অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। এটি হচ্ছে, ১. রাষ্ট্র অথবা সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন; ২. সমন্বয়কারী রাষ্ট্র আন্দোলনের চেয়ারম্যান; ৩. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন; ৪. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভা; ৫. জাতিসংঘে জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের গ্রুপ; ৬. সমন্বয় ব্যুরো (পররাষ্ট্র মন্ত্রী বা জাতিসংঘে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের স্থায়ী প্রতিনিধি) এবং ৭. বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ।

সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনের প্রধান কাজ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা। সেই সাথে জোট নিরপেক্ষতার নীতির মূল কৌশলগত ধারাসমূহের দিকনির্দেশ করা এবং জাতিসংঘে বিভিন্ন প্রশ্নে একটা যৌথ অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে মতৈক্য সৃষ্টি করা ও শীর্ষ সম্মেলন আন্দোলনের কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়ন করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণ করা। তিন বছরে একবার সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে। নিয়মিত সম্মেলন ছাড়া সীমিতসংখ্যক অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রের সমন্বয়ে বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

যে দেশে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই দেশ পরবর্তী তিন বছরের জন্য সমন্বয়কারী দেশ হিসেবে পরিচিত হয়। সে দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান ওই সময়ের জন্যে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সমন্বয়কারী দেশ ও আন্দোলনের চেয়ারম্যান দুই শীর্ষ সম্মেলনের অন্তবর্তীকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে। আন্দোলনের কার্যক্রম চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সমন্বয়কারী রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। চেয়ারম্যান আন্দোলনের প্রধান মুখপাত্র। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিশ্লেষণে এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকরণে চেয়ারম্যান জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।

শীর্ষ সম্মেলনের ১৮ মাস আগে ও ১৮ মাস পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিন বছরের কম সময়ের ব্যবধানে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয় বলে শীর্ষ সম্মেলনের অনেক কাজ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনই সম্পাদন করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ সব সময়ই পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলনে অনুমোদন লাভ করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে পূর্ববর্তী শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করে, পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলনের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করে এবং শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। এ ছাড়া প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সদরদপ্তরে সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের সময় জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে সভাসমূহের লক্ষ্য সীমিত। এখানে মূলত সাধারণ পরিষদের আলোচ্যসূচির উপর আলোচনা হয় এবং পরিষদে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। শীর্ষ সম্মেলন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনসমূহের মধ্যবর্তী সময়ে স্থায়ী অঙ্গ হিসেবে জাতিসংঘে জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের গ্রুপ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের কূটনীতিতে যৌথ বা গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষাকারী ও চাপ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রগ্রুপ, যেমন, গ্রুপ-৭৭, ইসলামি গ্রুপ, আরব গ্রুপ, আফ্রিকান গ্রুপ, ল্যাতিন আমেরিকান গ্রুপ, সমাজতান্ত্রিক গ্রুপ ইত্যাদি সক্রিয় রয়েছে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের মধ্যে সবচাইতে কার্যকর ও সুসংগঠিত হচ্ছে সমন্বয় ব্যুরো। এর সভাসমূহ ঘন ঘন অনুষ্ঠিত হয়। এর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যাবলি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে একে একটি মূলযোগসূত্রে পরিণত করেছে। সমন্বয় ব্যুরো জোট নিরপেক্ষ দেশের শীর্ষ সম্মেলনসমূহের মধ্যবর্তী সময়ে শীর্ষ সম্মেলন, মন্ত্রী সম্মেলন, জাতিসংঘে জোট নিরপেক্ষ গ্রুপের সভা ও অন্যান্য কোনো নিরপেক্ষ গ্রুপের সভা এবং সমাবেশে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের যৌথ উদ্যোগ ও কার্যক্রম ত্বরান্বিত করে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য এডহক কমিটি, ওয়ার্কিং গ্রুপ, সংযোগ গ্রুপ ইত্যাদি গঠনের প্রথা চালু রয়েছে। জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের মধ্যে তথ্য ও গণমাধ্যমের উপর সহযোগিতার ভিত্তিতে একটা

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। ১৯৭৬ সালে কলম্বো সম্মেলনে গঠিত হয় আন্তঃসরকারি তথ্য সমন্বয় পরিষদ। জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের মধ্যে একটি সাধারণ সংযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন সংবাদ সরবরাহ ও প্রচারের নীতিমালা প্রণয়ন করা এই পরিষদের কাজ।

'ন্যাম'-এর শীর্ষ সম্মেলন ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১৯৬২ সালে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যে সংগঠনটির যাত্রা শুরু, সেই সংগঠনটি বিংশ শতাব্দীতেই আরো এগারটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিল। একুশ শতকের শুরুতেও এই ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। নিচে প্রতিটি সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

বেলগ্রেড শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৬১

১৯৬১ সালের ১ সেপ্টেম্বর আধুনালুপ্ত যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে প্রথম জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫টি দেশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। প্রথম সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী ঠাণ্ডা লড়াই অবসানের লক্ষ্যে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় পক্ষকেই অস্ত্র সংবরণের জন্য শান্তিপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজনীতার কথা বলা হয়েছিল। রুশ-মার্কিন সমঝোতা বিশ্বশান্তির পক্ষে কতটা জরুরি ২৫টি জোট নিরপেক্ষ দেশই তা উল্লেখ করে। শুধু প্রস্তাব গ্রহণই নয় সম্মেলনের প্রস্ত াবসহ ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মস্কো গিয়েছিলেন। এছাড়া উপনিবেশিকার বিরুদ্ধে প্রথম সম্মেলনে ধিক্কার জানানো হয়েছিল।

কায়রো সম্মেলন, ১৯৬৪

১৯৬৪ সালে মিশরের রাজধানী কায়রোতে দ্বিতীয় জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন বসে। মোট ৪৭টি দেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে শরিক হয়েছিল। কংগোর সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোসে সোম্বে কায়রো শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এ নিয়ে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর মধ্যে বিস্তর বাক-বিতণ্ডা হয়। বেশ কিছু সদস্য রাষ্ট্রের প্রবল বিরোধিতার জন্য শেষপর্যন্ত তিনি শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে পারেননি। এই নিয়ে কায়রো সম্মেলনের পরিবেশ কলুষিত হয়ে পড়েছিল।

লুসাকা শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৭০

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লুসাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল তৃতীয় জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন। লুসাকা সম্মেলনে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ আরো সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার মোকাবেলা করার শপথ নিয়েছিলেন। সম্মেলনে বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কড়াব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। লুসাকা সম্মেলনে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকার পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নেয়। কম্পুচিয়ার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে, কম্পুচিয়ার আসন ফাঁকা রাখা হয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কম্পুচিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইন প্রশ্নে আরব-ইসরাইল দ্বন্দ্বে আরবদের সমর্থন করে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো অন্যায়ভাবে

আরব ভূখণ্ড দখল করে রাখার জন্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল ওই সম্মেলনে। লুসাকা সম্মেলনে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। উন্নতদেশগুলোর অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই তৃতীয় সম্মেলনে গুরুত্ব পায়। তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলো যাতে ধনী দেশগুলোকে সব সময় চাপের মধ্যে রাখতে পারে, সে ধরনের একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছিল।

আলজেরিয়া শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৭৩

চতুর্থ জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলজেরিয়াতে। মোট ৭৬টি দেশ ওই সম্মেলনে যোগদান করে এবং ৯টি দেশের প্রতিনিধিরা পর্যবেক্ষকের আসন গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আলজেরিয়া সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল।

কলম্বো শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৭৬

১৯৭৬ সালে কলম্বোতে পঞ্চম জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রুমানিয়া ও ফিলিপাইন পঞ্চম সম্মেলনে অতিথি দেশ হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিল। পূর্ববর্তী সম্মেলনগুলোর মতোই ওই সম্মেলনেও বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের সপক্ষে জোরালো সমর্থন জানানো হয়।

হাভানা শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৭৯

জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হাভানায় ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ন্যাম ঘোষণাপত্রে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন যেহেতু একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং বলপ্রয়োগ না করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ অনুসন্ধান করতে চেয়েছে, কাজেই সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে সেই চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছিল। সম্মেলনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি, স্বাস্থ্য, খাদ্যের মতো অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়। তৃতীয় বিশ্বকে উন্নত দেশগুলোর কাছে তুলে ধরার প্রস্তাব দেয়া এবং সেই সঙ্গে উত্তর-দক্ষিণ সহযোগিতার (North-South Co-operation) ওপর জোর দেয়া হয়। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ও মিসর–ইসরাইল শান্তি চুক্তির নিন্দা করেছিলেন।

নয়াদিল্লি সম্মেলন, ১৯৮৩

১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে সপ্তম জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ন্যাম-এর সভানেত্রী নিযুক্ত হন। ওই সম্মেলনে ৯৬টি দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও বিশেষ দূত প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেছিলেন। সপ্তম সম্মেলনের সুরও ছিল আগের দুই সম্মেলনের মতোই একই তালে বাঁধা। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দুই বৃহৎশক্তিধর দেশের কাছে আবেদন জানানো হয়। ওই সময় ইরাক-ইরান যুদ্ধ মধ্য প্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়াকে গভীর সংকটের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। ন্যাম গোষ্ঠী যুদ্ধ বন্ধ

করে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার পথ প্রশস্ত করার আবেদন করেছিল দুটি দেশের কাছেই। ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ ঘটেছে, তার বিরুদ্ধে 'ন্যাম' ঘোষণাপত্রে পশ্চিমাশক্তিকে সেইসব দেশগুলো থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছিল। অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং সামরিক জোট গঠনের বিরুদ্ধেই দিল্লি সম্মেলনে আবেদন জানানো হয়েছিল। শিল্পোন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদনে যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বরাবরের মতো পিছিয়ে, ওই সম্মেলনে তা আরও একবার মনে করিয়ে দেয়া হয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আরও আন্তর্জাতিক মূলধন বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ন্যামের চেয়ারপারসন ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু হলে রাজীব গান্ধী ইন্দিরার আসন গ্রহণ করে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে সক্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন।

হারারে শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৮৬

আফ্রিকার দেশ জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর অষ্টম শীর্ষ সম্মেলন। রাজধানী হারারেতে ১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে ১০১টি দেশ যোগদান করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ এবং পশ্চিমাশক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে আলাপ-আলোচনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। বর্ণবিদ্বেষ, নিরস্ত্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছিল হারারে শীর্ষ সম্মেলনে। নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চেয়ারপার্সন রবার্ট মুগাবের ভাষণ বিশেষভাবে তাৎপর্য বহন করেছিল। তিনি বলেছিলেন– বর্তমান বিশ্বে প্রতি মিনিটে অস্ত্রের জন্য দুশ কোটি ডলার খরচ হয়। মোট হিসেব ধরলে, সারা বছরে যে অর্থ ব্যয় হয় তা দিয়ে এই শতকের মতো বিশ্বকে ক্ষুধার হাত থেকে মুক্ত করা যাবে।

সম্মেলনে বর্ণবিদ্বেষের হাত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে রক্ষা করার জন্য প্রয়াস চালানোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আফ্রিকা তহবিল (African Fund) খোলার সিদ্ধান্ত ছিল অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নামিবিয়ার স্বাধীনতার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অধিবেশন ডাকার আহ্বান জানানো হয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর হারারে শীর্ষ সম্মেলনে জোর দেয়া হয়। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ঋণের চাপে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভবিষ্যৎ যে বিপন্ন হয়ে উঠেছে, সম্মেলনের ১০টি দেশই তা উল্লেখ করে। সম্মেলন থেকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে খোলা চিঠি পাঠিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।

বেলগ্রেড শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৮৯

জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর নবম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে, ১৯৮৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মোট ১০২টি জোট নিরপেক্ষ দেশ ওই সম্মেলনে যোগদান করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীব্যাপী যে রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটেছিল তার পরিবর্তনের ইঙ্গিত আশির দশকের

শেষ দিক থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শরিক দেশগুলো এই লক্ষণীয় পরিবর্তনে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিল, 'পৃথিবীর দুই বৃহৎশক্তিধর দেশের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ হ্রাস পেলে বিশ্বশান্তির গতি ত্বরান্বিত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও পূর্ব ইউরোপ থেকে সমাজতন্ত্রের পাততাড়ি গোটানোর কাজ শুরু করে দিলে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পথ পাকাপাকিভাবে প্রশস্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নবম শীর্ষ সম্মেলনের ন্যাম গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ঋণের জালে জড়িয়ে পড়া দরিদ্র দেশগুলোর নড়বড়ে অর্থনীতির উপর সামগ্রিক মূল্যায়নের গুরুত্বারোপ করেছিল। বৈদেশিক ঋণের ফাঁস থেকে গরিব দেশগুলোকে টেনে তোলার জন্য ১০২টি জোট নিরপেক্ষ দেশই পশ্চিমের ধনী দেশগুলোর উদ্দেশে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছিল। পরিবর্তিত বিশ্বরাজনীতিতে তাদের আন্দোলনকে আরও বেশিমাত্রায় আধুনিকীকরণ জরুরি বলে তারা মন্তব্য করেছিল। তারা আরও বলেছিল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, আর এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে হলে 'ন্যাম' গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বগুলো মিটিয়ে ফেলা।

বিশ্বের পরিবেশের ভয়াবহ দূষণ নিয়েও নবম ন্যাম সম্মেলন অস্বস্তি প্রকাশ করে। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পৃথিবীকে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে 'গ্রহরক্ষা তহবিল' গঠনের প্রস্তাব ওই সম্মেলনে যথেষ্ট আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।

জাকার্তা শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৯২

জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর দশম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়, ১৯৯২ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সেই সময়ে ন্যামের সদস্য ছিল ১০৯টি দেশ। পরিবর্তিত বিশ্বরাজনীতিতে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর ভূমিকা কী হবে, তাদের কার্যকারিতা, দায়িত্ব সচেতনতা দিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল দশম শীর্ষ সম্মেলনে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি এবং ঠাণ্ডা লড়াই পরবর্তী বিশ্বে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর বিশ্বরাজনীতিতে ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের স্পষ্ট ইংগিত ওই সম্মেলনে লক্ষ করা যায়। যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর মধ্যে মতবিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল।

যুগোশ্লাভিয়ার গৃহযুদ্ধ নিয়ে দশম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বসনিয়া হারজেগোভিনাতে স্থানীয় সার্বদের আচরণকে ঘৃণা করা হয়। কিন্তু সদস্য রাষ্ট্রের বিদেশ মন্ত্রীরা যুগোশ্লাভিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। ইসলামিক সদস্য রাষ্ট্রগুলো বসনিয়ায় মুসলমানদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। যুগোশ্লাভিয়ার গৃহযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়েও মিসর, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আলোচনার দাবি জানায় এবং পশ্চিমাশক্তির কাছে জাতিসংঘ নিজেকে সঁপে দিয়েছে বলে সদস্য রাষ্ট্রগুলো অভিযোগ করে। সম্মেলনে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয় দশম

শীর্ষ সম্মেলনে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ৭৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ এবং পরিকল্পনা নেয়ার ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রশ্নে সমবেতভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর নতুন বিশ্বপরিস্থিতিতে জাতিসংঘের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ দশম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মূলত, এই একটি ক্ষেত্রেই জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো একত্রে সরব হয়। নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো অবলুপ্তির কথা বলে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো। ইরান ও লিবিয়াই প্রথম পরিবর্তনের কথা তোলে। পরে অন্য দেশগুলো তা সমর্থন করে। ইরানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আলি আকবর রাফসানজানি কড়াভাষায় জাতিসংঘের কার্যকলাপের নিন্দা করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় নিন্দা করেন। তিনি নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচটি দেশের কার্যকলাপের পুনর্মূল্যায়নের দাবি তোলেন। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বুট্রোস ঘালি অবশ্য ন্যামের এই সিদ্ধান্তকে সরাসরি নাকচ না করে দিয়ে বলেন, এই পরিবর্তন আনতে গেলে পাঁচ সদস্য রাষ্ট্রেরই অনুমোদন জরুরি। সারা বিশ্বে ক্রমবর্ধমান হারে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় অসন্তোষ ব্যক্ত করে ১০৯টি সদস্য দেশ। পরমাণু অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী ও বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে আরও জোরদার আন্দোলনের কথা বলে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো। দশম শীর্ষ সম্মেলনে ভারত ন্যাম গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল, অসামরিক সাহায্যকারী বাহিনী গঠনের। বিপদে-আপদে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো এই অসামরিক সাহায্যকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপ দাবি করতে পারে। দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সমাধানে ন্যাম প্লাটফর্মকে ব্যবহার না করার লক্ষ্যেই জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো মত প্রকাশ করে। সম্মেলনে সহমতের ভিত্তিতে বসনিয়া, সোমালিয়া, উপসাগরীয় যুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেবার আহ্বান জানানো হয়। জাকার্তা সম্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো চীনের পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করা। এই প্রথম চীন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে পা রাখল।

কাটাগোনা শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৯৫

১৯৯৫ সালের ১৮-২০ অক্টোবর কলম্বিয়ার কাটাগোনায় অনুষ্ঠিত হয় একাদশ জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন। ওই সম্মেলনে জোটভুক্ত ১১৩টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ওই সম্মেলন শেষে বৈঠকের চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে বলা হয় বিশ্বে ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে নয়াদিগন্ত উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। বিশ্বঅর্থনীতিতে সঞ্চার হয়েছে নয়াগতি। তবে শ্রদ্ধা, ন্যায়পরায়ণতা ও সমতাভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি কিছুসংখ্যক দেশে দ্রুত সম্পদ বাড়ছে। এতে তারা হয়ে উঠেছে প্রাচুর্যের অধিকারী। এতৎসত্ত্বেও ন্যামভুক্ত অনেক দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব দেশে ৫০ কোটির বেশি লোক বুভুক্ষু রয়েছে। অনাহারে অনেকেরই মৃত্যু ঘটছে। জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব অব্যাহত থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ঘোষণাপত্রে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ম্যানডেট বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ন্যাম সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা

নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গুটিকয়েক দেশের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ক্রমবর্ধমান প্রবণতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে জাতিসংঘ সনদের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত। তবে এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বিশ্বে শান্তি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সহযোগিতা ও পূর্ণ অংশীদারত্বের ব্যাপারে জোটকে আরো কাজ করে যেতে হবে বলে ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়। ন্যামের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা বলেন, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র্য ও সামাজিক অন্যায় থেকে উদ্ভূত সমস্যা ব্যাপকভাবে গ্রাস করেছে। তারা জোর দিয়ে বলেন যে, তাদের দেশে মুক্তঅর্থনীতি চালু করতে ব্যাপক সামাজিক খেসারত দিতে হচ্ছে। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দরিদ্র লোকদের রক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি জোরদার করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে তাঁরা মনে করেন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে নয়া আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। তাঁরা জাতিসংঘে ন্যামের ভূমিকাকে জোরদারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা জাতিসংঘের সনদের উদ্দেশ্য ও নীতিমালার অঙ্গিকার মেনে চলার ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন জাতিসংঘের গণতন্ত্রায়নের ওপর। তাঁরা নিরাপত্তা পরিষদে পূর্ণ গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন। নেতৃবৃন্দ নিরাপত্তা পরিষদে আফ্রিকা, এশিয়া, ও ল্যাতিন আমেরিকার প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কাজ করে যাবার জন্য আহ্বান জানান। ন্যাম নেতৃবৃন্দ বলেন, নিরস্ত্রীকরণ, অস্ত্র সীমিতকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্বে নয়াদিগন্ত উন্মোচন করেছে। এতে পূর্ব-পশ্চিম সংঘাত প্রশমিত হয়েছে। তাঁরা বলেন ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পরমাণু অস্ত্র তৈরি এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা বজায় রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এখন মারণাস্ত্রের মজুদ ধ্বংসের সময় এসেছে। তাঁরা পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা জানান।

কাটাগোনা শীর্ষ সম্মেলনের দুবছর পর ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর দ্বাদশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ছিল সবদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। দুইদিন ব্যাপী (৭-৮ এপ্রিল '৯৭) সম্মেলনে ৭৫টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একজোট হয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নয়াদিল্লির 'ন্যাম' পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত ২৭৭ পৃষ্ঠার ঘোষণাপত্রে নিরাপত্তা পরিষদের আংশিক সম্প্রসারণের বিরোধিতা করা হয়। একই সঙ্গে পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্রের 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতার অবলুপ্তির আহ্বান জানানো হয়। পূর্ব জেরুজালেমে ইহুদি বসতি স্থাপনের বিরোধিতা করে এ সম্পর্কে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বিশেষ অধিবেশন ডেকে ইসরাইল কর্তৃক বসতি স্থাপন বন্ধ রাখার দাবি জানানো হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশ্ব থেকে পরমাণু অস্ত্র নির্মূল করার ওপরে ঘোষণাপত্রে গুরুত্ব দিয়ে একটি এডহক কমিটি গঠনের কথা বলা হয়।

'ন্যামের' পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা তাদের দিল্লি ঘোষণাপত্রে আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাংকের সংস্কারের পক্ষে জোরদার যুক্তি দেখান। এছাড়াও শ্রমমান ও মেধাস্বত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উন্নতদেশগুলোর চাপিয়ে দেয়া নীতির সমালোচনা করা হয় ঘোষণাপত্রে। আন্তর্জাতিক

সন্ত্রাস দমনে ন্যাম-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গিকার করেন। সদস্য রাষ্ট্রগুলো কেউই একে অন্যের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের উস্কানি দেবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিশ্ব জুড়ে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গৃহযুদ্ধের অবসানে ন্যামের সদস্য দেশগুলো নতুন করে উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সোমালিয়া, বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা, আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা সর্বত্রই তৃতীয় পক্ষের সরাসরি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করা হয়। ড্রাগ, চোরাচালান, শিশু, নারীদের দিয়ে অবৈধ কার্যকলাপে বাধ্য করানোর বিরুদ্ধে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ কাজ করার কথা বলা হয় ন্যাম ঘোষণা পত্রে।

ডারবান দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৯৮

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত হয় ১১৪টি দেশের জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলন। দুদিনের (২-৩ সেপ্টেম্বর'৯৮) ওই শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণ পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। দ্বাদশ সম্মেলনে ন্যামের তৎকালীন চেয়ারম্যান দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন, বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে এগুচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের এই সংগঠনটিকে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

ডারবান শীর্ষ সম্মেলনের চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে বিশ্বের সমস্ত দেশকেই একসূত্রে বেঁধে ফেলার কথা বলা হয়েছিল। নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত সম্মেলন অবিলম্বে ডাক দেওয়ার কথা বলা হয় চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে। পারমাণবিক প্রশ্নে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর উপর এক তরফাভাবে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়ার বৈষম্যমূলক নীতি মেনে নেয়া হবে না বলেও এতে উল্লেখ করা হয়। ঘোষণাপত্রে বলা হয়, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস করে ফেলতে হবে এবং ১৯৯৯ সালের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে গৃহীত হয়। একই সাথে পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন ও তার ব্যবহার, এমনকি পরমাণু অস্ত্র দিয়ে ভীতি প্রদর্শন, পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা, প্রযুক্তি রপ্তানি, ব্যবহার সব কিছুই নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আরো সংগঠিতভাবে কাজ করার অঙ্গিকার করা হয় ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে এবং নিরাপত্তা পরিষদে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর স্থায়ী সদস্যপদ লাভের চেষ্টাকে সমর্থন জানানো হয়। উল্লেখ্য, বিংশ শতাব্দীতে ডারবান সম্মেলনই ছিল ন্যামের সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলন। একুশ শতকের শুরুতে ইতোমধ্যে ন্যামের দুদুটো শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রথমটি কুয়ালালামপুরে ২০০৩ সালে ও পরেরটি কিউবায় ২০০৬ সালে। ১২৬টি রাষ্ট্রের সরকার তথা রাষ্ট্রপ্রধানরা ২০০৩ সালের ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ১৩তম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন।

ত্রয়োদশ ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বের বিরোধপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। তারা ইরাক ও উত্তর কোরিয়ার সমস্যা সম্পর্কেও আলোচনা করেন এবং জাতিসংঘের

নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত ইরাকে আক্রমণ করার বিরোধিতা করেন। ন্যাম নেতৃবৃন্দ বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর প্রান্তিক অবস্থানের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা ধনী ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মাথাপিছু আয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল ব্যবধানের ব্যাপারেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ত্রয়োদশ ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে ন্যাম নেতৃবৃন্দ উন্নয়ন সহায়ক, বৈষম্যহীন, ভারসাম্যমূলক একটি বাণিজ্যিক সংস্থা চালু করার জন্য সুপারিশ করেন। তাঁরা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ঘোষণার পূর্ণ বাস্তবায়নেরও দাবি করেন এবং আংকটাডের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ন্যাম নেতৃবৃন্দ আগামী প্রজন্মের জন্য এবং বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য খাদ্যের নিরাপত্তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা ১৯৯৬ সালে বিশ্বখাদ্য সম্মেলনে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের দাবি জানান। ন্যাম নেতৃবৃন্দ ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বিশাল ব্যবধান তার উপর দৃঢ় মতবাদ ব্যক্ত করেন। ন্যাম নেতৃবৃন্দ দক্ষিণ সহযোগিতার উপরও গুরুত্বারোপ করেন। ন্যাম নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা নারী নির্যাতন রোধ ও নারীর ক্ষমতায়নের উপর জোর দেন। ন্যাম নেতৃবৃন্দ বিশ্বমানবাধিকার পরিস্থিতির বিস্তারিত তুলে ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ন্যাম নেতৃবৃন্দ ১৯৯০ সালে বিশ্বশিশু সম্মেলনে গৃহীত শিশুঅধিকার সনদের পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবি জানান। তাঁরা শিশুশ্রম বন্ধেরও দাবি করেন।

ন্যামের উদ্যোক্তা দেশগুলো (১৯৬১)

আলজেরিয়া, গণতান্ত্রিক কঙ্গো, মিসর, ইথিওপিয়া, ঘানা, গিয়েনা, মালি, মরক্কো, সোমালিয়া, সুদান, তিউনেশিয়া, কিউবা, আফগানিস্তান, কম্বোডিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, লেবানন, মিয়ানমার, নেপাল, সৌদি আরব, শ্রীলংকা।

ন্যামের সাবেক রাষ্ট্রগুলো

আর্জেন্টিনা (১৯৭৩-১৯৯১), সাইপ্রাস (১৯৬১-২০০৪), মাল্টা (১৯৭৩-২০০৪), যুগোস্লাভিয়া (১৯৬১-১৯৯২), ভানুতু (১৯৮৩), ইউক্রেন (২০১০-২০১৪)।

ন্যাম-এর পর্যবেক্ষক দেশ ও সংস্থা

আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, বসনিয়া-হারজেগোভিনা, ব্রাজিল, চীন, কোস্টারিকা, এল-সালভাদর, কাজাকিস্তান, কির্ঘিস্তান, মেক্সিকো, মন্টেনেগরো, প্যারাগুয়ে, সার্বিয়া, তাজিকিস্তান, উরুগুয়ে, আফ্রিকান ইউনিয়ন, আফ্রো-এশিয়ান পিপলস সলিডারিটি-অর্গানাইজেশন, আরব লীগ, কমনওয়েলথ, ওআইসি, সাউথ সেন্টার, জাতিসংঘ, ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল।

একনজরে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলন

	তারিখ	উদ্যোক্তা দেশ	স্থান
১ম	১-৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬১	যুগোশ্লাভিয়া	বেলগ্রেড
২য়	৫-১০ অক্টোবর ১৯৬৪	ইউএ আর	কায়রো
৩য়	৮-১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭০	জাম্বিয়া	লুসাকো
৪র্থ	৫-৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	আলজেরিয়া	আলজিয়ার্স
৫ম	১৬-১৯ আগস্ট ১৯৭৬	শ্রীলংকা	কলম্বো
৬ষ্ঠ	৩-৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯	কিউবা	হাভানা
৭ম	৭-১২ মার্চ ১৯৮৩	ভারত	নতুন দিল্লি
৮ম	১-৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬	জিম্বাবুয়ে	হারারে
৯ম	৪-৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯	যুগোশ্লাভিয়া	বেলগ্রেড
১০ম	১-৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯২	ইন্দোনেশিয়া	জাকার্তা
১১	১৮-২০ অক্টোবর ১৯৯৫	কলম্বিয়া	কার্তাজেনা
১২	২-৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮	দক্ষিণ আফ্রিকা	ডারবান
১৩	২০-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩	মালয়েশিয়া	কুয়ালালামপুর
১৪	১৫-১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬	কিউবা	হাভানা
১৫	১১-১৬ জুলাই ২০০৯	মিসর	শার্ম এল শেখ
১৬	২৬-৩১ আগস্ট ২০১২	ইরান	তেহরান
১৭	২০১৬	ভেনিজুয়েলা	

ন্যাম-এর সীমাবদ্ধতা

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক মহল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বর্তমান ভূমিকা ও এর তাৎপর্য নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন। প্রথমত, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাত্যহিক কার্যকারিতা এতই সামান্য যে গোষ্ঠীর সম্মেলন বা শীর্ষ সম্মেলন ছাড়া বোঝার উপায় নেই, ন্যাম কোনো আন্দোলন বা একটি গোষ্ঠীর নাম। দ্বিতীয়ত, যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সেই উদ্দেশ্য তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে। তৃতীয়ত, ন্যাম তার আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিমা শক্তিকে সামান্যতমও বদল করতে পারেনি। বরং আবেদন নিবেদনের ভরা বুলি কখনও কখনও হাস্যকর ঠেকেছে। চতুর্থত 'পঞ্চশীল' নীতিতে বিশ্বাসী দেশগুলো যখন সাম্য-মৈত্রী, সৌভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে পরস্পর সমঝোতার ভিত্তিতে নতুন আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো গঠনের কথা বলে, তখন সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিদ্বেষ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মাথা হেট করে দেয়। ইরাক-ইরান যুদ্ধ, যুগোশ্লাভিয়ার গৃহযুদ্ধ, পাক-ভারত দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব, আন্দোলনের ভিতই নড়বড়ে করে দিয়েছে। পঞ্চমত, জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো একদিকে যেমন নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে সাফাই গেয়েছে, অন্যদিকে একাধিক দেশ পর্যাপ্ত অস্ত্র সংগ্রহ করে নিজেদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মজবুত করছে। ষষ্ঠত, ন্যাম গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর নিজেদের মধ্যেও আন্দোলনকে চাঙা করার উৎসাহ হ্রাস পেয়েছে। সপ্তমত, পরিবর্তিত বিশ্বরাজনীতিতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন কার্যত স্ববিরোধী দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। আক্ষরিক অর্থেই জোট নিরপেক্ষ বলে কোনো শব্দ

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অচল হয়ে পড়েছে। পারস্পরিক স্বার্থে অধিকাংশ রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কোথাও কোথাও সামরিক জোট গড়ে তুলছে।

উপসংহার

ত্রয়োদশ ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে ১১৬টি দেশের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ন্যাম হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি বড় প্লাটফর্ম। ১৯৬১ সালে মাত্র ২৫টি দেশ নিয়ে ন্যাম-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ তা প্রায় পাঁচগুণ বেড়েছে। ১৯৬৯ সালে ৭৫০ মিলিয়ন লোক ন্যাম-এর প্রতিনিধিত্ব করতেন। আজ প্রতিনিধিত্ব করেন ২০০০ মিলিয়ন লোক অর্থাৎ ২০০ কোটি লোক, যা পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেকের কিছু কম। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, পরস্পর বিরোধী সামরিক জোটের কূটনীতির অবাঞ্ছিত প্রভাব এড়িয়ে নিরপেক্ষভাবে ন্যামের যে চলা, তাই শুধু একমাত্র লক্ষ্য নয়। উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে সর্বক্ষেত্রে বিশাল ব্যবধান কমিয়ে আনাও ন্যামের লক্ষ্য। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ স্বনির্ভরতা অর্জন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু আজো এই সফলতা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়নি। তাই ন্যাম এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য টিকে থাকতে হবে। ন্যাম উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে ন্যাম-এর পক্ষ থেকে সাউথ কমিশন গঠন করা হয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন। কিন্তু এখনো যৌক্তিক কোনো ব্যবস্থা তৈরি হয়নি। সমাজতন্ত্র পতনের পর বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্রের জয়জয়কার কথা বলা হচ্ছে, অথচ শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের ক্ষেত্রে ন্যাম-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। ন্যাম সদস্য রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে জাতিসংঘের সহায়তায় একযোগে সন্ত্রাসবাদকে মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে আসতে পারে। ন্যাম-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘকে আরও কার্যকর করতে এবং সংস্কার সাধন করতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. Robert A Mortimer, The Third World Cooperation in International Politics, Boulder, Westview Press, 1984.

২. Richard L Jackson, The Non-Aligned, The UN and the Super Powers, New York, 1983.

৩. M.S. Rajan, "Non-Alignment The Dichotomy Between Theory and Practice in Perspective", *India Quarterly*, January– March, 1980.

৪. Jayantanuja Bandyopadhyaya, North over South, New Delhi, 1982.

৫. J. Frankel, International Relation in a Changing World, London, 1969

৬. K.J. Holsti, International Politics– A Framework for Analysis, Englawood, 1977.

৭. শাহ আলম, আন্তর্জাতিক সংগঠন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬

দ্বাদশ অধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকা

Power, like love, is easier to experience than to define or measure.

Joseph Nye Jr.
(Political Science Quarterly, 1990)

বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির একটি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসান। দীর্ঘ ৩শ' ৪২ বছরের যে শ্বেতাঙ্গ শাসন, সেই শ্বেতাঙ্গ শাসন ভেঙে গিয়েছিল ১৯৯৪ সালের ২৬-২৮ এপ্রিলের সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। ওই নির্বাচনে কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস বিজয়ী হয়েছিল। এরপর ১০ মে (১৯৯৪) সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হন কালো মানুষদের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা, যিনি দীর্ঘ ২৮ বছর জেলে কাটিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ও নেলসন ম্যান্ডেলার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্তি দেশটিকে বিশ্বআসরে উচ্চআসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং নেলসন ম্যান্ডেলা একজন বিশ্বনেতায় পরিণত হয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর পুরোটা সময় দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতি, বিশেষ করে তার বর্ণবাদী নীতি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রখ্যাত মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নেতা এবং প্যান–আফ্রিকান আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা ডুবইস বলেছিলেন, "The problem of the twentieth century is the problem of the color line- the relation of the darker to the lighter races of men in Asia & Africa in America" [W.E.B. DuBois, "The Souls of Black Folk", NY, 1986]। পৃথিবীতে এই একটি মাত্র রাষ্ট্র (দক্ষিণ আফ্রিকা) ছিল যেখানে বর্ণের ভিত্তিতে জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করা হয়েছিল। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, বর্ণের উপরিকাঠামোকে ঘিরে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বৈষম্যের সূচনা করা হয়েছিল তার জন্ম সেখানে হয়নি। মানুষের ইতিহাসে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সাথে সাথে জন্ম নিয়েছিল ব্যক্তিগত বৈষম্যের। ধীরে ধীরে এ বৈষম্য ব্যক্তি থেকে সমাজে, শ্রেণীতে ও রাষ্ট্রে স্থান করে নেয়। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে শক্তিশালী জনগোষ্ঠী দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। এ প্রভাবকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। কোথাও এ বৈষম্যর ভিত্তি ছিল ধর্ম, কোথাও বর্ণ, সংস্কৃতি, অর্থ-উৎপাদন ব্যবস্থা, অথবা সবগুলোর সমবায়ের একত্র রূপ।

অন্যদিকে, দুটি পৃথক জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যেমন বৈষম্য ছিল, তেমনি একটি জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ শ্রেণীগুলোর মধ্যেও বৈষম্য ছিল। যেমন– প্রাচীন ভারতে বাইরে থেকে আসা আর্যরা অনার্যদের দস্যু বলে অভিহিত করেছিল। ফলে, ভারতীয় সমাজে বর্ণভেদ জাতিভেদে পরিণত হয়েছিল। হিন্দুসমাজের এই জাতিভেদ ছাড়াও পরবর্তীকালে মুসলিমসমাজে এই বৈষম্য প্রকট হয়ে দেখা দেয়। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতা টিকে ছিল দাসপ্রথা ও বৈষম্যের উপর। মধ্যযুগে ভূস্বামী ও ভূমিদাসদের সম্পর্কও ছিল সে রকম। ইউরোপে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিকাশের ফলে বৈষম্য আরেক রূপে ধরা দেয়। শিবনারায়ণ রায় লিখেছিলেন– "...in the twilight of western dominance, the proldem is revealed in all its ugly tenacity." [Sibnarayan Ray Apartheid in Shakespeare other Refashions, Calcutta, 1977.]। মূলত, দক্ষিণ আফ্রিকার-বর্ণবাদ– এই পশ্চিম প্রভাবের ফলেই সৃষ্ট।

উদারনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকদের অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন যে, আধুনিক যুগে 'Race-relations' নির্ভর করে বর্ণ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের উপর। 'Racism' সম্পর্কে বলা হয় যে, "One Ethnic group is condemned by nature to heriditary inferiority & another group is destined to heriditary superiority" [R. Benedict Race, Science & Politics, NY, 1943].। 'বৈষম্য' বা 'Discrimination'-এর অর্থ হচ্ছে, একটি প্রভাবশালী শক্তিশালী গোষ্ঠী অন্য কোনো গোষ্ঠীর উপর তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের অধীন গোত্রের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা। বৈষম্য সম্পর্কে জাতিসংঘের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,- ...any conduct based on grounds of natural or socio categories, which have no relation either to individual capacities or merits, or to the concrete behaviour of the individual person" [The United Nations, The Main Types & Causes of Discrimination, A Dictionary of the Social Sciences.) XIV (3) NY, 1949,.] সুতরাং, এ ভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদকে চিহ্নিত করা হয়েছে ওলন্দাজ 'Apartheid' শব্দের মাধ্যমে। ১৯৪৩ সালের ২৬ মার্চ আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী পত্রিকা Die Burger-এর একটি প্রবন্ধে সর্বপ্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পরে, দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্টে তৎকালীন বিরোধী ন্যাশনালিস্ট পার্টির (Nationalist Party)'র নেতা ড. ম্যারান দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে গিয়ে Apartheid-এর কথা উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জনগণের মধ্যে এ শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। Apartheid-এর আক্ষরিক অর্থ- 'aparhood' separateness- পৃথক, স্বতন্ত্র অথবা বিচ্ছিন্ন। মূলত, বর্ণবাদী রাজনীতির মূলকথাই হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে সরাসরি পৃথক, বিচ্ছিন্ন অথবা অস্বীকার করা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের আগমন ঘটেছিল কয়েকটি ধারায়– সর্বপ্রথম পনের শতকে। ১৪৮০'র দিকে পর্তুগীজ নাবিকরা পশ্চিম আফ্রিকায় তাদের প্রতিষ্ঠিত ঘাঁটি থেকে প্রথমে কঙ্গো নদীর মুখ এবং পরে কেপ অফ গুড হোপ/উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করে। পরে ১৬৫২ সালে জ্যান ভ্যান রাইবিকের নেতৃত্বে প্রথম

ওলন্দাজ অভিযাত্রীদল দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে পৌঁছে। রাইবিকের দায়িত্ব ছিল ওলন্দাজ নাবিক ও অভিযাত্রীদের জন্য কেপ এলাকায় তাজা মাংস ও সব্জির একটি সরবরাহ ও অবকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। ওলন্দাজ অভিযানের উদ্যোক্তা ছিল ডাচ্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। দুর্নীতির অভিযোগে এই কোম্পানির পতন ঘটার আগেই কোম্পানি কেপ এলাকায় একটি ওলন্দাজ উপনিবেশ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। রাইবিক টাটকা খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের লক্ষ্যে এই উপনিবেশে একটি কৃষিখামার গড়ে তুলেছিলেন। রাইবিক ১৬৬২ সাল পর্যন্ত কেপ এলাকায় ছিলেন। ফলে তারই বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কেপ এলাকায় ধীরে ধীরে শ্বেতাঙ্গ স্থায়ী বসতি গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে শ্বেতাঙ্গরা কৃষিকাজের সূচনা করলে উপজাতীয় কৃষ্ণাঙ্গরা এই খামারগুলোতে কৃষিশ্রমিক হিসেবে যোগ দেয়। ১৬৮৮-১৭০৩ সালের মধ্যে ফরাসিদের কয়েকটি দল এবং আঠারো শতকে জার্মানরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজদের সাথে যোগ দেয়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে নেপোলিনীয় যুদ্ধের পর ইংরেজরা ১৮২০ সালে প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের বসতি স্থাপন করে। মূলত, ওলন্দাজ, ফরাসি, জার্মান এবং ইংরেজদের সমন্বয়েই দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গসমাজ গড়ে ওঠে। দক্ষিণ আফ্রিকার আজকের এই বর্ণবাদ শ্বেতাঙ্গদেরই সৃষ্টি।

ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠায় একচ্ছত্র মালিকানা লাভ করে। অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল– মুনাফা অর্জন এবং শোষণ। সেখানে প্রশ্ন উঠেছিল যে, ঔপনিবেশিক জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন হবে। কালভিনবাদ থেকে তারা এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি ধর্মীয় আদর্শ খুঁজে বের করে এবং এটি তাদের বৈষম্যকে সমর্থন করে। কালভিনবাদে বিশ্বাসী ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের কাছে এটি সুস্পষ্ট ছিল যে, "সব অখ্রিস্টীয় স্থানীয় ব্যক্তি কেবল অসভ্যই নয় বরং নিচজাতির সন্তান হিসেবে তারা সবাই স্বর্গীয় অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত।" [Frederick Hale, South Africa Defending the Dagger, Current History, Vol. 84, No. 501, 1985]। কালভিন মতবাদের প্রবক্তা জন কালভিন ১৫৩৩ সালে তাঁর নতুন ধর্মমত প্রচার শুরু করেন। ১৫৩৬ সালে তাঁর বই 'Institute of the Christian Religion' প্রকাশিত হয়। প্রটেস্টান্ট মতাদর্শের দিক থেকে এটিকে "Masterpiece of Protestant Theology" বলে অভিহিত করা হয়। তিনি তাঁর অনুসারীদের বিশ্বাস করাতে সমর্থ হন যে, তারা সৃষ্টিকর্তার নির্বাচিত জনগোষ্ঠী এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী। এদিক থেকে মূলত, কালভিনবাদ ছিল, "...a determinist creeb which consorts naturally with conceptions of racial superiority and of national separateness" [Leo Marquard, The People & Politics of South Africa, London, 1952]।

১৬২২ সালে কালভিনবাদকে নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ডাচ সংস্কারবাদী গীর্জা প্রতিষ্ঠা করা হয়। লুথারের ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন একটি কৃষিভিত্তিক সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল, কালভিনের বিশ্বাস তথা বক্তব্য তেমনি একটি মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। ওলন্দাজ সংস্কারবাদী চার্চ দক্ষিণ

আফ্রিকায় বর্ণবাদের একটি প্রধান পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হলো। ১৬৫২ সালে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে রাইবিকের ছোটদল দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছার পর স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে সবসময় নিজেদের পৃথক রাখার চেষ্টা করেছিল। এই নতুন উপনিবেশের মালিকরাই সপ্তদশ শতকের শেষদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যক্তিগত কৃষিকাজের সূচনা করে এবং এদের কৃষিখামারে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত হলো কৃষ্ণাঙ্গরা। ক্রমবর্ধমান শ্রমিক চাহিদা মেটাবার জন্য ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা ব্যাপকভাবে দাস ব্যবসায় প্রবেশ করেছিল। ১৬৬৬ সাল থেকে মোজাম্বিক, মাদাগাস্কার এবং দূরপ্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কেপ এলাকায় দাস আমদানি করা হলো। ফলে ক্রীতদাস ব্যবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন শ্বেতাঙ্গসমাজের একটি জরুরি এবং স্থায়ী উপাদানে পরিণত হলো।

১৬৮৫ সাল পর্যন্ত কেপ এলাকায় ১২৫টি ওলন্দাজ পরিবার স্থায়িভাবে আবাস স্থাপন করেছিল। ১৬৮৮-১৭০০ সালের মধ্যে সেখানে ওলন্দাজদের সাথে যোগ দিল ফ্রান্স থেকে আগত ২০০ কালভিন মতবাদী ফরাসি। আঠারো শতকে জার্মানরা কেপ এলাকায় যোগ দিল। ১৭০৮ সালের দিকে এখানকার শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়াল ১৭০০ জনে। ১৮১০ সালের দিকে ইউরোপীয় পর্যটক বারচেল এদের 'Africandey' নামে অভিহিত করেন। এরাই পরে নিজেদের 'Afrikaan' হিসেবে দাবি করে। তাদের ভাষাকে চিহ্নিত করা হয় 'Afrikaan' হিসেবে। আঠারো শতকে কৃষিখামারের পাশাপাশি আফ্রিকানরা ব্যাপকভাবে পশু-খামারও গড়ে তুলেছিল। তবে মূলত কৃষিক্ষেত্রে সম্পৃক্ত থাকার কারণে আফ্রিকানদের Boer হিসেবে উল্লেখ করা হতে লাগল। ওলন্দাজ ভাষায় এর অর্থ 'কৃষক'। অপরদিকে কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়োজিত করা হলো শ্বেতাঙ্গদের কৃষিখামারের শ্রমিক, পশুপালক, দাস, পারিবারিক ভৃত্য প্রভৃতি নিম্নপেশায়।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপীয় রাজনীতি ব্রিটেনকে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ এলাকায় নিয়ে এলো। ১৭৯৫ সালে ফরাসি বিপ্লবী সেনাবাহিনী নেদারল্যান্ড আক্রমণ করল। ১৮০২ সালে যখন 'অ্যামিয়েন্সের চুক্তি'র মাধ্যমে ইউরোপে যুদ্ধ থেমে গেল, তখন কেপ এলাকা হস্তান্তর করা হলো ওলন্দাজ রাজতন্ত্রের কাছে। কারণ ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইতোমধ্যে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ১৮০৫ সালের দিকে ব্রিটেন কেপ এলাকা দখল করে। পরবর্তী ১০৫ বছর এটা সরাসরিভাবে তাদের কর্তৃত্বাধীনে রয়ে যায়।

নেপোলিনীয় যুদ্ধের পর একদিকে ব্রিটেনে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, অন্যদিকে কেপ এলাকায় একটি নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টির পরিকল্পনা– দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের লক্ষে কাজ করেছিল। সরকারি বেসরকারি উভয় উদ্যোগেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ জনবসতি গড়ে উঠতে লাগল ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড থেকে আনা ব্যক্তিদের নিয়ে। তৎকালীন কেপ এলাকার একটি প্রদেশ নাটালে তারা বসতি স্থাপন করল। যার ফলে নাটাল-ব্রিটিশ প্রাধান্য-এলাকায় পরিণত হলো। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আগত ব্রিটিশরা ইংরেজি ভাষা, ইংরেজি স্কুল, নিজেদের সংস্কৃতি, আদালত, পরিষদের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় আরেকটি শ্বেতাঙ্গসমাজ গড়ে তুলল।

ফলে শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গ বৃহৎ দ্বন্দ্বের ভিতরে শ্বেতাঙ্গ সমাজেই "আফ্রিকান" (ডাচ)-ইংরেজ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হলো।

ব্রিটেন ১৮০৭ সালে নিজ দেশে এবং ১৮৩৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় দাস-প্রথা বাতিল করে। চাষাবাদ ও পশুপালনের জন্য অতিরিক্ত জমির প্রয়োজনে ১৮৪৬-১৮৬৬ সাল পর্যন্ত ১৪ হাজার আফ্রিকান কেপ কলোনি ত্যাগ করে। ইতিহাসে এটিই 'গ্রেট ট্রেক' হিসেবে পরিচিত। এরা ট্রান্সভালে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৫২ সালে ব্রিটিশ সরকার ট্রান্সভালকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তবে গ্রেট ট্রেক 'বুয়োর' ইংরেজ দ্বন্দ্বকে থামিয়ে রাখতে পারল না। ১৮৯৯-১৯০২ পর্যন্ত এ-দ্বন্দ্ব সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হয়। সময়ের সাথে সাথে ট্রান্সভালের 'বুয়োর'দের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গির মিল ঘটতে শুরু করে। এর প্রধান কারণ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় খনির আবিষ্কার।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২ লাখ। ইতোমধ্যে উল-ব্যবসা ঔপনিবেশিক শ্রেণীর প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হিসেবে চিহ্নিত হলো। ১৮৪৬ সালে যেখানে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার পাউন্ড মূল্যের উল রপ্তানি করা হয়, ১৯৬৬ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ লক্ষ ৮২ হাজার পাউন্ড। কিন্তু, ১৮৬৮ সালে হীরার খনির আবিষ্কার এবং ১৮৮৬ সালে স্বর্ণের খনির আবিষ্কার ব্যাপক পরিবর্তনের পথ পরিষ্কার করে দিল। এটি দক্ষিণ আফ্রিকার শিল্পোন্নয়নের সূচনা করলে বিশেষত পুঁজিবিনিয়োগ এবং শ্রম-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই শিল্পায়ন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করল। কেবল স্বর্ণশিল্পেই ১৮৮৭-১৯০৫ সালের মধ্যে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮৮১ সালের ১ কোটি ৬০ লাখ র‍্যান্ড থেকে বেড়ে ২০ কোটি ৮০ লাখ র‍্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াল। ১৯৬৮ সালে এর পরিমাণ দাঁড়াল ১০৪ কোটি ৬০ লাখ র‍্যান্ডে, তা ছিল সে সময়ে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে মোট বিদেশি পুঁজি বিনিয়েগের ৪০ ভাগ। বিদেশি পুঁজির বড় অংশ বিনিয়োগ করল ব্রিটেন। ফলে, কৃষি ও পশুখামার নির্ভর আফ্রিকানদের তুলনায় ইংরেজরা খনি ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল। মাত্র ৪ বছরের মধ্যে ১৮৭১ সালে হীরার খনি শহর কিম্বারলিতে লোকসংখ্যা দাঁড়াল ৫০ হাজারে। এই শ্রমিকদের বড় অংশই কৃষ্ণাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের মজুরি কম নির্ধারিত হয়েছিল। অন্যদিকে, সস্তা শ্রমিক সরবরাহের গতি অব্যাহত রাখার জন্য ভূমির উপর অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলো। ১৯১৩ সালের 'Land Act'-এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাই। এই আইনে কতকগুলো বিশেষ এলাকার বাইরে কৃষ্ণাঙ্গদের ভূমি ক্রয় নিষিদ্ধ করা হলো। ভূমির মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অধিকার সংকুচিত করা হলো। বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আরো কড়াকড়িভাবে যে বৈষম্য আরোপ করা হয়েছিল এসবই তার ভিত্তি। সুতরাং খনিকে ঘিরে নতুন পুঁজির বিকাশের সাথে সাথে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষেত্রে ইংরেজ ও আফ্রিকান দৃষ্টিভঙ্গি এক হয়ে গেল এবং সেখানে পুঁজিবাদী শাসনের চরিত্রটিই প্রধান হয়ে উঠল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ শাসন আরেকভাবে বর্ণবাদের পথকে সুগম করেছিল। ইংরেজরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশের জন্য প্রধানত পরোক্ষ শাসননীতি গ্রহণ

করেছিল। ইংরেজদের এই নীতি আফ্রিকার জনগণের ও শ্বেতাঙ্গ সমাজের সমন্বয়ের পথে ছিল বড় অন্তরায়। ইংরেজদের এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল, উপনিবেশগুলো স্ব-শাসনের উপযুক্ত হলে তাদের স্বাধীনতা প্রদান করা। সেই লক্ষ্যেই উপনিবেশগুলোতে ইংরেজ ও স্থানীয় ব্যক্তিদের শাসনের জন্য সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এক্ষেত্রে, স্থানীয় শাসকদের ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ সরকারের অধীনে এনে তাদের মাধ্যমে শাসন করার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থাগুলো শ্বেতাঙ্গ ও স্থানীয় জনগণের মাঝে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংমিশ্রণে বাধা প্রদান করে এবং শ্রম ব্যবস্থায় ও মজুরিতে ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি করে।

১৯১০ সালের মে মাসে কেপ কলোনী, নাটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রিভার স্টেট—এই ৪টি এলাকা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'Union of South Africa' গঠন করল। বর্ণবাদের উপর ভিত্তি করে ১৯১০ সালের এই আইন এমন একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করল যেখানে আইনসঙ্গতভাবে অশ্বেতাঙ্গদের আইনসভায় নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। বিশেষত ১৯১০-পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতির একটি প্রধান ধারা ছিল, শ্বেতাঙ্গদের নিজেদের মধ্যেই রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। সংখ্যার দিক থেকে আফ্রিকানভাষী শ্বেতাঙ্গরা ছিল সমগ্র শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর ৬৫ ভাগ, অন্যদিকে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে খনি ও ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ছিল ইংরেজদের হাতে। আফ্রিকানদের মূল নিয়ন্ত্রণ ছিল ভূমি ও কৃষিখামারের উপর। আফ্রিকান-ইংরেজ দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল পরিচালন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। আফ্রিকানদের/বোয়েরদের মধ্যে একটি উদারনৈতিক অংশ ইংরেজদের সহযোগী ও তাদের নীতির সমর্থক ছিল, অন্যটি ছিল রক্ষণশীল অংশ—এদের উদ্দেশ্য 'বুয়োর' প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার প্রথম ১৪ বছর দুজন প্রধানমন্ত্রী লুই বোথা (১৯১০-১৯) এবং জেনারেল ভ্যান স্পার্টসের (১৯১৯-২৪) অধীনে নতুন সরকার দুই দলের মধ্যে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে। ১৯২৪ সালে জেম্‌স হার্টজনা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯১২ সালে তিনি আরেকজন 'বোয়ের' নেতা ড. ম্যালানের সাথে আফ্রিকান জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এবং তাদের ভাষায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই 'Nationalist Party'র স্লোগান ছিল— 'South Africa First"। পরবর্তীকালে এই দল দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী 'বোয়ের' আধিপত্য এবং বর্ণবাদ বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য, হার্টজন প্রধানমন্ত্রী (১৯২৪-৩৯) নিযুক্ত হয়েছিলেন 'South African Labour Party'র সহায়তায়। এই দলটি গড়ে উঠেছিল ইংরেজ শ্রমিকশ্রেণীর মাধ্যমে এবং শ্রমিক দল হওয়া সত্ত্বেও ১৯২৪ সালে হার্টজনের ন্যাশনালিস্ট পার্টির সাথে এই দল সরকার গঠন করে শিল্পক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য সুরক্ষিত করে। ১৯৩৩ সালে ন্যাশনালিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে বিভেদের ফলে হার্টজন জেনারেল স্পার্টসের সাথে তার দলীয় অংশ একত্র করেন এবং 'United Party' প্রতিষ্ঠা করেন। ন্যাশনালিস্ট পার্টির অন্য অংশ ড. ম্যালানের নেতৃত্বে পার্লামেন্টে বিরোধীদল হিসেবে অবতীর্ণ হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদানের প্রশ্নে ন্যাশনালিস্ট পার্টির দুটি বিচ্ছিন্ন অংশ পুনরায় সংযুক্ত হয়। ১৯৩৯ সালে জেনারেল স্পার্টস পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেন।

১৯৪৮ সালে ন্যাশনালিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড. ডানিয়েল এফ. ম্যালানের নেতৃত্বে দলটি ক্ষমতায় আসে। এরপর থেকে পরবর্তী প্রতিটি নির্বাচনে ন্যাশনালিস্ট পার্টি জয়ী হয়। ডানিয়েল এফ ম্যালানের (১৯৪৮-৫৪) পর জোহানস স্ট্রিজডস (১৯৫৪-৫৮) এবং তার পরে হেনড্রিক এফ ভেরহুড (১৯৫৮-৬৬) প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে ভেরহুড আততায়ীর হাতে মারা গেলে জন ভরস্টার (১৯৬৬-৭৮) প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য যে, ১৯১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রীদের সবাই ছিলেন 'বুয়োর' এবং আফ্রিকানভাষী। এঁরা সবাই দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য বিস্তারে সক্রিয় ছিলেন। এরা সবাই ছিলেন বর্ণবাদের সক্রিয় সমর্থক। বিশ শতকের সূচনা থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে বস্তুগত ও গুণগত পার্থক্য সূচিত হয়।

সারণি : ১১

দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যার একটি চিত্র

সাল	মোট জনসংখ্যা
১৯০৪	৫১,৭৫,০০০
১৯৫১	১,২৬,৪৬,৩৭৫
১৯৬০	১,৫৯,৮২,৬৬৪
১৯৭০	২,১৪,৪৭,৯৮২

১৯৭০ সালের জনসংখ্যা জরিপে দেখা গেল যে, জনসংখ্যার ১৭.৫ ভাগ শ্বেতাঙ্গ। বলা বাহুল্য, অশিক্ষা, দারিদ্র্যের ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল অধিক হারে। ফলে শহরাঞ্চলে ক্রমাগত চাপের সৃষ্টি হয়। ১৯৬০-৭০ সময়সীমায় বার্ষিক ৩.৩ ভাগ হারে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল [World Bank Atlas, 1976, Washington D.C. 1979]। নগরের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ছিল কৃষ্ণাঙ্গ যাযাবর শ্রমিক। একথা বলা হয়েছে যে, "Migratory African labour is a majore economic phenomenon & a considerable part of it involves migration from a rural to an urban environment" [Willson "Prospects for Southern Africa", Current History, Vol. 50, No. 295, March, 1966.]

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নও ঘটেছিল দ্রুতগতিতে। মূলত, খনি ও শিল্পে এই উন্নয়ন ঘটলেও কৃষি ও অন্যান্য শিল্পে অগ্রগতি ছিল উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৭০ সালে সমগ্র বিশ্বের মোট স্বর্ণ উৎপাদনের ৭৭.৮ ভাগ স্বর্ণ উৎপাদন হয়। হীরা উৎপাদনও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, স্বর্ণ ও হীরার মজুত ছিল উল্লেখযোগ্য। রপ্তানিও বাড়ছিল দ্রুত গতিতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নতি এবং পাশাপাশি কৃষ্ণাঙ্গ জনসংখ্যা বৃদ্ধি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারকে নতুন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করায়। সতের শতকের বর্ণ বৈষম্যকে বিশ শতকের নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন কাঠামো ও নতুন আদর্শের। ১৯১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'বোয়ের' প্রধান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার

পর থেকে বর্ণবাদকে পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। ১৯১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী স্পার্ট্‌স বলেছিলেন, "We are now trying to lay down a policy of keeping them apart as much as possible in our institutions"। ভূমি মালিকানা, আবাসস্থাপন, সরকারি ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হয়। তাঁর বক্তব্যই পরে প্রতিফলিত হয়েছিল ন্যাশনালিস্ট পার্টি এবং তাদের প্রধানমন্ত্রীদের বিভিন্ন বক্তব্যে। উগ্র আফ্রিকান জাতীয়তাবাদকে নিয়ে গড়ে ওঠে (১৯১২) ন্যাশনালিস্ট পার্টির ভূমিকা এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাদের লক্ষ্য ছিল দুটি– একদিকে কৃষ্ণাঙ্গসমাজ এবং বৈষম্যের মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা, অন্যদিকে ইংরেজ ভাষাভাষী শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করা।

বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে দ. আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে শিক্ষা এবং কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেছিল। অন্যদিকে, আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ ও উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনও তাদেরকে প্রভাবিত করেছিল। এক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গরা কৃষি ও শিল্প উভয় উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর জাতীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার স্বার্থে তাদের বর্ণগত ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার লক্ষ্যে এবং অশ্বেতাঙ্গদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি ও আইনগতভাবে 'Apartheid' বা বর্ণবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল। আগের বর্ণবৈষম্য নীতির সাথে পার্থক্য করতে গিয়ে এই নীতির প্রয়োগকারী ড. ম্যালান বলেছিলেন, "...apartheid didn't have the negative overtones of the earlier policy of segregation". সুতরাং বিশ শতকে এসে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজের হাতে বর্ণ বৈষম্যের ক্ষেত্রে দুটি ধারার সূচনা হলো। একটি হলো, আগের শতক থেকে চলে আসা আইন, প্রথা এবং ব্যবস্থা নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপযোগী ও কার্যকর করে তোলার জন্য অধিক সংখ্যক বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন করা এবং অন্যটি হলো– শ্বেতাঙ্গদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য বিশেষ করে ষাটের দশক থেকে রাজনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে অশ্বেতাঙ্গদের জন্য পৃথক আবাসভূমি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। অবশ্য এ দুটি ধারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল না।

বর্ণবাদ সংক্রান্ত কিছু আইন

১৯৪৮ সালে ন্যাশনালিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসেছিল বর্ণবৈষম্যকে নিজেদের নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। বর্ণবৈষম্যকে কার্যকর করার জন্য ১৯৪৮ সাল থেকে তারা প্রচুর আইন পাস করে। উল্লেখ্য যে, ন্যাশনালিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকেই বর্ণবৈষম্যমূলক বিভিন্ন আইনের প্রবর্তন করা হয়েছিল। ন্যাশনালিস্ট পার্টি পরবর্তীকালে এই আইনগুলো সংশোধন এবং পরিবর্তন করে। এগুলোর সাথে যুক্ত হয় তাদের সময়ের অসংখ্য আইন। এসব আইন অশ্বেতাঙ্গদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিল। এই আইনগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. **Mines & Works Act & Colour Act :** ১৯১১ সালে এটি পাস হয়। এই আইন খনি ও প্রকৌশলবিদ্যার সার্টিফিকেট দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার

অধিকার দিয়েছিল। ১৯২৩ সালে এটি প্রয়োগ করা হয় এবং অশ্বেতাঙ্গদের সার্টিফিকেট নিতে বাধা প্রদান করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার আদালত একসময় এ বিধি-নিষেধ বাতিল করে দেয়। ফলে শ্বেতাঙ্গ ট্রেড ইউনিয়নগুলো আন্দোলন শুরু করে। ১৯২৬ সালে ন্যাশনালিস্ট পার্টি ও সাউথ আফ্রিকান লেবার পার্টি কোয়ালিশন সরকার গঠন করে এবং এই আইন সংশোধন করে। সংশোধিত নতুন আইন Colour Bar Act নামে পরিচিত। এ আইনে খনি ও শিল্পের কিছু কিছু চাকরি এবং পদের ক্ষেত্রে অশ্বেতাঙ্গদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি এসব ক্ষেত্রে তারা শিক্ষানবিসও হতে পারবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২. **Immorality Act :** ১৯২৭ সালে এই আইন পাস হয়। এই আইনের অধীনে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়। পরে ১৯৫০ সালে এক সংশোধনীর মাধ্যমে এই নিষেধাজ্ঞা কৃষ্ণাঙ্গ থেকে সমগ্র অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর উপর আরোপিত হয়।

৩. **Land Act :** ১৯১৩ সালে প্রথম এই আইন পাস হয়। এতে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা ছাড়া অন্যকোথাও জমির মালিক হতে পারবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। পরে ১৯৩৬ সালে এই আইনের পরিবর্তে Natives Trust & Land Act পাস করা হয় এবং সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য তা বলবৎ করা হয়।

৪. **Prohibition of Mixed Marriages Act :** ১৯৪৯ সালে প্রণীত এই আইনের মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়।

৫. **Group Areas Act** ১৯৫০ সালে এই আইনের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার জনগোষ্ঠীকে ভাগ করা হয়– শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ এবং কালারড্। কালারড্ জনগোষ্ঠীকে আরো কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন– কেপ কালারড্, কেপ মালয়ী, গিরিকুয়া, ভারতীয়, চীনা, অন্যান্য কালারড। অন্যদিকে, গোত্রের ভিত্তিতে কৃষ্ণাঙ্গদের ১০টি ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি কৃষ্ণাঙ্গদের কোনো না কোনো গোত্রের অধীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 'Group Areas Act'-এর অধীনে প্রত্যেক গোত্রের জন্য একটি করে এলাকা চিহ্নিত করা হয় এবং ওই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে তাদের চিহ্নিত করা হয়। ওই এলাকাগুলোকে Bantustan হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তাছাড়া এই আইনের বিভিন্ন ধারায় অশ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়া অন্যান্য এলাকায় তাদের জমি ক্রয়-বিক্রয়, দখল ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

৬. **Population Registration Act :** ১৯৫০ সালে এই আইন Group Areas Act-এর সহযোগী আইন হিসেবে পাস করা হয়। এই আইনে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ নিজ গোত্রের ভিত্তিতে নাম লিপিবদ্ধ করার আদেশ প্রদান করা হয়।

৭. **Separate Registration of Voters Act :** ১৯৫১ সালে এই আইনের মাধ্যমে কেবল শ্বেতাঙ্গদের জন্য ভোটাধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গদের পৃথক ভোটার তালিকার ব্যবস্থা করা হয়। এতে কালারড্দের ভোটাধিকার বাতিল করা হয়।

৮. **Prevention of illegal Squatting Act :** Group Areas Act-এর সাথে সঙ্গতি রেখে এটি প্রণীত হয়। এতে বলা হয় যে, কোনো ব্যক্তি অনুমতি ব্যতীত কোনো স্থানে, কোনো কৃষ্ণাঙ্গ এলাকায়, গ্রামে প্রবেশ করতে এবং সেখানে কোনো বাসস্থান গড়ে তুলতে পারবে না।

৯. **Pass Law :** ১৮০৯ সালে ব্রিটেন প্রথম এ-ধরনের একটি আইন পাস করেছিল। এর লক্ষ্য ছিল– তৎকালীন কেপ এলাকায় কৃষ্ণাঙ্গ বিশেষত হটেনটট জনগোষ্ঠীর অধিবাসীদের ব্যাপকভাবে শহর এলাকায় প্রবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। পরে ব্রিটিশরা এটি বাতিল করে। অতপর, বিশ শতকের পরিস্থিতির উপযোগী করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তা আবার প্রয়োগ করা হয়। এতে বলা হয়– সব কৃষ্ণাঙ্গ একই রকম এবং তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বর্তমান– সে অর্থে বলা হয় যে, ১৬ বছর বা তার উর্ধ্বে সব অশ্বেতাঙ্গ পুরুষের অনুমতিপত্র এবং পরিচয়পত্র বহন করতে হবে। পরবর্তীকালে, এই আইনের আওতায় মহিলাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই আইনে আরো বলা হয় যে, শ্বেতাঙ্গ শহর এলাকায় চাকরির নিয়োগপত্র ছাড়া কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ৭২ ঘণ্টার বেশি সময় অবস্থান করতে পারবে না। এই পাস বইকে একজন অশ্বেতাঙ্গদের "Book of Life" হিসেবে অভিহিত করা হতো। স্বাভাবিক বা বিশেষ কোনো সময়ে পরিচয়পত্র প্রদর্শন করতে অসমর্থ হলে তাকে গ্রেফতার করে আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হতো। এই আইনের মূলউদ্দেশ্য ছিল– শহর ও শিল্প এলাকায় কৃষ্ণাঙ্গ আগমনের উপর নিয়ন্ত্রণ। পরবর্তী সময়ে 'Abolition of Passes & Co-ordination of Documents' আইনের মাধ্যমে পাস বুকের নাম বদলে রেফারেন্স বুক হিসেবে অভিহিত করা হয়। অবশ্য মূল বিষয়গুলো অপরিবর্তিত থাকে।

১০. **Suppression of Communism Act :** এটি ১৯৫০ সালে পাস হয়। এই আইনে যে কোনো সংগঠন বা প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ব্যবস্থা রাখা হয়। কমিউনিস্টদের তালিকা তৈরি, তাদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি, সভা নিষিদ্ধ ইত্যাদি বিষয় এই আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১১. **Native Laws Amendment Act** এই আইনটিও Group Areas Act-এর সহযোগী হিসেবে ১৯৫২ সালে প্রণীত হয়। এই আইনে শহর এলাকাগুলোতে কৃষ্ণাঙ্গদের স্থায়িভাবে বসবাসের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

১২. **Native Labour Registration Act :** এই আইনে একজন অশ্বেতাঙ্গ শ্রমিক বা কর্মচারীর পক্ষে তার নিয়োগকর্তার আদেশ পালনে অস্বীকৃতি কিংবা তার চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

১৩. ১৯৫৬ সালে ভারতীয়দের জন্য একটি আইন পাস করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের আগমন রোধকল্পে এটি প্রণীত হয়। এতে বলা হয়, ভারত উপমহাদেশে বসবাসকারী কোনো ভারতীয় মেয়েকে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো ভারতীয় বিয়ে করতে পারবে না।

১৪. **Riotous Assemblies Act :** ১৯৫৬ সালে এটি প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে কোনো আন্দোলন, শোভাযাত্রা ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যবস্থা করা হয়।

১৫. **Trade Union Act :** ১৯৫৭ সালে এই আইনের মাধ্যমে গোত্রীয় পার্থক্যের উর্ধ্বে এবং সংহতির ভিত্তিতে বৃহত্তর ঐক্যের লক্ষ্যে গঠিত শ্রমিক সংগঠনগুলোকে গোত্রীয় পার্থক্যের ভিত্তিতে সংগঠিত করার নির্দেশ দেয়া হয়।

১৬. **Job Reservation Act :** এই আইনের অধীনে সরকারি কর্মে এবং শিল্প, খনি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্বেতাঙ্গদের জন্য চাকরি সংরক্ষিত করা হয়। ফলে, চাকরি ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ- অশ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

১৭. **Drison's Act :** ১৯৫৯ সালে এটি পাস করা হয়। এতে জেলখানা অথবা এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো বিবরণ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

১৮. **Ninety-Day Law :** ১৯৬৩ সালের এপ্রিলে General Law Amendment Bill-এর অধীনে এটি পাস হয়। এই আইনের মোট ৯টি ধারা ছিল। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল ৩টি (ক) ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির দণ্ডের মেয়াদ শেষ হলেও তাকে অনির্দিষ্ট কাল আটক রাখা যাবে; (খ) ধ্বংসাত্মক ঘটনা সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করতে সমর্থ এমন ব্যক্তিকে পুলিশ ৯০ দিনের জন্য নির্জন সেলে আটকে রাখতে পারবে; (গ) যে কোনো ডাক পরীক্ষা করার এবং তা অ্যাটর্নী জেনারেলের কাছে পাঠাবার অধিকার ডাক বিভাগের থাকবে।

১৯. **80-Day Act :** ১৯৬৫ সালে এটি পাস করা হয়। এই আইনে কোনো ফৌজদারী মামলায় বাধা দিতে পারে এ সন্দেহে যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যাবে এবং তাকে একটানা ৬ মাস আটক করে রাখা যাবে।

২০. **Terrorism Act :** ১৯৬৭ সালে প্রণীত এই আইনে সন্ত্রাসী কাজে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখার অধিকার পুলিশকে দেয়া হয়।

২১. **Prohibition of Improper Interference Act :** ১৯৬৮ সালে এটি প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে যে কোনো সংগঠন গড়ে তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

২২. **Petty Apartheid Laws :** মূলআইন ছাড়াও অন্যান্য আইনের মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। ১৯৫৩ সালে 'Reservation of Separate Amenities Act'-এর মাধ্যমে বাস, ট্রেন, লাইব্রেরি, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, পার্ক, খেলার মাঠ, স্কুল, বাজার, সমুদ্র সৈকতেও শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখা হয়।

এইসব আইন অশ্বেতাঙ্গদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিল এবং তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে রেখেছিল।

বান্টুস্থান

শ্বেতাঙ্গরা প্রথম থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের অভিহিত করেছিল 'বান্টু' হিসেবে। এই নামকরণ হয়েছিল মূলত ভাষাগত ভিত্তিতে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে পুরো আফ্রিকায় বান্টু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ১৮ কোটি। এদের মধ্যে রয়েছে ৩০০টি ভাষাগোষ্ঠী। দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু অথবা পূর্ব আফ্রিকার সোয়াহলী এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী। প্রাথমিক বান্টু গোষ্ঠীগুলো খ্রিস্ট কালের প্রথমদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কারণে আফ্রিকার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পনেরো শতকের দিকে তারা দক্ষিণ আফ্রিকা ও পূর্ব আফ্রিকায় প্রবেশ করে। এরাই ছিল আজকের দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের পূর্বপুরুষ। শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী থেকে এই কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীকে আইনগতভাবে এবং জাতিগতভাবে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্য পঞ্চাশের দশকে "Bantustan' বা 'Homeland' পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৫০ সালে ন্যাশনালিস্ট পার্টির শ্বেতাঙ্গ সরকার অধ্যাপক টমলিনসনের নেতৃত্বে কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন রিপোর্ট দেয় ১৯৫৫ সালে। ওই রিপোর্টে বলা হয় (ক) শ্বেতাঙ্গ অঞ্চলগুলোতে কৃষ্ণাঙ্গরা কোনো সময়ই শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার ভোগ করতে পারবে না; (খ) আফ্রিকাবাসীরা একটি জাতি নয়। তারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। আফ্রিকাবাসীদের নিজ নিজ অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন দেয়া যেতে পারে; (গ) আফ্রিকাবাসীদের নিজেদের 'Homeland'-এ ফিরে যেতে হবে; (ঘ) অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নশীল প্রকল্পগুলোর কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে টমলিনসন কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি আইন পাস হয়। যেমন– Bantu Authorities Act (1951), Bantu Labour Act (১৯৫৩), Bantu Self Govt. Act (১৯৫৯), Bantu Homeland Citizenship Act (১৯৭০)। এক্ষেত্রে বান্টুস্থান নামে চিহ্নিত কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য ১০টি বান্টু এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর মাধ্যমে আফ্রিকার ৮০ ভাগ জনগোষ্ঠীকে মাত্র ১4 ভাগ এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

বাস্তবে বান্টুস্থান গড়ার পিছনে কাজ করেছিল শ্বেতাঙ্গদের কূটনীতি। শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠী নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে এই বান্টুস্থান নীতি প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে, প্রতিটি কৃষ্ণাঙ্গকে জন্ম, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো একটি বাণ্টুস্থানের অধীনে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের চিহ্নিত করা হয় বান্টুস্থানের নাগরিক হিসেবে। জাতিসংঘে নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার এক সময়ের প্রতিনিধি আর এফ বোথার বক্তব্য বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, "The problem in Southern Africa is basically not one of race, but of nationalism. which is worldwide problem. There is a White nationalism and there are several Black nationalism. My Govt.s principal aim is to make it possible for each nation, Black & White to achieve its fullest potential, including sovereign independence, so that each individual can enjoy all the rights and privileges which his/her community is capable of securing for him/her." ।

বান্টুস্থান ব্যবস্থার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল– কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর আরো অধিক সংখ্যায় ও স্থায়ী নগরায়নে বাধা দেয়া। তারা যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ক্রমবর্ধমান সচেতনতার ফলে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে না পারে, সে লক্ষ্যে, শহর

এলাকায় জন্মসূত্রে, দীর্ঘকাল ধরে কাজ করার সূত্রে যে বিরাট সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন, তাদের গোত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন বান্টুস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৩ সালে, Surplus People Project-এর অধীনে পরিচালিত গবেষণায় বলা হয় যে, ১৯৬০-১৯৮৩ সালের মধ্যে সর্বমোট ৩৫,২২,৯০০ জন অশ্বেতাঙ্গদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আরো প্রায় ১,৮০,০০০ জনকে ওই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ ছিল কৃষ্ণাঙ্গ, বাকিরা ভারতীয় ও কালারড। পঞ্চাশ দশক থেকে সত্তর দশকের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বমোট ১০টি বান্টুস্থান গড়ে তোলা হয়েছিল। গোত্রভিত্তিতে এদের সংগঠিত করা হয়েছিল এভাবে

সারণি : ১২
দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী

বান্টুস্থান	গোত্র
বপুতসোয়ানা	সোয়ানা
সিসকাই	সোজা
গাজানকুলু	সাজগান
কাওয়াজুলু	জুলু
লেবোয়া	নর্থ সোথো
কোয়াকোয়া	সাউথ সোথো
কা নাগভানে	সোয়াসি
ট্রান্সকাই	হোসা
ভেন্দা	ভেন্দা
কাওয়া নাদেবেলে	নাদেবেলে

বান্টুস্থানগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'Dept. of Bantu Administration & Development' গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে যেসব বান্টু এলাকার স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয় সেই এলাকাগুলোতে নির্বাচিত পরিষদ গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে 'Transkei'-কে প্রথম স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে, বান্টুস্থান ব্যবস্থা কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য সুফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। কারণ, বান্টু এলাকাগুলোর অধিকাংশই অনাবৃষ্টির শিকার এবং কৃষিকাজের অনুপযোগী ছিল। খনিজ সম্পদও সুষমভাবে বন্টন করা হয়নি। তাছাড়া, স্থানীয় পুঁজির ব্যাপক সংকট ছিল। এছাড়া প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, উচ্চ-অপরাধ হার প্রভৃতির ফলে উন্নয়নমূলক প্রকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসতি হয়েছিল।

সত্তর ও আশির দশকে দক্ষিণ আফ্রিকা তার আরো কয়েকটি বান্টুস্থানকে স্বাধীনতা প্রদান করে। এদের মধ্যে ছিল ১৯৭৭ সালে বপুতসোয়ানা এবং ১৯৭৯ সালে ভেন্দা ও ১৯৮১ সালে সিসকাই। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর কোনোদেশই এগুলোকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। মূলত, বান্টুস্থান ব্যবস্থা আরো বৃহৎ অর্থে Group Areas Act গ্রাম এবং শহর উভয় এলাকায় কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের একটি অস্ত্রে পরিণত হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার এশিয়ান জনগোষ্ঠীর একটি অংশ এসেছিল ভারত থেকে। এদের আগমন ঘটেছিল শ্রমিক হিসেবে। ভারতীয় রাজনীতিকদের অনেকেই একে দাসত্ব নামে অভিহিত করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার আরেকটি অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীকে 'Group Areas Act.'-এর ধারায় কালারড হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল। এদের উৎপত্তি সতের

শতকের কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের মধ্য থেকে। কিন্তু, ব্যাপকভাবে সাদা-কালোর যে বৈষম্য তাতে এরা কালোদের দলেই রয়ে যায়। সত্তর দশকে এর ভাগ মোট জনসংখ্যার ৯.৪ ছিল।

কৃষ্ণাঙ্গ, কালারড ও এশীয় অশ্বেতাঙ্গদের সাথে বৈষম্য প্রবর্তন করা হয়েছিল শিক্ষা ব্যবস্থায়ও। শ্বেতাঙ্গদের জন্য যেখানে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় কিন্তু অশ্বেতাঙ্গদের জন্য তা বাধ্যতামূলক ছিল না। শিক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এই বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। ১৯৬৫ সালে শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছিল ৩.২৬ কোটি র‍্যান্ড এবং এর ৭৭ ভাগ ব্যয় হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের জন্য। অথচ এরা ছিল সামগ্রিক জনসংখ্যার মাত্র ১৮ ভাগ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার এই নীতি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিরাজমান ছিল। ১৯৫৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বর্ণবৈষম্য চালু করা হয়। 'University Education" Act'-এর অধীনে ১৯৫৯ সালে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় শ্বেতাঙ্গদের জন্য এবং ৩টি কৃষ্ণাঙ্গদের ও ১টি এশীয়ানদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছিল। শিক্ষাগত বৈষম্যের আরেকটি দিক ছিল, শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গ শিক্ষকদের বেতনের ক্ষেত্রে পার্থক্য।

রাজনীতি ক্ষেত্রেও এই শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গ পার্থক্য লক্ষ করা গিয়েছিল। রাজনীতিতে ছিল তিনকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট—যেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের আদৌ কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। মূলক্ষমতা ছিল *'হাউজ অব এসেম্বলি'র* হাতে। এটা ছিল শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্ধারিত। এখানেই আইন প্রণীত হতো। *'হাউজ অব এসেম্বলি'র* সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭৮ জন, এর মধ্যে ১৬৫ জন ছিলেন নির্বাচিত। কালারড বা মিশ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ছিল *'হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ'*, সদস্য সংখ্যা ছিল ৮৫ জন। এর মাঝে ৮০ জন ছিলেন নির্বাচিত। কালারড্ বা মিশ্র জনগোষ্ঠীর লোকেরাই (জনসংখ্যা ৩০ লক্ষ) তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতেন। অন্যদিকে, এশীয় বংশোদ্ভূতদের জন্য ছিল (জনসংখ্যা ১০ লাখ) *'হাউজ অব ডেলিগেটস্'*। সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। তাঁদের মধ্যে ৪০ জন সরাসরি নির্বাচিত হতেন। এভাবেই বর্ণের ভিত্তিতে রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যগত বিভক্তি ছিল। শ্বেতাঙ্গদের স্কুলে কোনো কৃষ্ণাঙ্গের প্রবেশাধিকার ছিল না। তেমনি শ্বেতাঙ্গদের হাসপাতালে ভর্তি হতে পারত না কোনো কৃষ্ণাঙ্গ রোগী।

সুতরাং, এটা লক্ষণীয় যে, সতের শতকে ভ্যান রাইবিক দক্ষিণ আফ্রিকায় 'বুয়োর'দের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার যে চেষ্টা করেছিলেন, পরবর্তীকালে ইংরেজরা সামগ্রিক অর্থে সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকা গত কয়েকটি দশক ধরে একটি পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। সরকার তার নাগরিকদের জেল, নির্যাতন এবং মৃত্যুর জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের নীতির ফলে সেখানে চূড়ান্তভাবে মানবাধিকার লংঘন করা হয়েছিল। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল এভাবে "The dask side of Govt. knows no geographic, economic, ideological or political boundary." [Mitchell & James M. Mecormick, "Economic & Political Explanations of Human Rights Violatian," World Politics : Vol. 40, No. 4, 1988].

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের সাথে কেবল রাজনৈতিক নয় এর সাথে চার্চ, বিশ্ববিদ্যালয়, বুদ্ধিজীবী দল, সংগঠন সবাই জড়িত ছিল। বর্ণবাদের মাধ্যমে ষাটের দশকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের এই চরিত্র আশির দশকেও বজায় ছিল। এ বিষয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের বক্তব্য ছিল এরূপ

"How can he (Whites) be made an honorary citizen when we, who live here are not even citizens." [Patrick O'Meara "South Africa The Politics of Change." Curent History, Vol. : 90, No. 463, 1981].

এই ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ৩শ' ৪২ বছরের ইতিহাস। এই ইতিহাস ভেঙে দেয়ার কৃতিত্ব যার, তিনি হচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বশেষ শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট এফ. ডিব্লিউ ক্লার্ক, যিনি এক সংস্কার কর্মসূচির আওতায় ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম দিয়েছিলেন। বর্ণবাদ অবসানকল্পে সেখানে ১৯৯২ সালের ১৭ মার্চ একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। শুধু শ্বেতাঙ্গরাই ওই গণভোটে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি সংস্কারের পক্ষে শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর হ্যাঁ বা না ভোট চেয়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া এবং বর্ণবাদের অবসান চেয়েছিলেন তার সংস্কার কর্মসূচিতে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৮৯ সালে। তারপর থেকেই তিনি সংস্কারের কথা বলে আসছিলেন। গণভোটে তার সংস্কার কর্মসূচির পক্ষে ভোট পড়েছিল ৬৯ ভাগ। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছিল শ্বেতাঙ্গরাও সংস্কার চান। ক্লার্ক ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (এএনসি) উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন এবং এএনসির নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে একই বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেন। ১৯৬৩ সাল থেকেই ম্যান্ডেলা জেলে ছিলেন। এরপর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ম্যান্ডেলা বিজয়ী হন। তিনি ক্লার্ককে তার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করেন। ৪০০ আসন বিশিষ্ট পার্লামেন্টে ৬২ দশমিক ৩৫ ভাগ ভোট পেয়ে এএনসি এককভাবে সরকার গঠন করতে পারত। কিন্তু ম্যান্ডেলা একটি জাতীয় সরকার গঠন করেছিলেন, যেখানে শ্বেতাঙ্গ ও এএনসি বিরোধী গ্রুপ ইনকাথা ফ্রিডম ম্যুভমেন্টের প্রতিনিধিদের সরকারে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, নির্বাচনে এএনসি পেয়েছিল ২৫৯টি আসন, ক্লার্কের ন্যাশনাল পার্টি ৮২ ও বুথোলেজির ইনকাথা ফ্রিডম ম্যুভমেন্ট ৪৩টি আসন পেয়েছিল। প্রদেশগুলোতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ৭টিতে এএনসি, একটিতে ইনকাথা (কোয়াজুলু-নাটাল) একটিতে ন্যাশনাল পার্টি (কেপ) বিজয়ী হয়েছিল। ম্যান্ডেলা এক টার্মের বেশি ক্ষমতায় থাকেননি। অথচ তিনি থাকতে পারতেন। তার ডেপুটি থাবো এমবেকি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট। ম্যান্ডেলা শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ নেননি। এজন্য সারা বিশ্বে তিনি জনপ্রিয়। তিনি এখন বিশ্বনেতায় পরিণত হয়েছেন। আফ্রিকা ছাড়িয়ে তার গণ্ডি এখন সারা বিশ্বে। আফ্রিকার বিভিন্ন জাতিগত সমস্যার সমাধানে তিনি একাধিকবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতেই দক্ষিণ আফ্রিকার এই বর্ণবাদের অবসান একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. তারেক শামসুর রেহমান, 'বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি', ঢাকা, ১৯৯৯।

২. W.E.B. Du Bois, 'The Souls of Black Folk', New York, 1986.

৩. Leo Marquard, "The People & Politics of South Africa', London, 1952.

৪. Knaus Welt Spiegel, '87, Muenchen', 1988.

৫. Der Fischer Weltalmanch, '99, Frankfurt am Main', 1998.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মধ্যপ্রাচ্য সংকট

So what does this mean, that we want to stop naked [Iraqi] aggression? Does this mean that... the United States will become the policeman of the World?

Senator Tom Harkin, January 11, 1991

বিংশ শতাব্দীর পুরোটা সময় জুড়ে মধ্যপ্রাচ্য সংকট যত বেশি আলোচিত হয়েছে, অন্য কোনো সংকট এত বেশি আলোচিত হয়নি। মধ্যপ্রাচ্য সংকট মূলত কেন্দ্রিভূত ছিল ফিলিস্তিন তথা আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে ইসরাইলের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। এই দ্বন্দ্বের কোনো সুরাহা হয়নি। এমনকি সদ্য শেষ হওয়া অ্যানাপোলিস শীর্ষ সম্মেলন (ডিসেম্বর, ২০০৭) শেষে একটি প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে এই দ্বন্দ্বের কী আদৌ কোনো সমাধান হবে? বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে, অর্থাৎ নব্বইয়ের দশকে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের নতুন একটি মাত্রা যোগ হয়, আর তা হচ্ছে, ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ। বলতে বাধা নেই ফিলিস্তিন-ইসরাইল দ্বন্দ্বের মাত্রা ও গভীরতা অনেক বেশি। অনেকটা এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা তাত্ত্বিকরা, বিশেষ করে অধ্যাপক হানটিংটনের মতো পণ্ডিত তার বিখ্যাত তত্ত্ব 'সভ্যতার দ্বন্দ্ব' উপস্থাপন করেছিলেন। ফিলিস্তিন-ইসরাইল দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে তিন তিনটি যুদ্ধের জন্ম হয়েছে। ওইসব যুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলো হেরে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে চুক্তি করে কোনো কোনো আরব রাষ্ট্র (মিসর) তার হারানো জমি ফেরত পেলেও, আজো মূল সমস্যা অর্থাৎ স্বাধীন একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র এখনও গঠিত হয়নি। এ নিয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে একাধিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও, ফলাফল ছিল শূন্য। প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে ওইসব আলোচনা চলে আসছিল। অ্যানোপোলিস শীর্ষ সম্মেলনের আগে (যেখানে ৪৪টি আরব রাষ্ট্র ও সংস্থা যোগ দিয়েছিল) দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৯৮ সালে সর্বশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

গত ২৩ অক্টোবর ('৯৮) ওয়াশিংটনের অদূরে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনি প্রশাসনের মধ্যে যে 'উই রিভার' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তার রেশ ধরে খোদ ইসরাইলী রাজনীতিতে এক ধরনের পরিবর্তন এসেছিল। কট্টরপন্থী ইহুদিরা ওই চুক্তির বিরোধিতা

করেছিল। ইসরাইলের সংসদে ওই চুক্তিটি অনুমোদিত হলেও, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু আগাম নির্বাচনের প্রস্তাব করেছিলেন। বলা ভালো ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে লিকুদ পার্টির নেতা নেতানিয়াহু সেখানে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছিলেন। সংসদে তার ৬১-৫৯-এর সামান্য ব্যবধানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এরপরই দ্রুত ইসরাইলের রাজনীতিতে পরিবর্তন আসতে থাকে। নেতানিয়ানের পথ ধরে ওলমার্ট এখন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী।

১৯৯৩ সালে ওয়াশিংটনে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি (আরাফাত ও রাবিন) স্বাক্ষরের পর ১৯৯৮ সালের ২৩ অক্টোবর স্বাক্ষরিত 'উই রিভার' চুক্তি ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। উভয় চুক্তিতেই যুক্তরাষ্ট্র একটি পক্ষ হিসেবে স্বাক্ষর করেছিল। বলা যেতে পারে ওয়াশিংটনের উদ্যোগেই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ইসরাইলে বিরোধী লেবার দল উভয় চুক্তি সমর্থন করলেও কট্টরপন্থীরা ফিলিস্তিনিদের সাথে স্বাক্ষরিত কোনো চুক্তিকেই সমর্থন করেনি। তাদের এই বিরোধিতা ও অধিকৃত আরব এলাকা থেকে চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রত্যাহারের অস্বীকৃতির কারণে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়ায় অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। এর আগে গত ১৫ জানুয়ারি ('৯৭) হেবরন শহরে ফিলিস্তিনি শাসন সম্প্রসারণ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে হেবরনের ৮০ ভাগ এলাকা থেকে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। ওই চুক্তিটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইসরাইলে ক্ষমতাসীন সরকার এর আগে এ ধরনের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে আসছিলেন।

১৯৯৩ সালে পিএলও এবং ইসরাইলের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তাতে হেবরন থেকে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়ার কথা ছিল। প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার ফিলিস্তিনি ও প্রায় ৫শ ইহুদির বাস এই হেবরন শহরে। শহরটির হিব্রু নাম হেবরন, আর আরবি নাম হচ্ছে আল খলিল। এটি মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান। ১৯৬৭ সালে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের সময় ইসরাইল জর্ডানের কাছ থেকে শহরটি দখল করে নেয়। হেবরন চুক্তি অনুযায়ী শহরটি ইতোমধ্যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এখনও সমস্যা রয়ে গেছে। বিরোধী দলীয় নেতা নেতানিয়াহু এ ধরনের রাষ্ট্রের বিরোধিতা করছেন। হেবরন চুক্তি করে শান্তির যে সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখন ভেস্তে যেতে বসেছে পূর্ব জেরুজালেমে ইহুদি বসতি স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে। ইসরাইল এখানে ৬ হাজার বসতি নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

শান্তি প্রক্রিয়া বারে বারে বাধাগ্রস্ত হলেও গত ২০ জানুয়ারি ('৯৬) ফিলিস্তিনি স্ব-শাসিত এলাকায় প্রথমবারের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিল স্ব-শাসিত এলাকার প্রেসিডেন্ট আর পার্লামেন্টের নির্বাচন। দশ লাখ ভোটারের মধ্যে শতকরা ৮৮ ভাগেরও বেশি ভোট পেয়ে ফিলিস্তিনির প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন ইয়াসির আরাফাত। আর পার্লামেন্টের ৮৮ আসনের মধ্যে পিএলও'র আরাফাত গ্রুপ আল-ফাতাহ পায় ৫০টি আসন। ২৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীও বিজয়ী হয়েছিল। এরাও আরাফাতের মিত্র ছিল। ওই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে।

নিঃসন্দেহে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ওই নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল অনেক। পরবর্তীকালে স্বশাসিত ফিলিস্তিনি এলাকায় আরো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শান্তি প্রক্রিয়ায় একটি দুঃখজনক সংবাদ ছিল রাবিনের মৃত্যু। তবে ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রাবিনের মৃত্যুও শান্তি প্রক্রিয়ায় কোনো অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়নি। কট্টরপন্থী জনৈক ইহুদি নাগরিকের গুলিতে ১৯৯৫ সালের ৪ নভেম্বর প্রাণ হারিয়েছিলেন রাবিন। কট্টরপন্থী ফিলিস্তিনিরা তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল অনেক আগেই। তাদের হাতে তাঁর মৃত্যু ভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারত ইসরাইলে। কিন্তু একজন স্বজাতির হাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির প্রশ্নে যারা আশাবাদী ছিলেন, তারা স্বাভাবিক কারণেই এ ঘটনায় মর্মাহত হয়েছেন। তাদের কাছে এটা ছিল অস্বাভাবিক ঘটনা। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এমনি একজন, যিনি মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির প্রশ্নে আশাবাদী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। জেরুজালেমে রাষ্ট্রীয় শোক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিল ক্লিনটন প্রমাণ করেছিলেন মার্কিন রাজনীতিতে ইসরাইল কত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, তিনটি প্লেনে করে আমেরিকার রাজনীতির প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যোগ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় শোক অনুষ্ঠানে। শোক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারক, যে দেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত। ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর করে ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং এজন্য ১৯৮১ সালে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল রাবিনের বেলায়।

সাম্প্রতিক সময়ে অনেক পরিবর্তন এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে। চুক্তি হয়েছে একাধিক। কিন্তু মূলপ্রশ্নে এখনও চূড়ান্ত কোনো সমাধান হয়নি। অর্থাৎ ইহুদি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়নি। ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, আজ প্রায় ৬০ বছর পরও সে সংকটের পুরো সমাধান হয়েছে তা বলা যাবে না। ইহুদি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যে বৈরিতা, সেই বৈরিতার পুরোপুরি অবসান হয়নি। উভয় সমাজের কিছু কিছু ব্যক্তি এই বৈরিতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মাঝে মধ্যে উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু সেই উদ্যোগ থেমে গেছে বার বার। ফিলিস্তিনি স্বশাসিত এলাকায় নির্বাচনের আগে মে মাসে ('৯৪) ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরাফাত নিজেকে প্রধান করে একটি কাউন্সিলও গঠন করেছিলেন। মোট ৬২ বর্গ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় গড়ে উঠেছে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের রূপরেখা। মোট ৯ হাজার ফিলিস্তিনি পুলিশ এখন ওই এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকছে। স্বায়ত্তশাসিত চুক্তি অনুযায়ী গাজা ও জেরিকোতে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা, কর, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ও পর্যটনসহ তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পরিচালনার দায়িত্ব এখন ফিলিস্তিনিদের হাতে বর্তিয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পিএলও-ইসরাইল শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সাত ও বাইশ মাস পর এই স্বায়ত্তশাসন চুক্তি দুটি স্বাক্ষরিত হয়। ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসনের মেয়াদ ছিল ৪ বছর। এর পর স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠিত হবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা হয়নি।

সারণি : ১৩

মধ্যপ্রাচ্য : ১৯৪৭-'৯৯

১৯৪৭	জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিনি এলাকা বিভক্তির সিদ্ধান্ত।
১৯৪৮	ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সিরিয়া, মিসর, ফ্রান্স, জর্ডান, লেবানন ও ইরানের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ।
১৯৫৬	মিসর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে ইসরাইল কর্তৃক মিসর আক্রমণ।
১৯৬৭	ইসরাইল কর্তৃক মিসর, সিরিয়া, জর্ডান আক্রমণ ও সিনাই, পশ্চিম তীর, গাজা ও সিরিয়ার গোলান উপত্যকা দখল।
১৯৭৩	অধিকৃত জমি উদ্ধারের ব্যাপারে মিসর ও সিরিয়ার সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে জেনেভা শান্তি আলোচনা শুরু। ইসরাইল, জর্ডান ও মিসরের অংশগ্রহণ। সিরিয়ার বয়কট।
১৯৭৮	ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি। সিনাই থেকে ইসরাইলের প্রত্যাহার। মিসরের সাথে ইসরাইলের কূটনৈতিক সম্পর্ক। ৫ বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা।
১৯৮১	ইসরাইল কর্তৃক ইরাকের পারমাণবিক কেন্দ্রে বোমাবর্ষণ।
১৯৮২	লেবাননে ইসরাইলী হামলা ও পিএলও-কে বাধ্য করা লেবানন ছেড়ে দিতে। অধিকৃত এলাকা ও জর্ডান নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনে রিগ্যানের প্রস্তাব। আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যাখ্যান। ফেজে (মরক্কো) আরব লীগের সম্মেলনে আরব রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক ইসরাইলের স্বীকৃতির প্রস্তাব। শর্ত ইসরাইলকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিতে হবে। ইসরাইল এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।
১৯৮৭	অধিকৃত এলাকায় 'ইন্তিফাদা' বা ফিলিস্তিনি গণঅভ্যুত্থান শুরু।
১৯৮৮	পিএলও'র আলজিয়ার্স সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ ও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা।
১৯৯১	মাদ্রিদে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন শুরু। ইসরাইল, মিসর, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননের অংশগ্রহণ। আরব রাষ্ট্রগুলো ও ইসরাইলের সঙ্গে অনৈক্য। শান্তি প্রচেষ্টায় অনিশ্চয়তা।
১৯৯২	রোম, মরক্কো, ওয়াশিংটনে শান্তি আলোচনা অব্যাহত। ইসরাইলের নির্বাচনে লিকুদ পার্টির পরাজয় ও লেবার পার্টির সরকার গঠন। রাবিন নতুন প্রধানমন্ত্রী। ডিসেম্বরে অধিকৃত আরব এলাকা থেকে ৪১৫ জন ফিলিস্তিনিকে বহিষ্কার। শান্তি প্রচেষ্টায় অনিশ্চয়তা।
১৯৯৩	ওয়াশিংটনে নবম ও দশম রাউন্ড শান্তি আলোচনা শুরু। ১০ সেপ্টেম্বর ইসরাইল ও পিএলও পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি। ১৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে ইসরাইল ও পিএলও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।
১৯৯৪	গাজা ও জেরিকোতে ফিলিস্তিনি শাসন প্রতিষ্ঠা। প্যালেস্টানীদের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠন।
১৯৯৫	পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষর। আততায়ীর হাতে রাবিনের মৃত্যু।
১৯৯৬	স্বশাসিত ফিলিস্তিনি এলাকায় প্রথম নির্বাচন। আরাফাতের প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়। ইসরাইলের নির্বাচনে লিকুদ পার্টির বিজয়। ইসরাইলে নেতানিয়াহুর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্তি।
১৯৯৭	হেবরন চুক্তি স্বাক্ষর। পূর্ব জেরুজালেমে ইহুদি বসতি নিয়ে উত্তেজনা।
১৯৯৮	অক্টোবরে ওয়াশিংটনের অদূরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ও ইসরাইলের মধ্যে 'উই রিভার' চুক্তি স্বাক্ষর। ইসরাইলে নয়া নির্বাচনের ঘোষণা।
১৯৯৯	ইসরাইলে নির্বাচনী তৎপরতা শুরু।

ওয়াশিংটন চুক্তি, ১৯৯৩

ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে ওয়াশিংটন চুক্তি ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ওই শান্তিচুক্তির ফলে ইসরাইল অধিকৃত গাজা ও পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরে সীমিত স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হয়। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইলী সেনাবাহিনী ওই এলাকা দখল করে নিয়েছিল। সেপ্টেম্বর মাস থেকে ইসরাইল ও পিএল'র মধ্যে যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার রেশ ধরে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ওয়াশিংটন শান্তিচুক্তি। এর আগে গত ১০ সেপ্টেম্বর ('৯৩) ইসরাইল ও পিএলও পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়। সেটা ছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। পারস্পরিক স্বীকৃতি ও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে অবসান ঘটেছিল দীর্ঘদিনের বৈরিতার। এক সময় পিএলও'র জাতীয় কাউন্সিলে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলকে ধ্বংস করার যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তাও বাতিল করা হয়েছিল।

ইসরাইল ও পিএলও'র মাঝে শান্তিচুক্তি স্থাপনের ব্যাপারে যিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি, তিনি হচ্ছেন নরওয়ের প্রয়াত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোহান ইয়র্গেন হোলস্ট। দীর্ঘদিন ধরে নরওয়েতে পিএলও ও ইসরাইলের মধ্যে গোপন আলোচনা চলে আসছিল। গোপন আলোচনার ফলেই পিএলও ও ইসরাইল পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়। পিএলও এবং ইসরাইলের মধ্যে স্বাক্ষরিত দলিলটি তিনটি চিঠির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। প্রথম দুটি হচ্ছে, পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত ও ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজাক রাবিনের পরস্পরকে সম্বোধন করে লেখা চিঠি। অবশিষ্ট চিঠিটি হচ্ছে মধ্যস্থতাকারী নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোলস্টকে লেখা ইয়াসির আরাফাতের চিঠি। প্রথম চিঠি লেখেন আরাফাত রাবিনকে ৯ সেপ্টেম্বর (১৯৯৩)। তাতে তিনি ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও দুপক্ষের দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানের অঙ্গিকার করেন। এর জবাব দেন রাবিন ১০ সেপ্টেম্বর। তাতে তিনি পিএলওকে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে নেন ও পিএলও'র সাথে আলোচনা শুরু করার কথা জানান। তৃতীয় চিঠিতে আরাফাত হোলস্টকে সহিংসতা বন্ধের উদ্দেশ্যে পিএলও ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি যে আহ্বান জানানোর পরিকল্পনা করেছে, তার বিবরণ দেন।

ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনসহ সাবেক দুজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট—জিমি কার্টার ও জর্জ বুশ। শান্তিচুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া স্বাক্ষর করে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, ১৯৯১ সালের অক্টোবরে মাদ্রিদে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভের উপস্থিতিতে ও যৌথ সভাপতিত্বে মধ্যপ্রাচ্য শীর্ষক শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছিল। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের উপস্থিতিও বেশ তাৎপর্য বহন করে। কার্টারের উপস্থিতিতেই ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিডে তৎকালীন ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বেগিন ও মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত একটি শক্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। সেই শান্তিচুক্তির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই ওয়াশিংটনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের উপস্থিতিতে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্বকারী পিএলও'র সাথে একটা চুক্তি

স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৮ সালে মিসর ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে হারানো সিনাই এলাকা ফিরে পেয়েছিল। ১৪ বছর পর পিএলও স্বীকৃতি দিয়েছিল ইসরাইলকে। বিনিময়ে ফেরত পেয়েছিল গাজা ও জেরিকো শহর। এটা ছিল নিঃসন্দেহে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ও মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তিস্থাপনের পথে অন্যতম অগ্রযাত্রা হিসেবে এটি চিহ্নিত হয়। কিন্তু আরাফাতের জন্য একটা দুঃখজনক সংবাদ ছিল, তিনি পুরো ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থন নিশ্চিত করতে পারেননি। শান্তিচুক্তির বিরোধিতাকারী হামাস, ফিলিস্তিনি নির্বাচন বয়কট করেছিল। সেই হামাসকে নিয়ে সমস্যা আজো রয়ে গেছে।

'উই রিভার' চুক্তি, ১৯৯৮

'উই রিভার' চুক্তিকে বলা হয় ভূমির বিনিময়ে চুক্তি। দীর্ঘ ১৯ মাসের অচলাবস্থার অবসান করে ১৯৯৮ সালে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও জর্দানের প্রয়াত বাদশা হোসেনও ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে (১) ইসরাইল অধিকৃত আরব এলাকা পশ্চিম তীরের ১৩ শতাংশ এলাকা ফিলিস্তিনিদের হাতে অর্পণ ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এর মাঝে ৩ শতাংশ এলাকা 'সবুজ বেষ্টনী' অথবা সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করবে। ওই সবুজ বেষ্টনীতে বসবাসকারী ইসরাইলীদের নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমনের বিষয়টি ইসরাইলী কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকবে, (২) সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে উভয়পক্ষ সম্মত হয়েছে এবং নিজ নিজ বিচারব্যবস্থা অনুযায়ী সন্ত্রাসীদের বিচার করা হবে এবং ইহুদি ও ফিলিস্তিনিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি দুই সপ্তাহ অন্তর সন্ত্রাস দমনে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করবে, (৩) ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ সকল প্রকার সহিংসতা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একটি ডিক্রি জারি করবে, (৪) 'নিরাপত্তা সহযোগিতা' প্রশ্নে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষক বিনিময়সহ অব্যাহতভাবে উভয়পক্ষ ব্যাপক দ্বি-পাক্ষিক কর্মসূচি গ্রহণ করবে, (৫) পিএলও'র জাতীয় কমিটি এবং ফিলিস্তিনি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল তাদের জাতীয় সনদ থেকে ইসরাইল বিরোধী ধারাগুলো এক্সপাঞ্জ করবে, (৬) গাজা উপত্যকায় একটি 'শিল্প পার্ক' গড়ে তোলা হবে এবং এ এলাকায় একটি বিমানবন্দর তৈরি করা হবে। ওই চুক্তি অনুযায়ী পিএলও জাতীয় কমিটি ইতোমধ্যে তাদের জাতীয় সনদ থেকে ইসরাইল বিরোধী ধারাগুলো এক্সপাঞ্জ করেছে এবং গাজায় প্রথম বিমানবন্দরের উদ্বোধন করা হয়েছে।

পূর্বকথা

মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় একটি ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের জন্মের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ইসরাইলী রাষ্ট্রের জন্মের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বেলেফোর ঘোষণা। ১৯৭১ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. জে. বেলেফো ব্রিটিশ জায়নিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি লর্ড রথসচাইল্ডকে একটি চিঠি দেন। ওই চিঠির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদিদের জন্য একটি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসে এটাই বেলেফোর ঘোষণা নামে পরিচিত। ১৯২২ সালে লীগ অব নেশনস্-এর সভায় ব্রিটেনকে ফিলিস্তিনির

উপর ম্যান্ডেট প্রদান করা হয়। বেলেফোর ঘোষণার পর পরই ইউরোপ-আমেরিকা থেকে ইহুদিরা ব্যাপক হারে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। আর এর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিরা বারে বারে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। তারা দাবি করেছিলেন ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অবসানের। তারা চেয়েছিলেন একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র। কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলো বারে বারে তাদের সে দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত আরব এলাকা বিভক্তির মধ্য দিয়ে যে বৈরিতার জন্ম হয়েছিল, দীর্ঘ ৬০ বছর পরও সে বৈরিতার পুরোপুরি অবসান হয়নি। পশ্চিমা শক্তিগুলো সেদিন জাতিসংঘকে ব্যবহার করে ফিলিস্তিনি এলাকায় গঠন করেছিল ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিসর, জর্ডান, লেবানন ও ইরানের সাথে ইসরাইল যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। সেটা ছিল আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে ইসরাইলের প্রথম যুদ্ধ। পরবর্তীকালে আরব রাষ্ট্রগুলো আরো দুবার ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ওই যুদ্ধের ফলে এক বিরাট আরব এলাকা ইসরাইলীরা দখল করে নেয় এবং ধীরে ধীরে অধিকৃত আরব এলাকায় গড়ে তোলে ইহুদি সাম্রাজ্য। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল দখল করে নিয়েছিল মিসরের সিনাই আর সিরিয়ার গোলান উপত্যকা। পরবর্তীকালে ক্যাম্প ডেভিড (১৯৭৮) চুক্তির বিনিময়ে মিসর সিনাই এলাকা ফিরে পেলেও সিরিয়া তার গোলান উপত্যকা ফিরে পায়নি। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল ফিলিস্তিনি এলাকা গাজা ও পশ্চিম তীর দখল করে নিয়েছিল। একই সাথে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গিয়েছিল পূর্ব জেরুজালেম ও সেখানে অবস্থিত মুসলমানদের পবিত্র স্থান আল-আকসা মসজিদ। ইসরাইল এখন এই এলাকা দাবি করছে তাদের পবিত্র স্থান জুদিয়া ও সামারিয়ার কথা বলে। ইহুদিদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে জুদিয়া ও সামারিয়ার কথা বলা আছে। মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক শান্তি আলোচনার জন্ম ১৯৭৩ সালে জেনেভায়। এই আলোচনার সূত্র ধরেই ক্যাম্প ডেভিডে ১৯৭৮ সালে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেগিন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, যার বিনিময়ে মিসর ফিরে পেয়েছিল সিনাই এলাকা। মিসর তার হারানো জমি ফিরে পেয়েছিল সত্য, কিন্তু দীর্ঘদিন তাকে আরব বিশ্বে একলা চলতে হয়েছিল। এমনকি সাদাতকে তাঁর জীবন দিয়েই এর মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিল। গত ১ নভেম্বর ('৯২) স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ও সাবেক সোভিয়েত নেতা গরবাচেভের উপস্থিতিতে যে শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছিল, তা ছিল মূলত মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক শান্তি আলোচনারই ধারাবাহিকতা।

ইসরাইলের ব্যাপারে আরব রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করলেও ইসরাইল কখনো তার একগুঁয়ে মনোভাব পরিত্যাগ করেনি। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ ও ৩০৮ নং প্রস্তাব অনুযায়ী ইসরাইলের অধিকৃত আরব এলাকা ফিরিয়ে দেবার কথা। কিন্তু ইসরাইল নিরাপত্তা পরিষদের সেই সিদ্ধান্ত কখনো কার্যকর করেনি। অথচ ১৯৯১ সালে ইরাকের ব্যাপারে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য জাতিসংঘের উদ্যোগে সেখানে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়েছিল ও ইরাককে বাধ্য করা হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত মানতে। আর এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিল আমেরিকান প্রশাসন। একই সাথে ইহুদিবাদকে 'বর্ণবাদ' বলে যে সিদ্ধান্ত প্রায় ত্রিশ বছর আগে জাতিসংঘে

গৃহীত হয়েছিল, ১৯৯২ সালে সেই প্রস্তাব বাতিল ঘোষণা করে আমেরিকা প্রশাসন জাতিসংঘে নতুন প্রস্তাব এনেছিল এবং জাতিসংঘে তা গৃহীতও হয়েছিল। অথচ মার্কিন প্রশাসন কখনো ইসরাইলকে বাধ্য করেনি কিংবা জাতিসংঘ ইসরাইলকে বাধ্য করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি আরব এলাকা ফিরিয়ে দিতে। ইসরাইলের ভূমিকার কারণে ফিলিস্তিনিদের মাঝে ইসারাইল বিরোধী জনমত দিনে দিনে বাড়ছিল। ১৯৮৭ সালে ফিলিস্তিনিরা অধিকৃত গাজা ও পশ্চিম তীরে 'ইন্তিফাদা' আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৮ সালে আলজিয়ার্স সম্মেলনে ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্বকারী পিএলও ইসরাইল অধিকৃত গাজা ও পশ্চিম তীরে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিল।

ইতিহাসে আরাফাতের ভূমিকা

ফিলিস্তিনি আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত। ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি প্যারিসে মারা যান। কিন্তু আরাফাত দীর্ঘদিনের শত্রু ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে কিংবা স্বায়ত্তশাসিত ফিলিস্তিনি এলাকা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনিদের ইতিহাসে কিভাবে চিহ্নিত হবেন? একজন 'বিশ্বাসঘাতক' নাকি একজন 'দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক?' আরাফাত নোবেল শান্তি পুরস্কারও পেয়েছিলেন ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাবিন ও পেরেসের সাথে। ফিলিস্তিন সম্প্রদায়ের ভেতরে ও বাইরে আরাফাত ছিলেন অন্যতম আলোচিত ব্যক্তিত্ব। পশ্চিমাবিশ্বে আরাফাতের এই ভূমিকা প্রশংসা কুড়ালেও স্বীকৃতি দিয়ে আরাফাত যে ঝুঁকিপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু সেই সাথে এটাও সত্য মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা করতে হলে, এটা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা ছিল না আরাফাতের সম্মুখে। প্রথমদিকে ইসরাইলকে স্বীকৃতি ও ইসরাইলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সিদ্ধান্ত পি এলও'র মাঝে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আরাফাতের দৃঢ়চেতা মনোভাবের কারণে পিএলও'র নির্বাহী কমিটি শেষপর্যন্ত ওই সিদ্ধান্ত মেনে নেয় এবং আরাফাতের অবস্থানকে সমর্থন করে। এটা আরাফাতের জন্য ছিল একটা বড় ধরনের বিজয়। তাঁর ওই ভূমিকাকে সমর্থন করেছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। তিনি সমর্থন পেয়েছিলেন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে। মডারেট আরব রাষ্ট্রগুলোও তাঁকে সমর্থন করেছিল। তাঁর সিদ্ধান্তকে একটি 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সবাই। কিন্তু আরাফাত, যার পিতৃপ্রদত্ত নাম' আবু আমার, তার একটা বড় দুর্বলতা ছিল পুরো ফিলিস্তি নি আন্দোলনের কাছ থেকে নিরঙ্কুশ সমর্থন না পাওয়া। তাঁর নিজের দল 'ফাতাহ' ভেঙে যায়। 'ফাতাহ'র একটা অংশ, যার নেতৃত্বে রয়েছেন আবু মউসা, তাঁকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি ফিলিস্তিনিদের বিকিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। অন্যদিকে সিরিয়া সমর্থনপুষ্ট আহমেদ জিবরিলের নেতৃত্বাধীন *'পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অফ ফিলিস্তিনি জেনারেল কমান্ড'* ইসরাইলের সাথে যে কোনো 'ঐক্যের' বিরোধিতা করছে। তারা ১০ সেপ্টেম্বরকে (যেদিন ইসরাইল ও পিএলও পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়) ফিলিস্তিনিদের ইতিহাসে একটি 'কৃষ্ণ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। *'ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অফ ফিলিস্তিনি'* -এর নেতা

তেসির খালেদ এবং *'পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অফ ফিলিস্তিনি'*-এর নেতা আবদুল রাজিস মালেডি পিএলও'র নির্বাহী কমিটি থেকে ইসরাইলকে স্বীকৃতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছিলেন। মার্কসিস্ট নেতা প্রয়াত জর্জ হাবাসও ওই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন।

কিন্তু এ ধরনের সিদ্ধান্ত ছাড়া আরাফাতের কাছে আর কী বিকল্প কিছু ছিল? আরাফাত কী পারতেন ইসরাইলের সাথে কোনো সহাবস্থান ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে চিরস্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে? গত ৬০ বছরের ইতিহাস বলে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাবে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে বৈরিতা বেড়েছে, কমেনি। হাজার হাজার ফিলিস্তিনি বছরের পর বছর ধরে অধিকৃত আরব এলাকায় এক ধরনের 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে' বাস করছেন। হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে আজ ইউরোপ তথা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বসবাস করে আসছেন। এদেরকে নিজ বাসভূমে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। সিরিয়ার সাথে গোলান উপত্যকা নিয়েও কোনো সমাধান হয়নি। সিরিয়াকে গোলান উপত্যকা ফিরিয়ে দিয়ে সিরিয়ার সাথে ইসরাইলের একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নিতে হবে। লেবাননের সাথেও একটি শান্তিচুক্তি করা প্রয়োজন।

ইসরাইলের সাথে পিএলও এবং জর্দানের সাথে যে শান্তিচুক্তি হয়েছে, তা ইতোমধ্যে খোদ ইসরাইলেই বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ওই শান্তিচুক্তির ফলে ইসরাইল তাদের অধিকৃত এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার সম্পন্ন করে। যেসব এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে, জেনিন, তুলকার্ম, নাবলুস, কালকিগিয়া, রামাল্লা, বেথেলহেম ও হেবরন। ওইসব এলাকায় ইতোমধ্যে পিএলও তাদের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। সমস্যা রয়েছে জেরুজালেম নিয়ে। এই শহরের বিভক্তি ইসরাইল মেনে নেয়নি। জেরুজালেমকে তারা ধর্মীয়শহর বলে মনে করে এবং ইসরাইলের রাজধানী এখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অন্যদিকে মুসলমানদের পবিত্র ভূমি হচ্ছে জেরুজালেম। এখানে রয়েছে আল আকসা মসজিদ। শান্তিচুক্তিতে এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। জেরুজালেমের প্রশ্নে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে বিভক্তি রয়ে গেছে। সুতরাং ইতিহাসে আরাফাত একদিকে যেমন প্রশংসিত হবেন, অন্যদিকে তেমনি নিন্দিতও হবেন। কেননা ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত করতে পারেননি।

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ

মধ্যপ্রাচ্যের সংকট নিয়ে আলোচনা করলে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। ফিলিস্তিনি সংকটের সাথে এই যুদ্ধ (১৯৯০) সরাসরিভাবে সম্পর্কিত না থাকলেও, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিকে এই যুদ্ধ যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে তেলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরাককে কেন্দ্র করে দুদুটো যুদ্ধ হয়েছে। প্রথম যুদ্ধ ইরাক শুরু করেছে। আর পরের যুদ্ধটি ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে। দুদুটো যুদ্ধের ব্যবধান ছিল তেরো বছর। 'নায়ক' ছিলেন একই ব্যক্তি সাদ্দাম হোসেন। তেল সম্পদ দু দুটো যুদ্ধের কারণ হলেও, প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০) জাতিসংঘ অনুমোদন করেছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি বহুজাতীয় বাহিনী ইরাকের বিরুদ্ধে

ওই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। অন্যদিকে, দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধে (২০০৩) জাতিসংঘের কোনো অনুমোদন ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র একক উদ্যোগে ওই যুদ্ধের সূচনা করলেও, পরবর্তীকালে বহুজাতীয় বাহিনী ওই যুদ্ধে অংশ নেয়। তবে নানা কারণে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই সাদ্দাম হোসেন কুয়েত আক্রমণ করেছিলেন। উপসাগরীয় সংকটের বিস্ফোরনোন্মুখ অবস্থার সৃষ্টি সেখানেই। এই সংকটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন সব থেকে বড় সংকট বললে ভুল বলা হবে না। কোরিয়া বা ভিয়েতনাম যুদ্ধ কিংবা কিউবার 'বে অফ পিগস'-এর ঘটনা, কোনোটার সাথেই তুলনা করা যাবে না, কেননা ওই যুদ্ধ সবগুলো থেকে পৃথক ছিল। জাতিসংঘের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো একটি স্বাধীন সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র নিছক আক্রান্তই হলো না বরং দেশটিকে দখল করে নিজের 'উপগ্রহে' পরিণত করার মতো ঘটনা ঘটল। দুটো প্রধান তেল রপ্তানিকারক দেশ, যাদের নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের ২০ ভাগ তেলভাণ্ডার তাদের মধ্যকার এই সংকট বিশ্ববাণিজ্যকে এক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্র ওই সংকটে কিন্তু বসে থাকেনি বরং কূটনৈতিক সাফল্যকে পুঁজি করে একটা যৌথবাহিনী গঠন করে ইরাকের কুয়েত আক্রমণের যথাযথ সাড়া প্রদান করে। কুয়েতমুক্ত অভিযানের নামকরণ করা হয় প্রথমে 'Desert Shield', পরে 'Desert Storm'। যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরীয় এলাকায় ৬ লাখের মতো সৈন্য মোতায়েন করেছিল। অপারেশন 'ডেজার্ট স্টর্মে' প্রাণহানি অন্য যে কোনো যুদ্ধ থেকে কম ছিল। যেখানে কোরিয়া যুদ্ধে ৪.৫ মিলিয়ন, ভিয়েতনাম যুদ্ধে ২ মিলিয়নের উপর; লেবাননে ২.৫০,০০০; ইরান-ইরাক যুদ্ধে ৫,০০,০০০ লোকের প্রাণহানি ঘটে সেখানে এই যুদ্ধে প্রায় ১,০০,০০০ লোকের প্রাণহানি ঘটে। তবে যুদ্ধোদ্যোগ আর আধুনিক সমরাস্ত্রের ব্যবহারের দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কোরিয়ার পরেই এর অবস্থান ছিল।

নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব অন্য যুদ্ধগুলো থেকে এই যুদ্ধকে সামরিক দিক থেকে পৃথক করেছিল। তিনটি বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করতে পারি। ১. উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকিদের প্রাণহানি যেখানে প্রায় লাখের কাছাকাছি সেখানে যৌথবাহিনীর প্রাণহানি মাত্র কয়েক ডজন। এই যুদ্ধকে অধ্যাপক ফ্রেড হলিডে, ১৯১৪ এর পূর্বেকার ঔপনিবেশিক যুদ্ধগুলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন; ২. এই যুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যুদ্ধের ব্যাপ্তি না বাড়ানো। যেখানে বাগদাদকে যৌথবাহিনী পুরো দখল করতে পারত, সেখানে তা না করে প্রেসিডেন্ট বুশ যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা করেছিলেন; ৩. এই যুদ্ধের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিবেশগত বিপর্যয়। এটা ঠিক যে অন্য যে কোনো যুদ্ধেই পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপকভাবে কৃষিভূমি ও বনভূমি ধ্বংস হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ, ভিয়েতনামে ব্যাপক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে ভয়াবহ ছিল। তবে পার্থক্যটা হলো ইরাকিরা পিছু হটার সময় তেলকূপগুলোতে যে বিস্ফোরণ ঘটায় তাতে সমস্ত উপসাগরে চরম পরিবেশ বিপর্যয় ঘটেছিল এবং এই প্রথম জলচর জীবদের সব থেকে বেশি ক্ষতি সাধিত হয়েছিল।

ইরাক কুয়েত দুটো দেশই অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। অটোমান শাসকরা কুয়েতকে বসরার সাথে সংযুক্ত করেছিল। ১৭৯৬ সালে কেন্দ্রীয় আরব ভূমির দেশত্যাগী লোকেরা ধীরে ধীরে কুয়েতে এসে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করে। পরবর্তীকালে এরা যখন শাসকে পরিণত হয় তখন বসরার অঙ্গরাজ্য হিসেবে থাকতে অস্বীকৃতি জানায়। বসরার অধীনে কুয়েতের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত। এদিকে উপসাগরীয় অঞ্চলে গ্রেট ব্রিটেনের উত্থান ঘটতে শুরু করে। ফলে তুর্কিদের বেশ উপকার হয়। তারা ব্রিটিশদের সহযোগিতায় অটোমানদের দমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ১৯২২ সালে এসে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই চুক্তিতে বলা হয়, অর্ধেক করে কুয়েতি এলাকা সৌদি আরব ও ইরাকের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এর পর ব্রিটিশরা যখন এই এলাকা থেকে চলে যায় তখন কুয়েতকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং ১৯৬৩ সালে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে কুয়েত স্বীকৃতি লাভ করে। এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুয়েতকে ইরাক থেকে পৃথক করার ফলে ইরাকের ভৌগোলিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। কুয়েতের অবস্থানের কারণে উপসাগরে ইরাকের প্রবেশদ্বার শুধু শুরুই হয়নি, উপরন্তু ইরাকের একমাত্র বন্দর 'উম্ম কসর' (Ummqasr) এর ব্যবহার হয়ে ওঠে অসুবিধাজনক। এ কারণে ইরাক কুয়েতকে তার দুটো ছোট দ্বীপ লীজ দেয়ার জন্য দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু কুয়েত তাতে রাজি হয়নি। ইরাকের বারবার নিয়ন্ত্রণ দাবি সত্ত্বেও কুয়েত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে মূলত ব্রিটিশদের সহায়তায়। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো ইরাক-কুয়েত সম্পর্ক কিন্তু সবসময় টানাপোড়েনের মধ্যে ছিল না বরং স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। বিগত ১৯৮০-'৮৮ সালের ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় কুয়েত ইরাককে ১৫ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছিল। অথচ যুদ্ধ শেষে সাদ্দাম হোসেন সবকিছুই ভুলে যান এবং কুয়েত আক্রমণ করে বসেন। সাদ্দামের কুয়েত আক্রমণের অনেকগুলো কারণ ছিল।

প্রথম থেকেই ইরাকের অভিযোগ ছিল কুয়েতের বিরুদ্ধে সীমান্ত প্রশ্নে এবং জন্মের বৈধতা নিয়ে। ১৯৭১ সালে এসে ইরাক কয়েকটি কুয়েতি দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ দাবি করে। আর সেই দাবিকে সামনে রেখেই ইরাক দেশটি দখল করে নিয়েছিল। ইরাকের যুক্তি ছিল ঐতিহাসিকভাবেই ওই অঞ্চলটি (অর্থাৎ কুয়েত) তাদের। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কারসাজিতে দেশটিকে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। কুয়েত স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬১ সালের ১৯ জুলাই। কিন্তু ইরাক কুয়েতের উপর তার অধিকার কখনো ছেড়ে দেয়নি। ১৯৭৯ সালে ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের উত্থান ও ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইরাক একটি কট্টরপন্থি দেশ হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিডে একটি চুক্তির বিনিময়ে মিসর ও ইসরাইল পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু ইরাক ওই চুক্তির বিরোধিতা করে কট্টরপন্থি দেশ হিসেবে আরো বেশি পরিচিতি পায়। এরপর ইরাক ইরানের প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৮০-'৮৮ সাল পর্যন্ত ইরাক ইরানের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে অবিচলভাবে। যুদ্ধের পরে পরেই সাদ্দাম হোসেন দেশ পুনর্গঠনের দিকে নজর দেবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু তা হয়নি। ইরানের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইরাক শুধু জানমালেরই লোকসান দেয়নি, রবং তার অর্থনীতি প্রায় ভেঙে

পড়ার সম্মুখীন হয়েছিল। যুদ্ধের পর ইরাকের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। অর্থনৈতিক দৈন্য, চোরাকারবার ও অপ্রতুল খাদ্য সরবরাহের কারণে দেশের ভেতরে সাদ্দাম হোসেন তার জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন। তাই নিজের সংকট কাটিয়ে ওঠা এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের পুনর্গঠনের জন্য সাদ্দাম মরিয়া হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি বলতে থাকেন তার দেশ আরবদের স্বার্থেই 'আত্মোৎসর্গিকৃত' যুদ্ধ করছে। অথচ আরব ধনী দেশগুলো তখন তার পুনর্গঠনে কোনো সাহায্য দেয়নি। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সাদ্দামের প্রয়োজন ছিল ৩০ বিলিয়ন ডলার। যা তিনি প্রতিবেশী ধনী আরব আমীর ও বাদশাহদের কাছে সাহায্য হিসেবে চেয়েছিলেন। যে কুয়েতকে ইরাক তার অংশ বলে দাবি করছিল, তার প্রাচুর্য ও সম্পদের উপর সাদ্দাম সম্ভবত লোভ সামলাতে পারেননি। ইরাকের ভৌগোলিক অবস্থান কুয়েতের কারণে বেশ সংকটজনক ছিল। বিশাল সীমান্ত জুড়ে বহু তেলক্ষেত্র ছিল। ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে এসে সাদ্দাম হোসেন সীমান্তবর্তী ইরাকি স্থাপনাগুলো থেকে কুয়েতিদের বিরুদ্ধে বিপুল অর্থের তেল চুরির অভিযোগ উত্থাপন করেন। কুয়েতের নিকট সাদ্দাম হোসেন ১৮ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কুয়েত তাতে সম্মত হয়নি।

ইরাক আরো অভিযোগ করে যে, কুয়েত নির্ধারিত ওপেক কোটার অতিরিক্ত তেল উৎপাদন করার ফলে ইরাকের লোকসান হয়েছে ১৪ বিলিয়ন ডলার। কারণ তখন এর ফলে তেলের দাম হ্রাস পায়। ওপেক যদিও তেলের মূল্য ১৮ থেকে বাড়িয়ে ২১ ডলার করতে রাজি ছিল, কিন্তু ইরাকের দাবি ছিল ২৫ ডলার। এসব ব্যাপার নিয়ে দুদেশের মধ্যে প্রাথমিক তৎপরতা ব্যর্থ হলে সৌদি আরব মধ্যস্থতার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়। ঠিক ওই সময় ইরাক কুয়েত সীমান্তে কয়েক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করে। বিশ্লেষকরা তখন মনে করেছিলেন যে হয়তোবা কূটনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য ইরাক এমনটি করছে। ইরাকের অর্থনৈতিক অবস্থা সত্তরের দশকের দিকে বেশ শক্ত অবস্থানে ছিল। কিন্তু দীর্ঘ ৮ বছরের যুদ্ধ তাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। কৃষি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করার পরও কোনো কাজ হচ্ছিল না। এরপর যখন তেলের দাম কমতে শুরু করে তখন পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে।

ওই সময় ইরাকের মধ্যে অনেকগুলো গোষ্ঠী ছিল। বড় অংশ হচ্ছে 'আরব' সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা ছিল জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ। আর কুর্দিরা ছিল ১৫ থেকে ২০ শতাংশ সাদ্দামের জন্য তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল ওই কুর্দিদের নিয়ে– তারা হঠাৎ আলাদা রাষ্ট্রের দাবি করে বসতে পারে। অতীতে সাদ্দাম তাদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে। ফলে কুর্দিরা সাদ্দামের জন্য এক ধরনের হুমকি ছিল। অন্যদিকে, ইরাকে শিয়া-সুন্নি সমস্যাও প্রকট ছিল। শতকরা ৫২ ভাগ লোক ছিল শিয়া, অথচ সরকার ছিল সুন্নি নিয়ন্ত্রিত। ফলে শিয়ারা সুন্নি নিয়ন্ত্রিত সাদ্দাম সরকারের জন্য হুমকি ছিল। এজন্য ইরাকের 'রাবার পার্লামেন্ট' সাদ্দাম হোসেনকে সারা জীবনের জন্য প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছিল। এর ফলে শিয়ারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে শুরু করে, তাদের এ মনোযোগকে অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার জন্য সাদ্দাম কুয়েত আক্রমণ করেছিলেন বলে কারও কারও ধারণা।

যে সময়টা সাদ্দাম হোসেন কুয়েত আক্রমণের জন্য বেছে নিয়েছিলেন, ওই সময়টা তার জন্য অনুকূলে ছিল না। ততদিনে স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান হয়েছিল, বিশেষ করে রুমানিয়াতে স্বৈরশাসক চসেস্কুকে ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রাণ দিতে হয়েছিল। বাকিদের (সিভকভ, হুসাক, হোনেকার) সবাইকে পূর্ব ইউরোপে গণঅভ্যুত্থানের কারণে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। সেখানে শুরু হয় তথাকথিত গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া। এর ঢেউ এসে লাগে আরব বিশ্বেও। আরব বিশ্বে ইরাক ও অন্য কয়েকটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রায়নের ক্ষেত্রে বিতর্ক শুরু হয়। অতীতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও সাদ্দাম হোসেন তাদেরকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি বৈরী আচরণ শুরু করেন। তিনি উপসাগর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান, সাথে আরব রাষ্ট্রগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কটের আহ্বান জানান।

অন্যদিকে ওপেক কোটা থেকে বেশি তেল উৎপাদন করে কুয়েত তেলের দাম কমিয়ে আমেরিকাকে সাহায্য করছে, এই অভিযোগ উপস্থাপিত হয় সাদ্দাম হোসেনের পক্ষ থেকে। তিনি অভিযোগ করেন আমেরিকা ইসরাইলকে লেলিয়ে দিচ্ছে প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে। সাদ্দাম হোসেন কুয়েত আক্রমণ করে দাবি করেন ফিলিস্তিনিকে রক্ষার জন্য তিনি কুয়েতকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

সাদ্দামের কুয়েত আক্রমণের আরও একটি গভীরতর ব্যাখ্যা আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর আচরণবিধি যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে একটা জিনিস দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বে যারা সম্পদ সমৃদ্ধতার কারণে কিছুটা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে, তাদের প্রধান লক্ষ থাকে পরাশক্তির বিপরীতে নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করা। একে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষকরা বলেন Autonomy Assertion। এই Autonomy Assertion-এর অন্যতম পথ হলো সামরিক শক্তি বাড়ানো। সামরিক শক্তির কারণে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে এসব রাষ্ট্র স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি দৃঢ় করার প্রয়াসী হয়। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে গিয়ে কোনো না কোনো সময় ওইসব রাষ্ট্র পরাশক্তিগুলোর সাহায্য পেতে শুরু করে। আমরা এক্ষেত্রে বেশ কিছু উদাহরণ দিতে পারি।

রেজাশাহ পাহলভীর ইরান, ভারত বা লিবিয়ার কথা বলা যেতে পারে। ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট হয়ে তার নিজের অবস্থানকে আরব বিশ্বে সুদৃঢ় করে ফেলেছিল। লিবিয়া আর ভারতের উত্থানে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। আর ইরাকের সামরিক শক্তি হিসেবে আবির্ভাবের পেছনে অবদান ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো পরাশক্তির।

ইরানের সাথে যুদ্ধ করে সুবিধা করে উঠতে পারেননি সাদ্দাম হোসেন, বরং নিজের দেশে বীর রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তার যে ভাবমূর্তি ছিল তার অবনতি ঘটেছিল। ফলে বীরত্ব ধরে রাখার স্ট্র্যাটেজি হিসেবে সাদ্দাম কুয়েত দখল করেছিলেন। তার এই বীরত্বের সম্প্রসারণের জন্য বুদ্ধিমান সাদ্দাম ইসরাইল বিরোধী একটি অবস্থানের কথা উল্লেখ করলে পরিস্থিতি বেশ জমে উঠেছিল। ইসরাইলের দখল করা আরব ভূমিমুক্ত করার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল কুয়েত ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটি।

উপসাগরীয় অঞ্চল ও তেলের রাজনীতি

উপসাগরীয় অঞ্চলের সংকটের উৎস, প্রকৃতি ও পরিণাম বোঝার জন্য ওই-অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ভালোভাবে আলোচনা করা দরকার। মার্কিন ভূখণ্ডের বাইরে বিশ্বের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক এলাকার একটি হলো এই উপসাগরীয় অঞ্চল। বাকি দুটোর একটি হলো এশিয়া প্যাসিফিক জোন অন্যটি পশ্চিম ইউরোপ। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বের প্রধান কারণ হলো তেল সম্পদের প্রাচুর্য। সারা বিশ্বের তেল সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করে আরবরা, এই অঞ্চলের সবকটি দেশের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বিশ্বতালিকার শীর্ষে।

একটা পরিসংখ্যান থেকে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ওপেকভুক্ত সবগুলো দেশের তেল উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ২৩.২ মিলিয়ন ব্যারেল। এর মধ্যে উপসাগরীয় দেশগুলোই উৎপাদন করে ১৪.২ মিলিয়ন ব্যারেল। আরও স্পষ্ট করে বললে ইরাক আর কুয়েতের কাছে রয়েছে বিশ্বের ২০ ভাগ তেলের নিয়ন্ত্রণ। এখান থেকেই অনুমান করা যায় বিশ্বঅর্থনীতিতে পারস্য উপসাগর বিশেষ করে ইরাক ও কুয়েতের ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে যখন এই দুটো দেশের মধ্যে সংকট সৃষ্টি হয় তখন বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর টনক নড়াই স্বাভাবিক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এক্ষেত্রে নজর কাড়ার মতো। কেন যুক্তরাষ্ট্র এত তৎপর ছিল? সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল বহুল প্রচারিত দি ইকোনমিস্ট। ১২ জানুয়ারি '৯১ ইকোনমিস্ট কোনো রাখঢাক না রেখেই যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তুলে ধরেছিল। ইকোনমিস্ট লিখেছিল, যুক্তরাষ্ট্র একটি শব্দ Oil ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। যুদ্ধে যত লোকই মারা যাক, তবু এই যুদ্ধে নামতেই হবে। কারণ সাদ্দাম হোসেনকে সম্মানজনকভাবে পশ্চাদপসারণের সুযোগ দেয়ার অর্থ হচ্ছে এ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের সুযোগ হাতছাড়া করা। আর এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণের অর্থই হচ্ছে তেলের উপর নিয়ন্ত্রণ, যার উপর নির্ভর করে আছে পশ্চিমা দুনিয়া।

উপসাগরের তেলের ইতিহাসটা এখানে ছোট করে বলে রাখা দরকার। ১৯৩২ সালে সৌদি আরবে প্রথমে একটি তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এই অঞ্চলে আরো তেলের সম্ভাবনা লক্ষ করে পশ্চিমা তেল কোম্পানিগুলো এই অঞ্চলের উপর নজর দিতে শুরু করে। পূর্বে কখনও এই-এলাকাটা তত বেশি গুরুত্ব পায়নি। পশ্চিমা বণিকের দল পূর্ব হতে প্রাচ্যের দেশসমূহে বাণিজ্য করতে আসতেন। কিন্তু এই মরুভূমি সর্বস্ব তাৎপর্যহীন এলাকাটিকে পশ্চিমেও নয় প্রাচ্যেও নয় বরং প্রাচ্যের পথে যেতে পড়ে বিধায় সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্য নাম দেয়া হয়। ত্রিশ দশকের শেষের দিক থেকে ক্রমাগত বিশাল তেল ভাণ্ডারসমূহের আবিষ্কার এই অঞ্চলকে কেবল দিগন্ত উন্মোচনকারী এলাকা হিসেবেই পাশ্চাত্যের ধনশালী দেশসমূহের কাছে গণ্য করেনি, উপরন্তু ওই সময় পৃথিবীর প্রধান তেল বাণিজ্য আমেরিকা থেকে আরব ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হয়। কেবল সৌদি আরবই নয় অচিরেই পশ্চিমে লিবিয়া থেকে পূর্বে ইরান পর্যন্ত বিশাল ভূ-খণ্ডে পারস্য উপসাগর বরাবর এলাকায় তেলের বিশাল ভাণ্ডার আবিষ্কার এই এলাকাকে বিশ্বের নব্যশক্তিতে পরিণত করে। কেবল তাই নয় এই নব্য তেল শক্তি বিশ্বের আর্থসামাজিক ও

রাজনৈতিক পরিসরে তার প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের একচ্ছত্র আধিপত্যকে বিঘ্নিত করে। মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশসমূহের ক্রমাগতভাবে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর নির্ভরশীলতা এই এলাকার তেলকে তাদের বিশ্ববাণিজ্যের রক্ষাকবচ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

বিশ্বে তেল মজুদের দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্য এগিয়ে রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের ভূগর্ভে রয়েছে বিশ্বের মোট মজুদের ৫৫ শতাংশ। মধ্যপ্রাচ্যের যে কটি দেশ এই তেল সম্পদের মালিক তারা হচ্ছে :

সারণি : ১৪

বিশ্বে তেলের মজুদ

দেশের নাম	*তেলের মজুদ*	*বিলিয়ন ব্যারেল*
সৌদি আরব	২৫৯	(২৪%)
ইরাক	১১৩	(১১%)
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৯৮	(৯%)
ইরান	৯০	(৯%)
কুয়েত	৯৪	(৯%)
ভেনিজুয়েলা	৭৩	(৭%)
মেক্সিকো	৪৮	(৫%)
রাশিয়া	৪৮	(৫%)
যুক্তরাষ্ট্র	২৩	(২%)

* ব্রাকেটে বিশ্বের রিজার্ভের কত অংশ তা দেখানো হয়েছে।

সূত্র : তারেক শামসুর রেহমান, ইরাক যুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ঢাকা, ২০০৪

তেল মজুদের এই পরিমাণ থেকে উপসাগরের গুরুত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

ইরাক কুয়েত দখল করে ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসের ২ তারিখে। ওই সময় তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৪০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত উঠে যায়। এ ধরনের ঘটনা এর আগে ঘটেছিল শুধু ১৯৭৯-'৮১ সালের ইরানের ইসলামি বিপ্লবের সময়। এমতাবস্থায় তেলের বাজারে ইরাক আর ইরানের স্পষ্ট আধিপত্য ফুটে উঠেছিল। ইরাক কুয়েত দখল করে নেয়ায় বিশ্বের শতকরা ২০ ভাগ তেল নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে।

ইরানি বিপ্লবের পর থেকে তেলের মূল্য কেবল কমেছে, এমনকি ব্যারেল প্রতি এক সময় আট ডলার পর্যন্ত নেমে এসেছিল। দেখা গেছে এর প্রধান কারণ ছিল মার্কিন ও পশ্চিমা স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সৌদি আরব, কুয়েত ও আরব আমিরাত পশ্চিমাদের স্বার্থে বিপুলভাবে তেলের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। এই দেশগুলো ওপেকের সদস্য। পাশাপাশি ওপেক বহির্ভূত দেশগুলো যেমন, যুক্তরাজ্য, মিসর, মালয়েশিয়া ও মেক্সিকোও তেলের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। 'এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো অবস্থা'। একদিকে তেলের বাজারে ইরাক আর ইরানের আধিপত্যকে কমিয়ে দেয়া হয় অন্যদিকে ওপেকের রপ্তানির শেয়ার দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ব্যারেল থেকে ১৮ মিলিয়ন ব্যারেলে নামানো হয়। পশ্চিমারা আরবদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মজা লুটতে থাকে। ওদিকে সৌদি আরব ও মেক্সিকোতে

উৎপাদিত বাড়তি তেল যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে কিনে নেয়। মার্কিন স্বার্থের প্রতি সৌদিদের এটি একটি স্বাভাবিক নমুনামাত্র। এই বাড়তি তেল দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র একটি 'আপৎকালীন মজুদ' সৃষ্টি করে। এই মজুদের পরিমাণ ছিল ৫০০ মিলিয়ন ব্যারেল। আরো আছে ওপেক নামক সংঘের দেশগুলো তেল ও জ্বালানি সংকট মোকাবিলার জন্য আই.এফ.এ. নামে একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করে। সেই প্রতিষ্ঠানের নামেও ৫০০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল জরুরি অবস্থার জন্য মজুদ রাখা হয়। এই আপৎকালীন তেল সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল দুটো ১. তেলের দামের ওঠানামা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ও ২. আরবদের যদি বাগে রাখা না যায় তাহলে সামরিক অভিযান চালালে যেন তেলের সাময়িক ঘাটতি মোকাবেলা করা সম্ভব হয় তা নিশ্চিত করা। মার্কিনীরা এই অর্থনৈতিক ও সামরিক উদ্দেশ্যে তেলের মজুদের নাম দেয় Strategic Reserve নামে। ওইসিডি (OECD) ভুক্ত ধনী দেশগুলোর স্বার্থে ও নিরাপত্তায় যেন আঘাত না লাগে সেটা মোকাবেলা করার জন্যই গড়ে তোলা হয়েছিল এই হাজার ব্যারেলের মজুদ ভাণ্ডার।

তেল নিয়ে এই রাজনীতি এই অঞ্চলের জন্য নতুন বিষয় নয়। এই প্রেক্ষাপটে 'সাত বোন' কোম্পানির প্রসঙ্গ চলে আসে। আরব বিশ্বে যখন তেল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হতে থাকে তখন বিশ্বের বাঘা বাঘা তেল কোম্পানিগুলোর নজর পড়ে এই এলাকার উপর। মূলত, এই অঞ্চলে যে তেল সম্পদের আবির্ভাব তার পেছনে রয়েছে ওই তেল কোম্পানিগুলোর অবদান। তেল সম্পদের আবিষ্কার ও উৎপাদক হিসেবে এসব তেল কোম্পানি এই এলাকায় যেমন আধিপত্য বিস্তার করে, তেমনি এই এলাকার দেশসমূহও এদের উপর আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তির কারণে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ কোম্পানিগুলো হলো–

শেল, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, এক্সোন, মবিল, টেক্সাকো, শেভরন এবং গালফ। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে তথা বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করা এই কোম্পানিগুলোর নাম দেয়া হয় 'সেভেন সিসটারস্'। 'সেভেন সিসটারস' নামে পরিচিত এই কোম্পানিগুলোর মধ্যে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম ও শেল ছাড়া বাকি ৫টি কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের।

মধ্যপ্রাচ্যে এই কোম্পানিগুলো এত বিশাল সম্পদ ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে যা অকল্পনীয়। এদের সম্পদের বহর আর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিশালতা আশ্চর্যজনক। এদের এক একটির বাৎসরিক আয় তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেরই বাৎসরিক আয় অপেক্ষা বেশি। এদের প্রশাসনিক কাঠামো পৃথিবীর অনেক দেশের সরকারের প্রশাসনের চেয়েও জটিল, বৃহৎ ও ব্যাপক। এদের নিয়ন্ত্রিত তেল সম্পদের পরিমাণ ও কার্যক্রম বিশ্বের যে কোনো ব্যবসাকে খাটো করে দেয়। এদের নিজস্ব নৌবহর অনেক দেশের নৌবহরের চেয়ে শক্তিশালী। এরা নতুন জীবনের স্পন্দন জাগানোর ক্ষমতা রাখে মরুভূমিতে শহর পত্তনের মাধ্যমে।

এসব কারণে এই তেল কোম্পানিগুলো নির্দিষ্ট দেশের স্বার্থও রক্ষা করে থাকে। কোম্পানিগুলো কোনো জায়গায় কোনো রকম প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলে তারা সরকার পরিবর্তন করতে পর্যন্ত বাধ্য হয়। তেল নিয়ে রাজনীতিই মধ্যপ্রাচ্যের সব থেকে বড় এই

সংকটের অন্যতম কারণ ছিল। তেলের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্যই মরিয়া একপক্ষে ছিল ইরাক অন্যপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর এর থেকেই সূত্রপাত উপসাগরীয় যুদ্ধের।

অপারেশন 'ডেজার্ট স্টর্ম'

১৯৯১ সালের ১৫ জানুয়ারি বেলা এগারটার দিকে ওভাল অফিসে জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক শীর্ষ স্থানীয় উপদেষ্টাদের সঙ্গে এক বৈঠক করার পর প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরাকে হামলা চালানোর নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করেন। ওইদিন বিকেলে ডিক চেনী প্রেসিডেন্টের নির্দেশনামা বাস্তবায়িত করার আদেশনামায় স্বাক্ষর করেন। পরদিন অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি বুশ পররাষ্ট্রসচিব বেকার ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, মিত্রদেশগুলোর রাষ্ট্রদূত ও অন্যদের জানিয়ে দেন যে ওইদিন রাতেই ইরাকের ওপর হামলা চালানো হবে। হামলা শুরুর এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত ছিল। মস্কো শেষ চেষ্টার জন্য ওয়াশিংটনের কাছে সময় চাইলেও যুদ্ধ বন্ধ করা যায়নি।

১৭ জানুয়ারি প্রথম প্রহরে ইরাকের লক্ষ্যবস্তুতে 'টমহক' ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবাহিনী উপসাগরীয় সংকটের শেষযাত্রায় শরিক হয়। অপারেশন 'ডেজার্ট স্টর্ম' শুরুর আগের সপ্তাহের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল বেশ লক্ষণীয়। জাতিসংঘ মহাসচিব পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিষ্ফল জেনেও শেষ মুহূর্তে ছুটে গিয়েছিলেন বাগদাদে। সাদ্দাম হোসেন সম্ভবত কুয়েত থেকে এভাবে সরে আসার থেকে যুদ্ধ করাটাই বড় মনে করছিলেন। তাই অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে ১৫ জানুয়ারি তিনি নিজের হাতে যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্বভার তুলে নেন। অন্যদিকে, বুশও পেন্টাগনকে ইরাক আক্রমণের কথা জানিয়ে দেন। তবে সম্ভবত বিমান আক্রমণ রাতে সুবিধাজনক হবে ভেবে আক্রমণ কয়েক ঘণ্টা বিলম্বে ১৭ জানুয়ারি প্রথম প্রহরে শুরু হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রজোটের ওই যুদ্ধ ছিল 'গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা' রক্ষার জন্য। মার্কিন সমর বিশেষজ্ঞরা প্রাথমিকভাবে অপারেশন 'ডেজার্ট স্টর্মের' স্থায়িত্বকাল ৪৮ঘণ্টা বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের তৃতীয় দিনে ইরাকের পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও বিমানবাহিনীর সাহায্যে আক্রমণ প্রতিহত করার প্রেক্ষাপটে এর স্থায়িত্বকাল সপ্তাহ বলে জানিয়ে দেন। ওই সংবাদে মার্কিন জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব লক্ষ করা গিয়েছিল।

একটা ছোট্ট পরিসংখ্যান দিলে বোঝা যাবে কত ব্যাপক আকারে ইরাকের ওপর বোমা হামলা চালানো হয়েছিল। প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৭-২৫ জানুয়ারি, সময়সীমায় মোট বিমান হামলা চলে ১৪,৪০০ বার। গড়ে প্রতিদিন বোমাবর্ষণ করা হয় ১৮,০০০ টন যা হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার সমান। এই বিরাট বহরের আক্রমণ চালাতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ মিত্রজোটের বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। তারপরও প্রেসিডেন্ট বুশ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সব থেকে কম অর্থ ব্যয়ের যুদ্ধ। যুদ্ধে প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ৬৮ বিলিয়ন ডলার। এই অর্থ দেবে কুয়েত ১৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, জাপান ১১ বিলিয়ন ডলার, জার্মানি ৫.৫ বিলিয়ন ডলার, সৌদি আরব ৩৩ বিলিয়ন ডলার; যুক্তরাষ্ট্র ০৫ বিলিয়ন ডলার। যদিও অনুমানের তুলনায় যুদ্ধ কিছুটা বিলম্বিত হওয়ার কারণে আরও বেশি কিছু অতিরিক্ত অর্থ যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যয়

করতে হয়েছিল। এর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ছিল ৩.১ ট্রিলিয়ন ডলার, কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিনীদের ব্যয় ছিল ২শ ৬৫ বিলিয়ন ডলার, সেই তুলনায় উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল নিতান্তই সামান্য। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওই স্বল্প (!) ব্যয়ের জন্য জনগণকে কোনোরকম কর দিতে হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তার আসল উদ্দেশ্য এর মধ্যেই বোঝা যায়। অর্থাৎ বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় হবে অথচ জনগণকে তার 'খেসারত' দিতে হবে না, সেটা ছিল অকল্পনীয়।

অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মে মার্কিন কূটনীতির সাফল্যের কোনো তুলনা হয় না। ওয়াশিংটন সমস্ত পশ্চিমাদেশগুলোর সমর্থন লাভে সমর্থ হয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ইরাকের পরীক্ষিত বন্ধু, কিন্তু কুয়েত আক্রমণের দায়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরাকের উপর নাখোশ হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধে সরাসরি সৈন্য পাঠিয়ে সমর্থন দিয়েছিল তা সারণি ১৫ থেকে বোঝা যাবে।

সারণি : ১৫

উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশ নেয়া বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনী

যুক্তরাষ্ট্র	৩,৫০,০০০
সৌদি আরব	৪৫,০০০
মিসর	৩৮,৫০০
ব্রিটেন	৩২,০০০
সিরিয়া	২১,০০০
পাকিস্তান	১১,০০০
উপসাগর সহযোগী কাউন্সিল	১০,০০০
বাংলাদেশ	২,০০০
মরক্কো	১,৭০০
নাইজার	৫০০
চেকোশ্লোভাকিয়া	২০০

বলা যেতে পারে, উপসাগরীয় যুদ্ধ ছিল একটি দেশের বিরুদ্ধে বহুজাতির যুদ্ধ। অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম-এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করতে পারি।

১. আরব দেশগুলোর সেনাবাহিনী এই প্রথম সক্রিয়ভাবে একত্রে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে; ২. আরব দেশগুলোর মধ্যে বিভক্তি আরও প্রকট হয়ে ওঠে এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে; ৩. এই প্রথমবারের মতো এই অঞ্চলে মার্কিনীরা এত বড় আকারের ভূমিকা পালন করে। এর আগে তারা দুটো ছোট আকারের ভূমিকা রেখেছিল লেবাননে ১৯৫৮ সালে এবং ১৯৮২-৮৩ সালে; ৪. এই প্রথমবার আঞ্চলিক আর বহিঃশক্তি একত্রে যুদ্ধ করে, যেটা কিনা অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় দেখা গিয়েছিল; ৫. ব্রিটেন ও ফ্রান্স একত্রে যুদ্ধে অংশ নেয়, যেটা সচরাচর পরিলক্ষিত হয়নি; ৬. অতীতে সাদ্দাম হোসেন মূলত আশা করেছিলেন 'প্যান আরব' বা 'প্যান ইসলামিক' একটা অনুভূতি আরব সরকারগুলোর মধ্যে তৈরি হবে কিন্তু সেটা হয়নি; ৭. যুদ্ধের আগে, এমনকি পরে জোটবদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সহজ ছিল না। জোটের অন্তর্ভুক্ত অনেক আরব বা

অনারব দেশেরই অনেক রকম সমস্যা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ সেই পরিস্থিতিকে বদলে দেয়। উপসাগরীয় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইরাককে যুক্তরাষ্ট্র যে 'শাস্তি, দিয়েছিল, তা সমস্যার কোনো সমাধান বয়ে আনতে পারেনি। তার বড় প্রমাণ ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে পুনরায় ইরাক আক্রমণ করে ও দেশটি দখল করে নেয়। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ সূচনা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়ার জর্জ বুশ, আর ২০০৩ সালে দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু করেন তাঁর ছেলে জর্জ বুশ।

ইরাক যুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা সামনে চলে এসেছিল। জাতিসংঘের ইতিহাসে এ ধরনের সংকট এই প্রথম নয়। তারপরও এটা অনেক দিক থেকে ছিল অদ্বিতীয়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৬৭৮ নং প্রস্তাব অনুযায়ী ওই সংকটের সমাধানের চেষ্টা করা হয়। ওই প্রস্তাবের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল: (১) ইরাককে কুয়েত থেকে হটানো; (২) শান্তির কোনো শর্তাবলি দেয়া হয়নি; (৩) জাতিসংঘকে কোনো প্রকার যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। ইরাকের কুয়েত দখলের পর পরই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা বারবার রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছেন, কিন্তু তারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। তারপরও যুদ্ধ শুরু হয়। শেষপর্যন্ত মস্কোর প্রস্তাবে ইরাক কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে রাজি হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ইরাক কেন হারল?

ইরাক কেন পরাজিত হলো

পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম সেনাবাহিনী এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও, ইরাক কেন যুদ্ধে হেরে গেল, এ ব্যাপারে সমরবিশারদরা বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। সাদ্দামের হেরে যাওয়ার কারণগুলো ছিল মোটামুটি এরকম ১. সবচেয়ে বড় ভুল ছিল কুয়েত দখল করার পর সৌদি সীমান্তে থেমে যাওয়া। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ইরাক যদি সৌদি আরবের দাহরান এবং দাম্মাম পোর্ট দখল করে নিত এবং সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় তেলক্ষেত্রগুলো অধিকার করতে পারত তাহলে মিত্রবাহিনী এত বিশাল সমরসজ্জা করতে পারত না। তাছাড়া তেলের এত বেশি ভাণ্ডার তার নিয়ন্ত্রণে চলে যেত যে শক্তি প্রয়োগের চিন্তা করাটাই তখন কঠিন হয়ে দাঁড়াত; ২. সাদ্দাম হোসেন কুয়েতের প্রতিরক্ষা নিয়েই শুধু ব্যস্ত ছিলেন। দক্ষিণ ইরাকের প্রতিরক্ষা নিয়ে তিনি চিন্তাও করেননি; ৩. সাদ্দাম হোসেনের মার্কিন প্রশাসন সম্পর্কে ধারণা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। আমেরিকান সৈন্যদের সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না; ৪. নিজের অস্ত্রপাতির উপর সাদ্দামের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনি তাঁর স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র, সোভিয়েত ট্যাংক, ফরাসি মিরেজ বিমান নিয়ে গর্বিত ছিলেন। কিন্তু ওই যুদ্ধের ফলে তাঁর সেই গর্ব চূর্ণ হয়ে যায়; ৫. নয়াপ্রযুক্তি মুর্হুমুহু টমহকের গর্জন, ক্রুজ মিসাইলের অগ্নি স্কুলিঙ্গ বাগদাদকে বিহ্বল করে দিয়েছিল; ৬. ইরাকের রাসায়নিক অস্ত্র রহস্যজনক কারণে ব্যবহার করা হয়নি। কুয়েতে অনেক রাসায়নিক অস্ত্রের শেল পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তা ছোড়া হয়নি। পরবর্তীকালে ইরাকে অস্ত্র পরিদর্শক দলকে পাঠিয়েও কোনো রকম রাসায়নিক অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ৪৩ দিনের সেই যুদ্ধে ইরাক তার পুরো সামরিক শক্তির ৪৫ ভাগ হারিয়ে পর্যুদস্ত ও পরাজিত হয় শোচনীয়ভাবে। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পরও উত্তেজনা

সেখানে ছিল। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক ইরাকের উপর 'চাপ' প্রয়োগ করতে থাকে। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসেও ইরাকের সামরিক স্থাপনার উপর যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবোমাবর্ষণ করে। এর আগে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে একাধিকবার ইরাকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছিল। তখন অভিযোগ ছিল ইরাক জাতিসংঘের অস্ত্র-পরিদর্শকদের সব জায়গায় অস্ত্র অনুসন্ধানের অনুমতি দিচ্ছে না। ইরাক জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে এই অভিযোগ তখন উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরাকের সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছিল যখন ইরাক সরকার জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের ইরাক থেকে বিতাড়ন করে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচণায় জাতিসংঘ ইরাকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে এবং পরে যুক্তরাষ্ট্র ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ করে।

মূল্যায়ন

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ এমন একটা পরিস্থিতিতে হয়েছিল যখন ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে। সমগ্র আরব বিশ্বের একনায়ক শাসকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তখন যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছিল। ইরাক সেই সময় কুয়েত আক্রমণ করে যুদ্ধের আবহকে আরো উস্কে দিয়েছিল। যদিও ইরাক আক্রমণকে সবকিছুর 'সমাধান' বলা যাবে না এবং সেটাই প্রমাণিত হয়েছিল ২০০৩ সালে এসে ইরাকের উপর আবার আক্রমণের মধ্য দিয়ে। একটা জিনিস পরিষ্কার যে সেই সময় ইরাক আক্রমণের পেছনে আমেরিকার কূটনৈতিক সাফল্য ছিল অতুলনীয়। অথচ ২০০৩ সালে এসে সেটা পুরোপুরি ব্যর্থ হয় এবং মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও রুখে দাঁড়ানোর সুযোগ দেখিয়েছে ফ্রান্স ও রাশিয়া। চীন থেকেছে নিরপেক্ষ। যদিও রাশিয়া সবসময় তার মার্কিন বিরোধী নীতি দেখিয়ে আসছে। ইরাক কর্তৃক কুয়েত আগ্রাসন কখনোই সমর্থনযোগ্য ছিল না। যে কারণে একটি স্বাধীন দেশ কুয়েত থেকে আগ্রাসী ইরাককে উৎখাত করা প্রয়োজন ছিল। আর তাই প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধকে 'ন্যায়সঙ্গত' বলা যায়। কেননা ওই যুদ্ধের ব্যাপারে জাতিসংঘের অনুমোদন ছিল। ওই সময় ওই যুদ্ধ যদি 'পরিচালিত' না হতো, তাহলে ইরাকের মতো আরো অনেক আগ্রাসী শক্তির জন্ম হতো, যারা আন্তর্জাতিক আইন তথা বিশ্বব্যবস্থাকে একটা ঝুঁকির মাঝে ঠেলে দিত। তবে বলাই বাহুল্য, ২০০৩ সালের যুদ্ধের সাথে ১৯৯১ সালের প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধকে মেলানো যাবে না। উভয় যুদ্ধের 'নায়ক' সাদ্দাম হোসেন হলেও, প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

1. Helen E. Purkitt (ed.) World Politics 97/98. New York, 1997
2. John T. Rourke and Mark A. Boyer. International Politics on the World Stage. New York, 1996
3. Alvin Z. Rubinstein, America's National Interest in a Post-Cold War World Issues and Dilemmas, New York. 1994

চতুর্দশ অধ্যায়

চীনের সংস্কার কর্মসূচি

The need be no wars between China and the U.S., no catastrophes, no economic competition that gets out of hand. But in this century the relative power of the U.S. is going to decline, and that of China is going to rise. That cake was backed long ago.

Michael Elliott
(The Chinese Century, Time, January 22, 2007)

চীনের সংস্কার প্রক্রিয়া নানা কারণে এখন উত্তরোত্তর মনোযোগের দাবি জানাচ্ছে। ১৯৭৬ সালে চীনে মাও জে ডং-এর মৃত্যুর পর বেশ কিছু সময় এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ওই সময় চীনে তথাকথিত 'চার কু-চক্রীর' উত্থান চীনকে বড় ধরনের একটি বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৭-৮০ সময়সীমায় চীনে দেং জিয়াও পিং-এর উত্থান ও ৮০'-র দশকে দেং তার সংস্কার কর্মসূচি ঘোষণার পর চীন বদলে যেতে থাকে। এ কারণেই বিংশ শতাব্দীতে চীনের উত্থান যেমন ছিল একটি বড় ধরনের ঘটনা, ঠিক তেমনি সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে সংস্কার কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন চীনকে বিশ্বরাজনীতিতে একটি গ্রহণযোগ্য শক্তিতে পরিণত করেছে। একুশ শতকে চীন তাই অন্যতম একটি শক্তি। এখানে বলা ভালো, যেখানে বিভিন্ন সংস্কার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পূর্ব ইউরোপের সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে বিরাজ করছে চরম সংকটময় পরিস্থিতি, তখন চীন আবির্ভূত হয়েছে পৃথিবীর সবচাইতে দ্রুত প্রবৃদ্ধিশালী একটি দেশ হিসেবে। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি নব্যশিল্প উন্নতদেশের পাশাপাশি উচ্চারিত হচ্ছে চীনের নাম। মাও জে ডং উত্তর চীনের সংস্কার প্রক্রিয়ার গতিশীলতা দেখে বিশ্বব্যাংক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল "এই শতাব্দীর (বিংশ শতাব্দীর) শেষ দিকে পৃথিবীর অন্যতম অর্থনৈতিক পরাশক্তি অত্যাসন্ন।" চীন হচ্ছে সেই অর্থনৈতিক পরাশক্তি। চীন একবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে 'পঞ্চম ড্রাগন' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। চীনের সংস্কার প্রক্রিয়ায় উত্তরোত্তর মনোযোগের আরেকটি কারণ নিহিত রয়েছে সমাজতন্ত্র বিষয়ক মতাদর্শগত

এই বিতর্কের সাথে জড়িয়ে গেছেন অনেকেই– বামপন্থী দলগুলো হতে শুরু করে গবেষকরাও, যারা চীনের সমাজতন্ত্রকে পুরোপুরি অস্বীকার করে পুঁজিবাদী ভাবাদর্শকে পরম নিয়তি বলে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। তাদের কাছে পূর্ব ইউরোপে প্রথাগত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর অস্বস্তিকর কাঁটার মতো বিঁধে আছে চীন। তারপরও চীন টিকে আছে এবং উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে কী করে, এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তাদের অনেকের মধ্যেই। চীনে বিগত কয়েক দশকে যে সব সংস্কার হয়েছে, সেই সব সংস্কার কতটা সমাজতান্ত্রিক? এই সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চীন কী শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রের আদর্শ হতে সরে দাঁড়াচ্ছে? অধিকতর বাজার অর্থনীতি তথা বাজারমুখী নীতি কী চীনকে অবধারিতভাবে প্রাইভেটাইজেশন ও ব্যক্তি পুঁজিবাদের দিকে ঠেলে দেবে? এর ফলে আগামীতে কী ঘটতে পারে, এই বিষয়সমূহ আলোচনার দাবি রাখে।

প্রাক্ সংস্কার পর্বের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক

চীনের সংস্কার প্রক্রিয়ার আলোচনার প্রথমেই প্রাক্ সংস্কার পর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে-দু একটা জরুরি কথা সেরে নেয়া দরকার। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে সংস্কার প্রক্রিয়া যখন ১৯৮৫ সালে শুরু হয়, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতিতে স্থবিরতা বিরাজ করছিল। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার নেমে গিয়েছিল শূন্যের কোঠায়। চীনে ১৯৭৮ সালে যখন সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন তার পিছনে গুরুতর 'ম্যাক্রো ইকোনমি'র কোনো সংকট ক্রিয়াশীল ছিল না। রাজস্ব ও বহির্বাণিজ্য খাতে সামঞ্জস্য মোটামুটিভাবে বজায় ছিল এবং অর্থনীতিতে জাতীয় সঞ্চয়ের হার ছিল বেশ উঁচুতে। চীনে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনের কারণ ছিল দুটি। প্রথমত, চীনের অর্থনীতিতে যে স্থবিরতা এসেছিল, তা কাটিয়ে উঠে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনা ও অর্থনীতিকে বিশ্বের কাতারে নিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়ত, চীনা জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন। আর সংস্কার আনতে গিয়েই সেখানে অর্থনীতির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করা হয়েছিল, ব্যক্তিগত খাত সৃষ্টি করা হয়েছিল ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল।

১৯৪৯ সালে মাও জে ডং-এর নেতৃত্বে চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবের শুরুতেই চীন ছিল পশ্চাৎপদ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিই ছিল চীনের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস। ১৯৫২ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ওই সময় জাতীয় আয়ে শিল্পের গুরুত্ব ছিল মাত্র ২০ শতাংশ। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে অর্থে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি হিসেবে একদা পরিচিত ছিল, সে অর্থে চীনে কখনোই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অর্থনীতি চালু করা হয়নি। তাই চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-উত্তর দুই দশকে চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মোটেই আশানুরূপ ছিল না। চীনের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ছিল। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য থেকে কোনো কিছু সঞ্চয় করতে পারত না। অবকাঠামো ছিল দুর্বল। আর কোনো বিদেশি বিনিয়োগ ছিল না। ওই সময়ের চীনের চাইতে ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলও ছিল উন্নত। তাই সংস্কারটা ছিল অনিবার্য। সমাজতন্ত্রের নামে সেখানে দারিদ্র্য বেড়েছিল। আর গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল নিম্নমানের।

চীনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দেং জিয়াও পিং-এর আবির্ভাব

দেং জিয়াও পিং একজন আধুনিকমনস্ক সমাজতান্ত্রিক নেতা ছিলেন। তিনি সর্বদা বুদ্ধিভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মাও জে ডং-এর শাসনামলে সমাজতন্ত্রকে আরোও গতিশীলকরণের পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক চীনের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে আলোচিত এবং সমালোচিত হন। বিশেষ করে ৭০'র দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি চীনের সমাজতান্ত্রিক সমাজে কিছু কিছু বাজার অর্থনীতির ধারণা প্রবর্তনের প্রস্তাব করে দ্বিতীয়বারের মতো পার্টি থেকে অপসারিত হয়েছিলেন। অনেকেরই মনে থাকার কথা দেং-এর সেই বিখ্যাত উক্তির কথা। *"বিড়াল সাদা বা কালো সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো বিড়াল ইঁদুর মারে কিনা।"* দেং বিশ্বাস করতেন যে, চীনের অর্থনীতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে এতে পরিবর্তন আবশ্যক। এজন্য তিনি পুঁজিবাদী অর্থনীতি বা বাজার অর্থনীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেজন্য সেদিন দেংকে কট্টরপন্থী কমিউনিস্টরা পুঁজিবাদের দালাল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। যদিও তিনি পুরোপুরিভাবে পুঁজিবাদে ফিরে যাবার কখনোই পক্ষপাতি ছিলেন না। এজন্য তাকে পুনরায় দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে মাও জে ডং-এর মৃত্যুর পর তিনি আবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন এবং ১৯৭৭ সালে দেং রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মতাদর্শিক সংগ্রাম ও শ্রেণীবিরোধের পরিবর্তে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনকে অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। ফলে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিজমের আদর্শগত গোঁড়াবাদ তথা সর্বহারার একনায়কত্বের প্রতিনিধি হিসেবে বৈপ্লবিক পার্টি গঠন ও রাষ্ট্রের উপর পার্টির একক নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ সাধন বিষয়ক সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে যৌথ ও সামাজিক মালিকানার কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। ফলে চিরায়ত মার্কসীয় ও লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং মাও জে ডং-এর চিন্তাধারার আলোকে বিকাশমান রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা দেং জিয়াও পিং-এর সময়ে নতুন পথে যাত্রা শুরু করে।

দেং জিয়াও পিং-এর সংস্কার পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক

১৯৭৬ সালে মাও জে ডং-এর মৃত্যুর পর দেং রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ১৯৭৭ সালে অধিষ্ঠিত হন। উল্লেখ্য যে, মাওয়ের মৃত্যুর পর চীনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় 'দ্বৈত সত্তার' অস্তিত্ব ছিল। একদিকে হুয়া গুয়া ফেং-এর নেতৃত্বে মাওপন্থীরা (ফেং ছিলেন মাও পরবর্তী পার্টি চেয়ারম্যান) মাওয়ের আদর্শ অনুসরণ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অপরদিকে, দেং-এর নেতৃত্বে সংস্কারপন্থীরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দুইধারার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংস্কারপন্থীরাই বিজয়ী হন। কিন্তু দেং-এর হাতে প্রকৃত ক্ষমতা আসতে আরো পাঁচ বছর সময় লেগে যায়। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে দেং-এর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮২ সালের মধ্যেই তিনি হুয়া গুয়া ফেংকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত করতে এবং 'চার কু চক্রী'কে পরাজিত করতে সম্মত হন। রাজনৈতিক ক্ষমতা সুসংহত

করার পর পরই দেং জিয়াও পিং চীনের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে চারটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন। ক্ষেত্রসমূহ হলো ক. কৃষি; খ. শিল্প; গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ঘ. প্রতিরক্ষা। তিনি অর্থনৈতিক সংস্কার ছাড়াও প্রশাসনিক সংস্কারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। দেং-এর সংস্কার পরিকল্পনা যদিও ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল তবু 'চারটি আধুনিকায়ন'র জন্য যে প্রাথমিক আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন তা আদর্শিকভাবে নেহায়েত একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। কারণ এতে একদিকে যেমন দলের ভূমিকায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না তেমনি সর্বহারাদের একনায়কত্বের অবিরাম প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এখানে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। মূলত, দেং-এর আধুনিকায়নের পরিকল্পনাটি ছিল একটি মার্জিত সংস্কার প্রচেষ্টা। দেং-এর সংস্কার কর্মসূচির প্রাথমিক পর্যায়ে সক্রিয়তাবাদী ছাত্রদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়। ১৯৭৮ সালে দেং-এর পক্ষে তারা গণবিক্ষোভও করেছিল। কিন্তু "গণতন্ত্র ছাড়া কোনো আধুনিকায়ন হয় না" বলে ছাত্রদের মধ্য হতে পঞ্চম আধুনিকায়নের যে দাবি ওই সময়ে উত্থাপিত হয়েছিল, তাতে দেং সাড়া দেননি। বরং এ দাবির পক্ষে গড়ে ওঠা ছাত্রআন্দোলনকে তিনি কঠোরহস্তে দমন করেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পক্ষে যাতে করে দাবি বা আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে এবং এর পক্ষে যাতে কোনো সহানভূতি প্রকাশিত না হয় তার জন্য দেং রাজনৈতিক সাবধানতা অবলম্বন করেন। কারণ তা না হলে সংস্কারের কর্মসূচি ব্যাহত হতো চরম, ভাবে। দেং-এর সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল, গত দশকগুলোতে যেসব বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়েছিল তা কাটিয়ে উঠে ক্ষমতাসীন দলের জন্য স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং দেশকে আধুনিকায়নের দিকে অগ্রসর করার লক্ষ্যে দলের প্রাধান্য বজায় রাখা। দেং চীনের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি দলের নেতৃত্বের ভেতর একটি সুশৃঙ্খল উত্তরাধিকার প্রক্রিয়া গড়ে তোলেন। দ্বাদশ কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে দেং তার পছন্দের হু ইয়াও বাং-কে দলের নেতা এবং ঝাও ঝিয়াং-কে সরকারপ্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন। তিনি নিজে কখনও পার্টি চেয়ারম্যান হননি।

সারণি : ১৬

চীনের অর্থনীতি, ১৯৯৩-২০২০

	১৯৯৩	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০২০
জিডিপি (বিলিয়ন ডলার)	৭৮০	১৫৬০	২০৩৪.১০৩	২৭২২.০৮৮	৩৬৪২.৭৬৮	৪৮৭৪.৮৪৬
মাথাপিছু জিডিপি (ডলার)	৬৫০	১১৪১	১৪১৭.৫৫	১৭৬০.৯১২	২১৮৭.৪৪৩	২৭১৭.২৮৬
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১২০০	১৩৩২	১৪৩৪.৯৪২	১৫৪৫.৮৪	১৬৬৫.৩০৯	১৭৯৪.০১১
সঞ্চয় (বিলিয়ন ডলার)	২৯৬	৫৭৮	৬১০.২৩০৯	৮১৬.৬২৬৫	১০৯২.৮৩১	১৪৬২.৪৫৪

সূত্র : Daily Star, Dhaka, ১০ জানুয়ারি, ১৯৯৩

প্রশাসনিক সংস্কার

প্রশাসনিক সংস্কারের মূলউদ্দেশ্য ছিল, প্রদেশগুলোকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা এবং কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা। এই ধারণার আলোকে পরবর্তীকালে চীনের প্রদেশগুলোকে এক ধরনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ প্রদান করা হয়। ফলে প্রদেশগুলো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের সুযোগ লাভ করে। এর ফলে প্রদেশগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়ে যায় এবং বেশ কটি 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' সৃষ্ট করা হয়। একই সাথে গড়ে তোলা হয় স্টক এক্সচেঞ্জ তথা শেয়ার বাজার। প্রশাসনিক সংস্কারের আওতায়ই এসব করা হয়।

কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার

চীন ছিল একটি পশ্চাৎপদ কৃষিপ্রধান দেশ। জাতীয় আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হতো কৃষিখাত থেকে। তাই সংস্কার শুরু হয়েছিল কৃষিখাত থেকে। কৃষিখাতকে বলা হয়ে থাকে চীনের অর্থনৈতিক বিকাশের মূলশক্তি। কৃষিব্যবস্থাকে অধিকতর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে দেং এবং তার পরবর্তী চীনা নেতৃত্ব কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিশেষ করে মাও জে ডং-এর শাসনামলের শেষ দশকে কৃষিপ্রধান অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ প্রদেশগুলোয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রথমে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। এমতাবস্থায় মাও উত্তর সরকার Household Management System-এর উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। এই ব্যবস্থার মূলকথা হলো, পরিবারভিত্তিক চাষাবাদের ব্যবস্থা। কমিউন (অর্থাৎ চাষাবাদের উপর সরকার নিয়ন্ত্রিত) ব্যবস্থা ভেঙে কৃষক পরিবারকে পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী মাথাপিছু হারে চাষের জমি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার বাড়িয়ে দেন কৃষিপণ্যের মূল্য পরিবারভিত্তিক আবাদের ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কৃষিপণ্যের মূল্য বাড়ানোর ফলে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতায় আসে নাটকীয় পরিবর্তন। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের একটা অংশ প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় করে তাদের সঞ্চয় বাড়াতে পারতেন। ১৯৮৩-৮৪ সালে প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে দাঁড়ায় বাৎসরিক দশ শতাংশ। কৃষিখাতে সংস্কারের ফলে চীনের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এর ফলে প্রথমত, কৃষিখাতে আয় বাড়ার ফলে শিল্পজাত পণ্যের বাজার প্রসার লাভ করে। এবং শিল্পখাতে কাঠামোগত সংস্কার প্রক্রিয়া চালু হবার পরিবেশ তৈরি হয়। দ্বিতীয়ত, কৃষিপণ্য বিশেষত খাদ্যশস্য, মাংস, শাকসবজি, ফল, খাবার তেল, তুলা প্রভৃতির বর্ধিত সরবরাহের ফলে শহর ও গ্রামীণ এলাকার জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটে এবং সেখানকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও বজায় রাখতে সাহায্য করে। তৃতীয়ত, কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গ্রামাঞ্চলে অকৃষিখাতের পণ্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত শ্রম ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামীণ অবকাঠামোগত নির্মাণ, পরিবহন, বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস এবং গ্রামীণ শিল্পে তা নিয়োজিত হবার সুযোগ পায়। চতুর্থত, কৃষি ব্যবস্থাপনায় কমিউনের বদলে পরিবারভিত্তিক চাষাবাদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হয়।

সারণি : ১৭

চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যঘাটতি

১৯৯৭ সালে	৫০ বিলিয়ন ডলার
১৯০২ সালে	১০০ বিলিয়ন ডলার
১৯০৪ সালে	১৫০ বিলিয়ন ডলার
১৯০৫ সালে	২০০ বিলিয়ন ডলার
১৯০৬ সালে	২৩২.৫ বিলিয়ন ডলার

সূত্র : টাইম, ৪ জুন ২০০৭

শিল্পখাতে সংস্কার

শিল্পখাতে চীনের সংস্কার প্রক্রিয়ার সাফল্যের খতিয়ান তুলনামূলকভাবে কম প্রচার পেয়েছে। আশির দশকে সর্বাত্মক বিরাষ্ট্রীয়করণ ছাড়াই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের সংস্কারে চীন অগ্রসর হয়েছিল এবং বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ সফলতা এক্ষেত্রে অর্জিত হয়েছিল, যা কিছুটা বড় করে বলার দাবি রাখে।

দেং জিয়াও পিং এবং চীনা নেতৃত্ব রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে আরোও দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য লোকসানের বোঝাসহ ভর্তুকির মাত্রা কমানোর জন্য চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাসমূহকে আরো বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দেন। এ লক্ষ্যে যে নতুন পদ্ধতি তারা গ্রহণ করেন তার নাম দেয়া হয় Two Tier Pricing পদ্ধতি। এর সারকথা হলো, রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার মোট উৎপাদনের একাংশ (সাধারণত ক্ষুদ্রাংশ) নিয়ন্ত্রিত হবে রাষ্ট্র নির্ধারণের মূল্য দ্বারা, আর বাকি অংশ অর্থাৎ বড় অংশটি নির্ধারিত হবে, তা উৎপাদিত হবে কেবল রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, আর তাই সেটা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ জন্যে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করবে উক্ত কারখানাকে। উৎপাদনের এই অংশটিকে আমরা বলতে পারি কোটা নিয়ন্ত্রিত। কোটার বাহিরে কারখানাটি যা কিছু উৎপাদন করতে ইচ্ছুক এবং সে জন্য বাজার থেকে যে ধরনের এবং যতটা কাঁচামাল ক্রয় করা তার আবশ্যক, তা তারা সংগ্রহ করতে পারত। এবং পরিশেষে উৎপাদিত পণ্য স্বাধীনভাবে বাজারে বিক্রি করার স্বাধীনতা কারখানাকে দেয়া হয়েছিল। এর ফলে প্রাইভেটাইজেশন ছাড়াই পূর্বতন ব্যবস্থার তুলনায় এসব কারখানার বাজার সম্পৃক্ততা বাড়ল, ক্রেতার চাহিদামুখী পণ্য উৎপাদন বাড়ল, পণ্যের মান বাড়ল, কারখানার আয়ত্ত বাড়ল। ফলে কাজে শ্রমিকদের উৎসাহ বেড়ে গেল যা উৎপাদনশীলতাকে বাড়াতে সাহায্য করল। এ সবটুকু অর্জন সম্ভব হয়েছিল মালিকানা সম্পর্কে মৌলিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে মালিকানাজনিত অধিকারের পরিধি বাড়িয়ে। কারখানাকে দেয়া হয়েছিল ব্যবস্থাপনার বর্ধিত অধিকার এবং দেয়া হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রণোদনা। Two Tier Pricing নীতির ফলে আরো যে পরিবর্তনটা আসল তা হলো– বিভিন্ন খাতে ও বিভিন্ন মালিকানায় পুঁজি, প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রমিকের ব্যবহার ও সেই সাথে যৌথ প্রজেক্ট গড়ে উঠতে থাকল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোটা বহির্ভূত উৎপাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা যেটুকু অতিরিক্ত আয় করত তার ওপরে রাষ্ট্র ঠিকই কর বসাত।

কিন্তু তার পরিমাণ ছিল ১৫ শতাংশের মতো। নিয়মানুযায়ী বাদবাকি লভ্যাংশের অর্ধেক ব্যয় হতো বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে। (যেমন- কারখানার মালিকানাধীন আবাসিক গৃহপ্রকল্প, অবকাশ যাপন কেন্দ্র কিংবা সিনেমা হল)। অথবা কারখানার কর্মচারী, শ্রমিকদের আর্থিক বোনাস দেয়ার পিছনে। বাকি অর্থ কারখানার রিজার্ভ খাতে অথবা প্রযুক্তিগত বিকাশ ও পণ্যের গুণগত মান ও উন্নয়নে ব্যয় হতো। যেহেতু লভ্যাংশের পুরো বন্টন প্রথাই ছিল চুক্তিভিত্তিক, তাই প্রতিটি কারখানাকে তার উর্ধ্বতন স্থানীয় কিংবা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে তহবিল সংগ্রহ, কোটা ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে চুক্তি করতে হতো প্রতিবছর। চীনের অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ার আরোও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রাষ্ট্রে বহির্ভূত খাত। এই রাষ্ট্রে বহির্ভূত খাতের মধ্যে প্রথমেই এসে পড়ে Township এবং Village Enterprise-এর প্রসঙ্গ, যাকে সংক্ষেপে TVE বলা হয়। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮২ সাল হতে ১৯৮৮ সালের মধ্যে যেখানে চীনের অর্থনীতিতে বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩%, সেখানে TVE খাতে উৎপাদনের হার ছিল ৩৮%। এই TVE খাতের মধ্যে বিভিন্ন খাত তথা কৃষি, শিল্প, নির্মাণ, পরিবহন ও বাণিজ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার একত্রে অবদান সমগ্র জাতীয় উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ ছিল। তবে গ্রামীণ অঞ্চলে এর প্রভাব বেশি ছিল। TVE খাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (ক) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান; (খ) শ্রমভিত্তিক মজুরি ব্যবস্থা; (গ) পারিবারিক শ্রমভিত্তিক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান; (ঘ) সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠান এবং (ঙ) যৌথ প্রতিষ্ঠান।

চীনের শিল্পক্ষেত্রে সংস্কারের মূললক্ষ্য ছিল উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর শিল্প উৎপাদনের সাথে সমতা অর্জন বা তাদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়া। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দেং শিল্পকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সালের ২০ অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে স্বাধীন অর্থনৈতিক সত্তা গড়ে তোলার অনুমতি দেয়া হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর্মচারী ছাঁটাই ও নতুন নিয়োগ প্রয়োজনীয়তা, সরবরাহ নিশ্চিত করণ, মজুরি ও দাম নির্ণয় এবং মুনাফা বিনিয়োগের অনুমতি দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানা হতে ব্যক্তি মালিকানাধীন ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (বিশেষ করে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠান) সূচনা করে সংস্কার কর্মসূচিকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দেং জিয়াও পিং শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়, যৌথ ও ব্যক্তিক এই তিন খাতের সহাবস্থান নিশ্চিত করে চীনের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যান।

দেং চীনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পদক্ষেপসমূহ হলো ক. বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আয়করের হার কমিয়ে ১৫ শতাংশে নিয়ে আসা; খ. উৎপাদনের প্রয়োজনে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো শুল্কমুক্তভাবে আমদানি করতে পারবে; গ. বিদেশি শিল্পপতিদেরকে নামে মাত্র শুল্কে ভোগ্যপণ্য আমদানি করার অনুমতি দেয়া; ঘ. সরকারকে কর দেয়ার পর যে মুনাফা অর্জিত হবে তা বিনিয়োগকারীরা নিজের দেশে পাঠাতে পারবে; ঙ. একশ ভাগ মালিকানা ভোগের অধিকারও বিনিয়োগকারীদের প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চীনে শ্রম বাজারের কোনো

অস্তিত্ব ছিল না। সরকারি শ্রম দফতরের মাধ্যমে কাজ পেতে হতো। কাজের ধরন ও স্থান নির্বাচনের পূর্ণ বা মোটামুটি স্বাধীনতা নাগরিকদের ছিল না। কোনো সংস্থা স্বাধীনভাবে কাউকে নিয়োগ বা ছাঁটাই করতে পারত না। কিন্তু মাও উত্তর দেং পর্বে এ অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। বিদেশি বিনিয়োগ এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রম কেনা ও শ্রম ছাঁটাইয়ের অধিকার লাভ করে। অন্যদিকে, কাজের ধরন ও বিনিয়োগকারী নির্বাচনের স্বাধীনতা শ্রমিক, কর্মচারীরা পেতে থাকে। চীনে ইপিজেডগুলোতে ব্যাপক হারে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি দেখা দেয়। শ্রম বাজার প্রতিষ্ঠা এবং শিল্পক্ষেত্রে নতুন নীতি কার্যকর হওয়ার ফলে চীনে শিল্প উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ১৯৫২ সালে মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অবদান যেখানে ২৩% ছিল, সেখানে বেড়ে ১৯৮৭ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৫২ শতাংশ।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষাখাতে সংস্কার

কৃষি ও শিল্পখাতের মতো দেং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষাখাতকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে উক্ত সেক্টরে সংস্কার আনেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ এবং সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়িয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সুশিক্ষিত ও দক্ষ সামরিক বাহিনী ও উৎকৃষ্ট সমরাস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে তোলা ছিল দেং-এর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দেং 'খোলা দ্বার নীতি' অনুসরণ করে উন্নতবিশ্বের বিজ্ঞানের জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ নিশ্চিত করেন এবং সামরিক দিক থেকে পরাশক্তিতে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে অর্থনৈতিক 'টাইগারে' পরিণত হওয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দেন। এই লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারিতে পুরানো আইন বাতিল করে প্রযুক্তি হস্তান্তরের নতুন আইন ঘোষণা করা হয়। প্রযুক্তি নীতিতে উদারতা প্রদর্শন করার ফলে পাশ্চাত্যের পুঁজিনির্ভর এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পণ্যের বিনিয়োগ বাজার সম্প্রসারিত হতে থাকে।

চীনের সংস্কারকে ঘিরে মতাদর্শগত বিরোধ

চীনের সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে নানা কথা রয়েছে। একসময় ভাবা হতো যে, সমাজতন্ত্রে বাজার অর্থনীতির কোনো স্থান নেই, সমাজতন্ত্রের সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা। কিন্তু এই চিন্তা-চেতনায় এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। অনেক মার্কসীয় গবেষকও মনে করেন, মার্কসবাদে বাজার অর্থনীতি পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা হয়নি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিন যখন তার New Economic Policy গ্রহণ করেন, তখন লেনিনের রচনায় সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য পণ্য, অর্থ সম্পর্ক ও বাজার ব্যবস্থার ব্যবহারের পক্ষে প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে নির্দিষ্ট কিছু বলা নেই। ফলে চীনের সংস্কার প্রক্রিয়ার কোন অংশটুকু সমাজতন্ত্রসম্মত পদক্ষেপ বা কোনটি সমাজতন্ত্র বিরোধী তা কষ্টিপাথরে যাচাই করে খোঁজ পাওয়া বড়ই কঠিন কাজ। চীন নিজে কিন্তু বলছে না সমাজতন্ত্র চীনে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বরং বলা হচ্ছে যে, চীন সমাজতন্ত্র নির্মাণ করছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অর্থাৎ সংস্কার পর্বের নেতৃবর্গ মনে করেন, সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাকে পশ্চাৎমুখিতা থেকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে

সমাজতন্ত্রী চীনকে সমৃদ্ধি ও উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সংস্কারের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাকে কাজে লাগিয়ে নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং হবে।

চীন তাদের এই সংস্কার কর্মসূচিকে বলছে 'সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি'। অর্থাৎ এখানে সমাজতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির উপাদান রয়েছে। পার্টির এখনও একক কর্তৃত্ব বজায় রয়েছে। রাজনীতিতে কোনো সংস্কার আনেনি চীন, যা এনেছিলেন গরবাচেভ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে। সেনাবাহিনী এখনও পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীনে। চীনে বেশ কিছু পুঁজিপতিরও সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তিগত খাতের প্রসার ঘটেছে। ছোট ছোট ব্যবসা (হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ট্যাক্সি, ক্যাব) এখন ব্যক্তিগত খাতে পরিচালিত হয়। সেই সাথে রয়েছে শেয়ার ব্যবসা, যেখানে লাভের প্রশ্ন জড়িত। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান এখনও রাষ্ট্রের হাতে। চীনের সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি ইতোমধ্যে ভিয়েতনাম এবং পশ্চিম বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিও (সিপিআই-এম) গ্রহণ করেছে।

দেং-এর ভাবশিষ্য হিসেবে ১৯৮৬ সালে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঝাও ঝিয়াং। তিনি দেং-এর কর্মসূচিকে অধিকতর প্রয়োগযোগ্য এবং বাস্তবায়নযোগ্য করে তোলেন। তার কর্মসূচিকে সামনে রেখে একের পর এক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৯ সালে চীনে ছাত্র বিক্ষোভের সময় ছাত্রদের দাবির প্রতি কিছুটা দুর্বলতা থাকায় পার্টির কট্টরপন্থিদের দ্বারা ঝাও অপসারিত হন। এর পর পার্টির দায়িত্বে আসেন জিয়াং ঝেমিন। তিনি চীনের নেতৃত্ব নেওয়ার পর পরই সমাজতান্ত্রিক চীনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। জিয়াং ঝেমিনের হাত ধরেই ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে চীনের সংবিধান সংশোধন করে সেখানে বাজার অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংবিধান সংশোধনের এই ঘোষণার মাধ্যমে চীনের চার দশকের বেশিকাল ধরে চালু স্ট্যালিনবাদী কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির অবসান ঘটে। এখানে গড়ে উঠেছে স্টক একচেঞ্জ। পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাধ্যতামূলক কমিউন প্রথা বাতিল করে সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিক উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই আজ কৃষকরা বা শ্রমিকরা তাদের বাড়তি আয় অন্যত্র ব্যবহার করতে পারছে। বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ফলে গ্রামেও পরিবর্তন এসেছে। ই-মেইল এবং ক্যাবল টিভি এখন আর কোনো সমস্যা নয়। সংবাদপত্রগুলোতে আজ আর তেমন সেন্সর আরোপ করা হচ্ছে না। এসব ছিল বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে চীনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের এক একটি ধাপ।

আর একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে যে বিষয়টি বিশ্বজুড়ে আলোচনার ঝড় তুলেছিল তা হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক চীনের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যোগদান, যা সমগ্র বিশ্ববাসীকে অবাক করেছিল। ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে কাতারে অনুষ্ঠিত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ৪র্থ সম্মেলনে চীন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। উক্ত সম্মেলনে সুদীর্ঘ ১৫ বছর অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে অবশেষে চীন ডব্লিউটি'র সদস্যপদ লাভে সমর্থ হলো। এজন্য বিশেষজ্ঞ মহল এ ঘটনাকে চীনের দ্বিতীয় বিপ্লব এবং দেও জিয়াও পিং'র বিখ্যাত উক্তিসমূহের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন বলে মনে করেন। কেননা এ পর্বে যেমন রয়েছে সম্ভাবনার সুযোগ তেমনি রয়েছে বিরাট চ্যালেঞ্জ। একদিকে সদস্যপদ প্রাপ্তি চীনের জন্য বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসতে পারে, আবার অন্যদিকে আশীর্বাদও বয়ে নিয়ে আনতে পারে। তবে

ইতিবাচক দিকটাই বেশি। কারণ এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে চীনের প্রবেশের পথে আর বাধা রইল না। ২০০৫ সালের পর কোটামুক্ত বিশ্ব চালু হওয়ার ফলে চীন সহজেই তার নিজস্ব প্রযুক্তিতে উৎপন্ন তৈরি পোশাক সমগ্র বিশ্বের বাজারে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। সম্ভাবনার সুযোগের পাশাপাশি তার বিপরীত ঘটনাও যে ঘটবে না তা কিন্তু নয়। কেননা এখন চীনকে তার কৃষিক্ষেত্রে সকল প্রকার ভর্তুকি প্রত্যাহার করতে হবে। ফলে কৃষিব্যবস্থায় চলে আসবে বিপর্যয়। বিদেশি বিনিয়োগের ফলে দেশিয় বিনিয়োগকারী এবং তাদের গড়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রবল প্রতিযোগিতায় পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। ইস্পাত শিল্প ও মোটরগাড়ি শিল্পে দেখা দিয়েছে বিরাট বিপর্যয়। সব মিলিয়ে এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি চীন। তাই আগামী নেতৃত্বই বলে দেবে আগামী দিনগুলোতে চীন কীভাবে অগ্রসর হবে? তবে চীনে মুক্তবাজার ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ার সাথে সাথে নারীরা নানা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। টাইম ম্যাগাজিনে (২৮ জুলাই, ২০০৩) এক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, চীনে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালুর পর থেকেই নারীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না চীন পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হলেও কৃষি উৎপাদন থেকে শুরু করে জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে পশ্চিমাবিশ্ব এমনকি উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। চীনের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৫ কোটি লোক দৈনিক এক মার্কিন ডলারের কম অর্থে বেঁচে থাকত। এটা ছিল বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব। ১৯৯৮ সালে চরম দারিদ্র্যের মাঝে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল ২৫ কোটি। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে চীনের অর্থনৈতিক সংস্কার কেন প্রয়োজন ছিল। চীনকে আজ বলা হয় 'পঞ্চম ড্রাগন', অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, জাপান ও জার্মানির পর চীন হচ্ছে বিশ্বের পঞ্চম অর্থনৈতিক শক্তি। চীনের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার যদি বজায় থাকে তাহলে চীন আগামী ২০১৫ সালে জাতীয় উৎপাদনের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সমপর্যায়ে চলে আসবে।

গরবাচেভের নীতির সাথে দেং জিয়াও পিং'র সংস্কার নীতির তুলনামূলক আলোচনা

বলা হয় গরবাচেভ তার সংস্কার কর্মসূচির ধারণা নিয়েছিলেন দেং জিয়াও পিং-এর সংস্কার নীতির আলোকে। মিখাইল গরবাচেভের সংস্কার কর্মসূচির দুটি দিক ছিল— 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরোস্ত্রোইকা'। গ্লাসনস্ত এর আভিধানিক অর্থ হলো দুয়ার খোলা নীতি আর পেরোস্ত্রোইকার অর্থ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন। তবে দেং-এর সংস্কার কর্মসূচির সাথে গরবাচেভের সংস্কার কর্মসূচির পার্থক্য ছিল। গরবাচেভ তার সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সব কিছু উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি পার্টির একক আধিপত্য ধরে রাখতে পারেননি। তিনি 'পেরেস্ত্রোইকার' মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নে বাজার অর্থনীতি চালু করেন। কিন্তু তিনি 'গ্লাসনস্ত' বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিপত্তিটা বাঁধিয়েছিলেন। 'গ্লাসনস্ত'র সুযোগ নিয়ে সমাজতন্ত্র বিরোধী শক্তিগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল যা কিনা পরবর্তীকালে গরবাচেভের পতনকে ত্বরান্বিত করে। চীনে পেরেস্ত্রোইকা এসেছে। কিন্তু গ্লাসনস্ত আসেনি। কমিউনিস্ট পার্টি

এখানে মূলশক্তি। ১৯৮৯ সালে ছাত্ররা সেখানে গণতন্ত্র চালু করার ব্যাপারে বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তুললেও সেনাবাহিনী সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। জানা যায় দেং অর্থনৈতিক কর্মসূচির ব্যাপারে বড় ধরনের উদ্যোগ নিলেও তিনি রাজনৈতিক সংস্কারে মোটেই রাজি ছিলেন না। এজন্যই আজও সমাজতান্ত্রিক চীন টিকে আছে। অপরদিকে, গরবাচেভের রাজনৈতিক সংস্কার তথা 'গ্লাসনস্তের' কারণে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়।

উপসংহার

একুশ শতাব্দীর সূচনালগ্নেই সমাজতান্ত্রিক চীন বিশ্ববাণিজ্য-সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছে। ফলে চীনে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়তে থাকে। পাশাপাশি চীন তার পণ্য সামগ্রী বিশ্ববাজারে রপ্তানি করার সুযোগ পায়। এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, একুশ শতাব্দীতে এসেও চীন রাজনৈতিক সংস্কার অপেক্ষা অর্থনৈতিক সংস্কারের উপর গুরুত্বারোপ করছে। তবে দাতাগোষ্ঠী এবং পুঁজি বিনিয়োগকারীরা আরো সংস্কারের কথা বলেছে। যুক্তরাষ্ট্র চীনকে বিশেষ সুযোগ প্রাপ্তির দেশের মর্যাদা দেয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতারা এটাকে রদ করে দিতে চান। তাদের দাবি হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কার তথা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করা। তবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চীনে চালু হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। একুশ শতকে যে চীন, সেখানে বহু মতের সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু তাকে কোনোভাবেই পশ্চিমা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সাথে তুলনা করা যাবে না। কেননা চীন বহু জাতি, উপজাতি এবং অনেক প্রদেশ, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি বৃহত্তম দেশ। রাজনৈতিক সংস্কারের প্রশ্নে দেশটি ভেঙে যেতে পারে যেমন হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। এ কারণে চীনা নেতৃবর্গ রাজনৈতিক সংস্কারের প্রশ্নে সতর্ক থাকছেন। সেনাবাহিনী এখনও পার্টির প্রতি অনুগত থাকায় পার্টির একক কর্তৃত্ব বহাল আছে। তাই সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে, চীন অচিরেই অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বের যে কোনো পরাশক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে। আর দেং জিয়াও পিং-এর সংস্কার কর্মসূচির সার্থকতা এখানেই।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. তারেক শামসুর রেহমান, নয়া বিশ্বব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ঢাকা ২০০২
২. জিবিগনিউ ব্রেজেনস্কি, চরম ব্যর্থতা বিংশ শতাব্দীতে কমিউনিজমের জন্ম ও মৃত্যু, (গাজী শামসুর রহমান অনূদিত), ঢাকা, ১৯৯০
৩. Michal Ngo Quinn. Deng Xiao Pings Political Reform and Political Order. Asian Survey. December, 1982.
৪. A. Barnett and R. Clough ed. Modernizing China, Westview, Boulder, 1984.

পঞ্চদশ অধ্যায়

আফগানিস্তান

War is but the continuation of politics by other means.

Clausewitz
(On War, 1982)

ভূরাজনৈতিক কারণে আফগানিস্তান শুধু এশিয়ারই নয় ইউরোপ, আমেরিকা, তথা গোটা বিশ্বের কাছেই একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। আফগানিস্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি হয়। সে কারণে দেখা যায় আলেকজান্ডার দি গ্রেট, চেঙ্গিস খানসহ বহু যুদ্ধবাজদের দ্বারা আফগানিস্তান বারবার আক্রান্ত হয়েছে। ইংল্যান্ড, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সর্বশেষে যুক্তরাষ্ট্রও আফগানিস্তানে আক্রমণ পরিচালনায় নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যে সব দেশ অতীতে আঘাত হেনেছে, তারা সবাই পরাজিত হয়েছিল। একশ বছরেরও বেশি আগে একজন ব্রিটিশ ভাইসরয়ও বলেছিলেন আফগানিস্তান হচ্ছে 'বিষাক্ত পানীয়' আর সাবেক সোভিয়েত নেতা মিখাইল গরবাচেভ আফগানিস্তানকে 'রক্তাক্ত ক্ষত' হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে কয়েক হাজার ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্য আফগানিস্তানের এক গহীন পাহাড়ি এলাকা দিয়ে আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় আফগান যোদ্ধারা তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। অর্থাৎ এই দেশে সকল আক্রমণকারীকেই চরমশিক্ষা পেতে হয়েছে। সময়োপযোগী অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া কিভাবে, কোন শক্তিবলে আফগানিস্তান অতীতের সকল আক্রমণকারীকে পরাস্ত করেছে, চরমশিক্ষা দিয়েছে, তা আমাদের মনে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি করে। সাবেক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আফগানিস্তানের দীর্ঘ প্রায় দশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে সাবেক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের চরম পরাজয় 'আফগান যুদ্ধ'কে বিংশ শতাব্দীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করেছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে আফগানযুদ্ধ যে ভয়াবহ সংকটের সৃষ্টি করেছিল, তার কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি। বরং একুশ শতকে নতুন আঙ্গিকে এই যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটেছে।

আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান ও আয়তন

আফগানিস্তানের উত্তরে উত্তর-পূর্ব চীন, পশ্চিমে ইরান এবং পূর্ব ও দক্ষিণে পাকিস্তান অবস্থিত। আফগানিস্তানের আয়তন ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫০০ বর্গকিলোমিটার। ভূপ্রকৃতি হলো পাহাড়ি। এই দেশের অধিকাংশ পর্বতই ১২২০ মিটারের বেশি উঁচু। এই দেশটিতে বহু জাতি-উপজাতির বাস। এদের মাঝে রয়েছে ওয়াহাবী, পশতুন, শিয়া, হামারী উজবেক, তাজিক, কিরঘিজ ইত্যাদি। রাজনীতিতে পশতুনরা আর ব্যবসায়-বাণিজ্যে তাজিকরা শক্তিশালী।

আফগান যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ

আফগানিস্তানে ছিল রাজতন্ত্র। ১৯৭৩ সালে এক অভ্যুত্থানে রাজা জহির শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ইতালিতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরপর আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় এক সোভিয়েতপন্থি সরকার, যার নেতৃত্বে ছিলেন নূর মোহাম্মদ তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমিন, বারবাক কারমাল প্রমুখ। চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি মোহাম্মদ দাউদের নেতৃত্বে রাজা জহির শাহের ক্ষমতা থেকে উৎখাতের পর থেকে আফগানিস্তানের ইতিহাস চলছে একটি রক্তাক্ত পথে। তারপর আফগানিস্তানে এখনও ঝরছে অনেক রক্ত। শাসন কাঠামোতে এসেছে নানা পরিবর্তন।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের একশ বছর পর আফগানিস্তানে অভিযানে নেমেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনী। এই সেই আফগানিস্তান যেখানে এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারকারী ব্রিটিশরা প্রায় আড়াইশ বৎসর চেষ্টা করেও দেশটি কব্জা করতে পারেনি। কিন্তু ইতিহাসের চরমশিক্ষা এই যে, কেউ-ই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তারা ১৯৭৯ সালে কাবুলে সোভিয়েতপন্থী বারবাক কারমালের সরকারকে ক্ষমতায় রাখার জন্য সৈন্য পাঠায়। ভূমণ্ডলীয় রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী এশিয়ার প্রবেশদ্বার আফগানিস্তান থেকে একদিকে চীন অন্যদিকে রাশিয়াকে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় সোভিয়েত বিরোধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট বিরোধী গেরিলাদের জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিল। আফগান মুজাহিদদের নিকট সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল নাস্তিকের দেশ। পক্ষান্তরে তারা হলো খোদাভীরু। তাই তারা আফগানিস্তানের পবিত্র মাটিতে সোভিয়েত উপস্থিতি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। ফলে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী গেরিলা যুদ্ধ, যার শুরু ১৯৮০ সালের প্রথমদিকে।

আফগানিস্তানে আগ্রাসনের আগে "সোভিয়েত স্পেশাল অপারেশন ইউনিক"কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। এই বাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের ডেলটা ফোর্স এবং ব্রিটিশ এস এ এস-এর সমপর্যায়ের ছিল। কিন্তু অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট, লেসার মিসাইল–এসব পাহাড়ি মুজাহিদদের ঘায়েল করতে পারেনি। পুরোজাতি যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছিল। আফগানিস্তানের কনভেনশনাল আর্মি যা ছিল তার বেশিরভাগ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর

পক্ষে চলে যায়। দলছুট কিছু আফগান সৈনিক এবং ওই দেশের জনগণ কমিউনিজম তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শিক মতবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের মাধ্যমে বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য আসে। আফগান মুজাহিদদের কাছে পাকিস্তানকে ব্যবহার করা হয় পশ্চাৎ ঘাঁটি হিসেবে। আফগানিস্তানের দেশপ্রেমিক মুজাহিদিন, যাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা যুদ্ধের মধ্যে, তারা আঘাত হানতে থাকে পুতুল সরকার ও সোভিয়েত সৈন্যদের বিরুদ্ধে। তারা স্কুল, কলেজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেয় আর সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে থাকল। পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন মুজাহিদিনদের গেরিলা আক্রমণে দিশেহারা হয়ে ওঠে।

সারণি : ১৮

আফগানিস্তান : এক নজরে

১৯৭৩	দাউদ খান কর্তৃক রাজা জহির শাহ ক্ষমতাচ্যুত।
১৯৭৮	কমিউনিস্ট, জাতীয়তাবাদী আর সেনাবাহিনীর এক অংশের সম্মিলিত প্রয়াসে সামরিক অভ্যুত্থান। দাউদ খান ক্ষমতাচ্যুত ও নূর মোহাম্মদ তারাকি প্রেসিডেন্ট।
১৯৭৯	প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে তারাকি ক্ষমতাচ্যুত। হাফিজুল্লা আমিনের ক্ষমতা গ্রহণ। প্রো-সোভিয়েত সমর্থকদের দ্বারা আমিন ক্ষমতাচ্যুত। বারবাক কারমাল প্রেসিডেন্ট। কারমালের সমর্থনে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশ।
১৯৮৫-৮৬	পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট ৭ দলীয় মুজাহিদ জোট গঠন। গৃহযুদ্ধ। বারব্যাকের পরিবর্তে ডা. নাজিবুল্লাহর ক্ষমতা গ্রহণ।
১৯৮৮	গরবাচেভের আফগানিস্তান থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা।
১৯৮৯	১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সর্বশেষ সোভিয়েত সৈন্যের আফগানিস্তান ত্যাগ।
১৯৯২	ডা. নাজিবুল্লাহ ক্ষমতাচ্যুত। মুজাহিদিনদের ক্ষমতা গ্রহণ। মুজাহিদিনদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।
১৯৯৪	প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ার কর্তৃক প্রেসিডেন্ট বুরহানউদ্দিন রব্বানীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম।
১৯৯৫	সেপ্টেম্বর মাসে তালেবানরা আকস্মিক অভিযান চালিয়ে দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ কান্দাহার দখল করে নেয়।
১৯৯৬	জুন মাসে হেকমাতিয়ার রব্বানীর সাথে এক শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এবং তিনি তার পূর্ববর্তী পদ (প্রধানমন্ত্রী) গ্রহণ করেন। কিন্তু সেপ্টেম্বরে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে তালেবানরা কাবুল দখল করে। রব্বানী ক্ষমতাচ্যুত। তালেবানরা ডা. নজিবুল্লাহকে ফাঁসি দেয়।
১৯৯৭	তেহরানে আফগান মুজাহিদিনদের শীর্ষ সম্মেলন। তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার। রব্বানীর দেশত্যাগ।
১৯৯৮	আফগানিস্তানে যুদ্ধ ঘনীভূত। তালেবানদের ক্ষমতা করায়ত্ত।
২০০০	আফগানিস্তানে তালেবানদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

১৯৩৫ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত জহির শাহ আফগান সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ১৯৭৩ সালে ইউরোপ সফরকালে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে আফগানিস্তানকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শাহের এক আত্মীয় দাউদ খান আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশকে এই দেশের সঙ্গে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে আফগানিস্তানের সম্পর্ক ভালো ছিল না। বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানের সাথে আফগানিস্তানের সীমান্ত সংঘর্ষ হয়েছে। ১৯৫০ সালে ইরানের শাহ উভয় রাষ্ট্রের বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের সম্পর্ক কখনও স্বাভাবিক হয়নি। ১৯৭৩ সালে আফগানিস্তানের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সোভিয়েতপন্থী পিপল্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৩ সালে দাউদের ক্ষমতা লাভের পর তিনি ইরানের শাহ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। তাঁর শাসন ক্রমেই স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। ১৯৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল আফগানিস্তানের পিপলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের মাধ্যমে দাউদ ক্ষমতাচ্যুত হন। নূর মোহাম্মদ তারাকি বিপ্লবী সরকারের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। ৩০ এপ্রিল বিপ্লবী পরিষদ আফগানিস্তানকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথমে সেই সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। নতুন সরকার প্রথম আদেশেই রাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন এবং সমান্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর আধুনিক আফগানিস্তান গঠনের কথা ঘোষণা করেন। পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে জোট-নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক ও সহযোগিতা স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে নয়াসরকার।

অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান নতুন সরকারের কর্মসূচি সমর্থন করতে পারেনি। ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হাফিজুল্লাহ আমিন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নূর মোহাম্মদ তারাকিকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। ওই সময় দেশের অভ্যন্তরে নানারকম নাশকতামূলক কার্যকলাপ বাড়তে থাকে। যাতে বিদেশি রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। ফলে ওই সময় পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির এক অংশ ও সেনাবাহিনী ১৯৭৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর আমিনকে পদচ্যুত করে। বারবাক কারমাল বিপ্লবী পরিষদের নেতা নির্বাচিত হন। পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে নাশকতা বন্ধ করা এবং জাতীয় সংহতি ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য বারবাক কারমাল সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সামরিক সাহায্যের জন্য আবেদন করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখানে সামরিক বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। বেশিরভাগ ইসলামী রাষ্ট্রও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের সরকার বিরোধী গেরিলাদের, যারা মুজাহিদিন হিসেবে পরিচিত ছিলেন তাদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। ১৯৮৫ সালে মার্কিন কংগ্রেস ২৫০ মিলিয়ন ও সি.আই.এ আরও ৩০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে এ খাতে। নানা নাশকতামূলক কার্যকলাপের জন্য ওই অর্থ ব্যয় হয়। পাকিস্তান সীমান্তে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দিয়ে

আফগানিস্তানে পাঠানো হয়। পেশোয়ারে বিদ্রোহী আফগান এবং ভাড়াটে সৈন্যদের শিবির স্থাপন করে মেশিনগান, গ্রেনেড এবং রাইফেল দেয়া হয়। তাছাড়াও আফগানিস্তানে ভাড়াটে সৈন্যদের পেশোয়ারে প্রেরণ করা হয়। মিসর, সৌদি আরব, গ্রেট ব্রিটেনও আফগান বিদ্রোহীদের সাহায্য করে। পাকিস্তানে জাহাজ ও বিমান দিয়ে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। ওই অস্ত্র আফগান সীমান্তে পাঠানো হয়। সৌদি আরব এবং মিসরও গেরিলাদের সাহায্য করে। ইরান শিয়াপন্থী আফগান মুসলমানদের অস্ত্র সরবরাহ করে।

তৎকালীন আফগান সমস্যা সমাধানের প্রধান অন্তরায় ছিল পাক-মার্কিন মনোভাব। পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে এই নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি না দিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সৈন্যদের প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়–সোভিয়েত মনোভাব ছিল এমনই। পরে ১৯৮৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের সময়সূচি স্থির করে। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ বন্ধের প্রতিশ্রুতি এবং রাজনৈতিক মীমাংসায় উপনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সরকার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

আফগান সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নেয়া হয়। মার্কিন নীতির কারণে সমস্যা সমাধানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। ১৯৮৬ সালের ১৭ এপ্রিল মার্কিন সরকার ঘোষণা করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাহায্যদানে অঙ্গিকারাবদ্ধ। অন্যদিকে, জুলাই মাসে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ১৯৮৬ সালের মধ্যেই আফগানিস্তান থেকে ৬টি রেজিমেন্ট প্রত্যাহার করা হবে। আফগান নেতা নজিবুল্লাহ ওই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। পরে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৬টি রেজিমেন্টের ৮ হাজার সেনা প্রত্যাহার করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সালে নজিবুল্লা আফগানের রাষ্ট্রপতির পদগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দেশটিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হন। তিনি ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের জন্য সরকার এবং মুজাহিদিনদের মধ্যে বিরোধের অবসান প্রয়োজন। ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন সরকার মুজাহিদিনদের বিমান বিধ্বংসী ১৫০টি স্টিঞ্জার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করে। মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। উপরন্তু মার্কিন সরকার যে পথে আফগান মুজাহিদিনদের অস্ত্র সরবরাহ করছে, তা বন্ধ না করার জন্যও পাকিস্তানকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান আফগান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে সোভিয়েত বাহিনীর নিঃশর্ত প্রত্যাহারের দাবি উত্থাপন করেছিল। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছিলেন যে, আফগানিস্তানের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পর ওই দেশে সেনাবাহিনী রাখার কোনো অভিপ্রায় সোভিয়েত ইউনিয়নের নেই।

আফগান সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৮৬ সাল থেকেই জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব পেরেজ দ্য কুয়েলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৮৮ সালের ১৪ এপ্রিল

আফগান সমস্যার সমাধানের জন্য জেনেভায় পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা জামিনদাররূপে ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান উভয়েই প্রত্যেকের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, জাতীয় ঐক্য, নিরাপত্তা, এবং জোটনিরপেক্ষতাকে মেনে চলবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৫ মে থেকে নয় মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সকল সেনা প্রত্যাহার করবে। অর্ধেক সেনা ১৫ আগস্টের মধ্যে দেশে প্রত্যাবর্তন করবে। দলিলে আরও বলা হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে। জেনেভা চুক্তির ফলে দীর্ঘ ছয় বৎসরব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা প্রশস্ত হয়েছিল। চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সোভিয়েত মনোভাব সাহায্য করেছিল। চুক্তি সম্পাদিত হবার পর পেশোয়ারে অবস্থিত আফগান গেরিলারা ঘোষণা করে যে, তারা কাবুলের মার্কসবাদী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। মার্কিন সরকার এই অভিমত ব্যক্ত করেছিল যে, চুক্তি সত্ত্বেও আফগানিস্তানের গেরিলাদের সামরিক সাহায্যদানে কোনো বাধা থাকবে না। মে মাসের শেষের দিকে আফগান সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে জেনেভা চুক্তি আফগানিস্তানে বিদেশি হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে পারেনি।

১৯৮৮ সালের ১০ জুন সাবেক সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেভার্দনাদজে আফগানিস্তানে পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের জন্য হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, এভাবে চুক্তি লঙ্ঘিত হতে থাকলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের গতি বিলম্বিত করতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮র ৫ নভেম্বর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম সহকারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেনা প্রত্যাহার স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অন্যান্য পক্ষ জেনেভা চুক্তির শর্তাদি প্রয়োগ করলেই সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হতে পারে– সোভিয়েত সরকার এই অভিমত ব্যক্ত করে। জাতিসংঘ মহাসচিবের পক্ষ থেকে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, সেনা প্রত্যাহার স্থগিত রেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তি লঙ্ঘন করেনি। আফগান উপরাষ্ট্রপতি ১৯৮৮ সালের ২৭ নভেম্বর ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র জেনেভা চুক্তি না মানলে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহার সম্পূর্ণ নাও হতে পারে।

১৯৮৯ সালের শুরু থেকেই পাক-মার্কিন সাহায্যপুষ্ট প্রতিবিপ্লবীরা জালালাবাদসহ অন্যান্য অঞ্চলের উপর রকেট এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রসহ আক্রমণ শুরু করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন মুজাহিদদের সঙ্গে আলোচনায় উদ্যোগী হলেও পাকিস্তান ও ইরানে অবস্থিত সকল গোষ্ঠী আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ৫ ফেব্রুয়ারি কাবুলে সামরিক আইন জারি হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট অংশ ৫ ফেব্রুয়ারির জেনেভা চুক্তির শর্তের দশদিন আগেই আফগানিস্তান ত্যাগ করে। সেনা প্রত্যাহারের পর কাবুলের উপর রকেট আক্রমণ শুরু হয়। তাছাড়া কান্দাহারে সরকার ও মুজাহিদদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। মুজাহিদরা কাবুলসহ অন্যান্য শহরে খাদ্যসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের পথ বন্ধের চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত বাহিনীর প্রত্যাহার সত্ত্বেও মুজাহিদ গেরিলাদের সাহায্যদানে বদ্ধপরিকর ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পাক-মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে। তারা হুমকি দিতে থাকে যে, সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের পর যদি আফগানিস্তানকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হয় তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার দায়িত্ব পালনের জন্য অগ্রসর হবে। প্রতিবিপ্লবীরা একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে। মার্চ মাসে আফগানিস্তানের মুজাহিদরা জালালাবাদ দখলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেও আফগান সরকারের আক্রমণে তারা হেরে যায়। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আফগান বাহিনী মুজাহিদিনদের সঙ্গে সংঘর্ষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন আবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিল।

আফগান সরকার পাকিস্তানের হস্তক্ষেপজনিত সমস্যা আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বানের আবেদন জানায়। পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে 'সাতজোট'* মুজাহিদ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। নজিবুল্লাহ আফগান সীমান্তে জাতিসংঘের তদারকির ব্যবস্থার জন্য মহাসচিবের নিকট আবেদন জানান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নজিবুল্লাহর সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৬ মে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হয়। রাষ্ট্রপতি অস্ত্র সংবরণ এবং আলোচনার জন্য মুজাহিদদের নিকট আবেদন জানান। কিন্তু এ আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হয়। পাকিস্তান সরকার জানায়, আফগান জনগণ নজিবুল্লা সরকারকে গ্রহণ করবে না। শেষের দিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী চলে গেলে নজিবুল্লা সরকারের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে ১৯৯০-এর মার্চে ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ও মার্কিন বাহিনী আফগানদের সাহায্য বন্ধের প্রস্তাবে সম্মত হয়। উভয় রাষ্ট্রই অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য জাতিসংঘের প্রস্তাব কার্যকর করতে রাজি হয় : জাতিসংঘের প্রস্তাব বর্জিত হয়। ১৯৯২ সালে মুজাহিদিনের একটি জোট আফগানিস্তানকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দেয়। নজিবুল্লাহ সরকারের পতন ঘটে এবং মৌলবাদী ও পাক-মার্কিনপন্থি শক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, আফগানিস্তানের এক সময় নাম ছিল এরিয়ানা। আঠারো শতাব্দীতে আফগানিস্তান নামকরণ করা হয়। পর্বতঘেরা আফগানিস্তানের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এই দেশের মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই লড়াই-সংগ্রামের সাথে জীবন কাটিয়ে আসছে। যদিও তারা ছিল শান্ত প্রকৃতির মানুষ, তথাপিও তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে তারা জ্বলে উঠেছে বার বার।

আফগানিস্তানের ইতিহাস বলে, এই দেশটি বার বার বিদেশিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বিদেশিরা কোনোদিনই সাফল্যলাভ করতে পারেনি। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৮ অব্দে আলেকজান্ডার দি গ্রেট আফগানিস্তানে অভিযান চালায়। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এরপর আরবীয় বণিক সম্প্রদায় (৬৫২ এডি), থেকে শুরু করে মাহমুদ গজনী (৯৯৮ খৃ.), চেঙ্গিস খান (১৩ শতাব্দী) বাবর (১৬ শতাব্দী) সবাই কোনো না কোনো সময়ে এ অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। এমনকি ডাকাত বাচ্চা সাকাত্ত-এর কাবুল রাজপ্রাসাদ

---

* 'সাত জোট' এর সদস্যরা হচ্ছে হিজাব ই ইসলামি (গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার), জামায়াতে ইসলামি (বুরহানউদ্দিন রব্বানী), হিজাব ই ইসলামি (ইউনুস খালিস), ইসলামি অল্যায়েন্স (আবদুল রসুল সায়েফ), মিলি ইসলামি মাহাজ (পীর আহমেদ গিলানী), জাবহা নিহাত ই মিলি (সিবঘাতউল্লাহ মুজাদ্দী), হারাকাত ই ইসলামি (নবী মোহাম্মদ)।

দখল করার কাহিনিও অনেকের অজানা নয়। এরই ধারাবাহিকতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের আধিপত্য আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে একমাত্র সোভিয়েত ও আফগান জনসাধারণ আফগান সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান আফগান জনসাধারণকে নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত অধিকার দিতে অসম্মত হয়। তারা যেভাবে আফগান সমস্যা সমাধানে ইচ্ছুক ছিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি।

তালেবান রাজনীতি

বিংশ শতাব্দীতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, আফগানিস্তানে কট্টর ইসলামপন্থীদের উত্থান ও সেখানকার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। 'তালেবান' নামে ব্যাপক পরিচিতি পাওয়া ধর্মান্ধ একটি গোষ্ঠী ১৯৯৬ সালে কাবুলের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। এরা ছিল ধর্মীয়ভাবে অত্যন্ত কট্টর ও আফগানিস্তানে মধ্যযুগীয় ইসলামি শাসন প্রবর্তন করেছিল। যদিও এদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ইঙ্গ-মার্কিন বিমান হামলা ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর আফগানিস্তান দখল করার মধ্যে দিয়ে তালেবান শাসনের পতন ঘটেছিল। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশটি দখল করে নিয়েছিল। এর ঠিক ২২ বছর পর ২০০১ সালের অক্টোবরে দেশটি দখল করে নিল যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৭৯ সালে কাবুলে বারবাক কারমালকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। আর ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্র কাবুলের ক্ষমতায় বসিয়েছে হামিদ কারজাইকে। আফগানিস্তানে প্রভাববলয় বিস্তারের ক্ষেত্রে বৃহৎশক্তির স্ট্রাটেজির কোনো পার্থক্য নেই। তবে তালেবানদের সেখান থেকে উৎখাত করা গেলেও, ২০০৬-২০০৭ সালে তারা আবার সক্রিয় হয়েছে। তারা নতুন করে আফগানিস্তানে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে।

আফগানিস্তানে তালেবানদের উত্থান মাত্র কয়েক বছরের কথা। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমে কান্দাহারের কাশাক নাখুদ নামক স্থানে জনা ত্রিশেক আফগান একত্র হয়। মুজাহিদদের উপদলীয় লড়াই, দেশব্যাপী রক্তপাত, ধ্বংসযজ্ঞ ও অরাজকতার পরিপ্রেক্ষিতে কী করা যায় তা নিয়ে আলোচনায় বসে তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, যুদ্ধের অভিশাপ থেকে অসহায় ও বিপর্যস্ত দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য একটি অভিযান শুরু করতে হবে। আফগানিস্তানে এরাই 'তালেবান' নামে পরিচিত। 'তালেবান' হচ্ছে পশ্‌তু শব্দ যার অর্থ ছাত্র। উর্দু শব্দ 'তালিব ইলম'-এর সঙ্গে এর মিল আছে। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক না কেন, 'তালেবান' বলতে মাদ্রাসা বা ধর্মীয় স্কুলের ছাত্রদেরকে বুঝায়। 'তালেবান'রা মূলত সমাজের দরিদ্রতম অংশ। যুদ্ধের কারণে স্বদেশ থেকে উৎপাটিত, ভিটামাটিচ্যুত, অর্থনৈতিক দুর্দশায় ক্লিষ্ট এ তালেবানদের অনেকেই ছিল এতিম।

তালেবান বাহিনী মূলত মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল। মাদ্রাসার ছাত্রদের সিংহভাগই আফগান। এদের অধিকাংশই পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। এ সকল মাদ্রাসায় এরা বিনাপয়সায় অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান পায়। এরা দেওবন্দী চিন্তাধারার অনুসারী। অনেকে আহলে হাদিস ও বেরেলভী মাদ্রাসায়ও পড়াশুনা করেছে। অর্থনৈতিক কারণে ও জেহাদের প্রেরণায় তরুণ আফগানরা আশির দশকে এসব মাদ্রাসায় ঠাঁই নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী যুদ্ধে

অংশ নেয়া অনেক যুবক সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন সংগঠন থেকে পালিয়ে আসা লোকজনও তালেবানদের সাথে ছিল। তালেবানরা বলতে গেলে প্রায় সবাই পশ্‌তু ও সুন্নি এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত ও অধিকৃত এলাকাগুলো ছিল সবই পশ্‌তু এলাকায়।

তালেবানরা ব্যাপক আফগান জনগণের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল। আফগান সংকট নিরসনে যুদ্ধোন্মাদ নেতাদের বাগে আনার জন্যই এরা তৈরি হয়েছিল। গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধাকেও বিনালড়াইয়ে পশ্চাৎপসারণের ব্যাপারে বিস্ময়কর সাফল্য এরা অর্জন করেছিল। অভিযোগ ছিল পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে তালেবানদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। তালেবানরা নবাগত ছিল না। এদের অনেকেই বিভিন্ন মুজাহিদ সংগঠন থেকে রুশ ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। এ বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার মৌলভী ওমর নিজেও ছিলেন 'হরকত ইনকিলাব-ই-ইসলামি'র কমান্ডার। তালেবানরা রাতের বেলা লড়াই করত এবং প্রায়শই সম্মুখ আক্রমণ চালাত। তালেবান যোদ্ধাদের ভাষায়, "আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং শত্রুকে পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত তরঙ্গের পর তরঙ্গ আকারে এগিয়ে যাই।" তালেবান বাহিনী ছিল অস্ত্র এবং গোলাবারুদে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এদের কাছে বিমান, ট্যাংক ধ্বংসকারী স্টিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র, বিমান ও ট্যাংক বিধ্বংসী কামান, মাল্টিব্যারেল রকেট লাঞ্চার ও সকল শ্রেণীর মাইন ছাড়াও গোলাবারুদের বিশাল ভাণ্ডার ছিল। তালেবান আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল তালেবান শুরা। এই শুরার সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০। শুরার সর্বশেষ প্রধান ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ ওমর। এই সংগঠনটির দুই নাম্বার ব্যক্তি ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ রব্বানী। তালেবান বাহিনীর সদরদপ্তর ছিল কান্দাহারে। আধুনিক আফগানিস্তানের প্রথম রাজধানী ছিল কান্দাহার। কান্দাহার হচ্ছে মুক্তিকামী ও জাতীয়তাবাদী আফগানদের কেন্দ্রভূমি। এই নগরী জরুরি অবস্থায় আফগানদের নেতৃত্ব দেবার জন্যে সুপরিচিত বলে তালেবানরা এটিকে সদরদপ্তর হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন, একটি জাতি সরকারের কাছ থেকে প্রথম যা চায় তা হলো নিরাপত্তা। এরপর তারা দাবি করে কল্যাণ। পরিশেষে চায় উন্নয়ন ও মুক্তি। সোভিয়েত সৈন্যদের আফগানিস্তান ত্যাগের পর তুমুল গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ায় দেশজুড়ে নিরাপত্তাহীনতা তীব্র হয়ে ওঠে। এ সময় ধর্মপ্রাণ তালেবানরা নিরস্ত্রীকরণের কৌশল নিয়ে এগিয়ে আসে। তারা নিজেদেরকে শান্তির দূত হিসেবে প্রচার করল। খুব দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠল তারা। অন্য কোনো গোষ্ঠী আফগানিস্তানের শাসনভার কব্জা করতে ব্যর্থ হবার মূল কারণ তারা যুদ্ধ আর নিরাপত্তাহীনতা ছাড়া আর কিছু দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি।

১৯৯২ সালের ৩০ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে বিভিন্ন মুজাহিদিন গ্রুপগুলোর মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল তাতে দুই বছরের জন্য বুরহানুদ্দিন রব্বানী প্রেসিডেন্ট ও গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরই প্রেসিডেন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙে দেন। এ পর্যায়ে রব্বানী ও হেকমতিয়ারের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠেছিল। অস্ত্রের ভাষায় তারা কথা বলতে শুরু করেন। ফলে ১৯৯৩ এর জানুয়ারি থেকেই সংঘর্ষ শুরু হয়। ওই সময় সৌদি বাদশাহ ফাহাদ শান্তি আলোচনার প্রস্তাব দেন। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের উদ্যোগ এবং ইরান ও সৌদি

আরবের মধ্যস্থতায় ১৯৯৩ সালের জুন মাসে আফগানিস্তানের বিবদমান গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দ এক শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তবে ওই সম্মেলনে শান্তির পক্ষের সকল জটিলতার নিরসন হয়নি। প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দিন রাব্বানী এবং প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার একে অন্যের জানী দুশমনে পরিণত হন। আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের দুদর্শা ওঠে চরমে। হেকমতিয়ার এবং রাব্বানীর একত্রে সহাবস্থান ক্রমেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেখানে অনেক বড় করে দেখা দেয় সংকীর্ণ গোত্রীয় এবং আঞ্চলিকতার সংঘাত।

এই প্রেক্ষাপটেই 'তালেবান'দের উত্থান ঘটে। ১৯৯৫ এর মাঝামাঝি সময়েই আফগানিস্তানের ৩০টি প্রদেশের মধ্যে ১৪টির নিয়ন্ত্রণ তালেবানদের হাতে চলে যায়। ১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তালেবানরা পশ্চিমাঞ্চলীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর হেরাত দখল করে সরকারের ১৭তম সেনা ডিভিশনকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ক্রমশই তালেবানদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৯৬ এর সেপ্টেম্বরে তালেবান বাহিনী কাবুল আক্রমণ করে। ওই বাহিনীর আক্রমণের মুখে বুরহানুদ্দিন রব্বানীর মুজাহিদীন সরকার কাবুল ছাড়তে বাধ্য হয়। তালেবান গোষ্ঠী কাবুল দখল করার পরপরই সরকার গঠন করে এবং দেশে কঠোর শরিয়া আইন জারি করে। এরপর তালেবান কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে অন্য আর কোনো দেশের স্বীকৃতি আদায়ে ব্যর্থ হয়। পরে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাতও স্বীকৃতি দেয়। পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনী তালেবান সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। ১৯৯৬ সালের শেষ নাগাদ সমগ্র আফগানিস্তানের ৯৫ ভাগ এলাকা তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। উত্তরাঞ্চলের মাত্র ৫ ভাগ এলাকা কেবল বিরোধী জোটের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

তালেবানদের দ্রুত উত্থানের নেপথ্য নায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন আমীর উল-মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর। বয়স আনুমানিক চল্লিশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তিনি এক চোখ হারান। তিনি তালেবান সদরদফতর দক্ষিণাঞ্চীয় কান্দাহার নগরীতে বসবাস করতেন। প্রকাশ্যে খুব কমই আসতেন তিনি। তালেবানদের দ্রুত উত্থানের পিছনে একটি বিষয় টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। ১৯৯৪ সালের শেষভাগে ইসলামাবাদ সরকার পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে মধ্য-এশীয়ায় (সাবেক সোভিয়েত মধ্য-এশীয় প্রজাতন্ত্র তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান) নতুন বাণিজ্যিক রুট খোলার ঘোষণা দেবার পরপরই তালেবানরা সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে তালেবানদের নাটকীয় উত্থানের পর তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় মেয়েদের কঠোরভাবে পর্দা মানতে বাধ্য করা হয়। নারী শিক্ষার প্রসারে তারা মোটেও উৎসাহী ছিল না। কান্দাহার ও অন্যান্য নগরীতে একদল তালেবান কাঁচি হাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত এবং লম্বা চুলওয়ালা যুবকদের পেলেই তাদের চুল ছেঁটে দিত। তাদের বক্তব্য চালচলন, বেশবাস, চোহারা সবকিছুই শরিয়তসম্মত ছিল। তালেবানদের এলাকায় ফুটবল, ভলিবল, কারাতে, দাবা প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল। জীবন্ত কোনো কিছুর ছবি তোলা তারা সমর্থন করত না। তাদের এলাকায় ইসলামি আদালত ছিল। অপরাধ অনুযায়ী হাত, পা কেটে ফেলার মতো ব্যবস্থাও ছিল। তালেবানরা প্রথমবাস্থায় বেশ কম সময়ের মধ্যে তাদের এলাকায় নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনলেও

পরবর্তীকালে তারা আফগানিস্তানের সার্বিক অবস্থাকে তছনছ করে দেয়। তাদের হাতে ছিল সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। তালেবানদের মধ্যে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ২৫ হাজার সক্রিয় সদস্যও ছিল। তারা আফগানিস্তানে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে শান্তির পথে নতুন করে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছিল। চরদখলের মতো এলাকা দখল, পুনর্দখলের মাধ্যমে তারা আফগানিস্তানের ৯৫ শতাংশ এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েছিল।

তালেবানদের উত্থানের পর তারা প্রায় পাঁচ বছর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ওই সময় তারা আফগানিস্তানের চেহারা খোলনলচে সমূলে পাল্টে ফেলে। প্রাক্তন তালেবান নেতা সাইয়ীদ রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌ নাশেমীর মতে তালেবানদের প্রধান অর্জনসমূহ ছিল নিম্নরূপ: ১. তালেবানরা খণ্ড-বিখণ্ড আফগানিস্তানকে একত্র করে। আফগানিস্তান আগে পাঁচ ভগ্নাংশে খণ্ডিত ছিল। তালেবানরা একে জোড়া লাগায় এমন সময়ে যখন এ কাজ আর কেউ করেনি; ২. তালেবানরা আফগান জনগণকে নিরস্ত্র করে। যুদ্ধের পর প্রতিটি আফগানের কাছে একটা কালাশনিকভ রাইফেল ছিল। এমনকি তাদের নিয়ন্ত্রণে ওই সময় ফাইটার প্লেন এবং ফাইটার হেলিকপ্টার ছিল। এই লোকগুলোকে নিরস্ত্র করার দুরূহ দায়িত্ব তালেবানরা পালন করে; ৩. তালেবানরা আফগানিস্তানে একটি একক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে যা এর পূর্বে ১০ বছর ধরে সেখানে ছিল না; ৪. একসময় আফগানিস্তান বিশ্বের ৭৫ শতাংশ আফিম উৎপাদন করত। তালেবানরা বিশ্বের আফিম চাষের ৭৫ শতাংশ কমিয়ে আনে; ৫. তালেবানরা মানুষকে একটি নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। এছাড়া তারা সকল আফগানের জন্য অভিন্ন বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও তালেবানরা তাদের পতন রোধ করতে পারেনি। ২০০১ সালের অক্টোবর তাদের চূড়ান্ত পতন ঘটে। তালেবানদের পতনের কারণগুলো পর্যালোচনা করতে গেলে আমরা মূলত যে সকল কারণ খুঁজে পাই তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ১. তালেবানরা নিজেদেরকে ইসলামি আদর্শে অনুপ্রাণিত বলে দাবি করে। কিন্তু তাদের কেউ কেউ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। ফলে তাদের পক্ষে যে আফগানিস্তানে ঐক্যবদ্ধ ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়–এ ব্যাপারে সাধারণ আফগানরা সন্দিহান হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে তালেবান সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযানের সময় সাধারণ আফগানদের অধিকাংশের সমর্থনই তালেবান সরকারের পেছনে ছিল না; ২. তারা এমন একটি সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় গ্রুপ ছিল যারা ছবি তোলায়ও আপত্তি করে। তাদের মাত্রাতিরিক্ত সংস্কারাচ্ছন্নতা তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে; ৩. ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর টুইন টাওয়ার ট্রাজেডি তালেবানদের পতনের মূলে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে। আমেরিকানরা টুইন টাওয়ার হামলার মূলে "আল কায়েদা নেটওয়ার্ক"-কে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী বলে সন্দেহ করে। আর আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের সাথে তালেবানদের সরাসরি সম্পৃক্ততার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। হামলাকারীদের নেতৃত্বে ছিল ওসামা বিন লাদেন। তাকে আশ্রয় দিয়েছিল তালেবান শাসিত আফগানিস্তান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের উপর এই হামলাকে 'সভ্যতার উপর আক্রমণ' বলে আখ্যায়িত করে। তারা হামলাকারীদের মদদদাতা হিসেবে তালেবানদের চিহ্নিত করে এবং তাদেরকে

সমূলে উৎপাটনের লক্ষ্যে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। ফলে তালেবানদের পতন ত্বরান্বিত হয়; ৪. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের দোহাই দিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানে যে অভিযান পরিচালনা করে তার মূলকারণ হিসেবে আফগানিস্তানে শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। প্রকারন্তরে মার্কিন স্বার্থরক্ষা করাই ছিল মূলউদ্দেশ্য। এতে করে তালেবানরা তাদের একসময়কার মদদদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোপানলে পড়ে এবং তাদের পতন ঘটে; ৫. ধর্মীয় বিধিবিধান ও শারিয়া শাসন প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে তালেবানরা সমগ্র আফগানিস্তানের জনগণের উপর যে বাধ্যতামূলক, জবরদস্তিমূলক কালাকানুন ও গোঁড়ামিপূর্ণ বিধিবিধানসমূহ চাপিয়ে দেয় আফগান জনগণ সেসব মন থেকে মেনে দিতে পারেনি। ফলে, দেশে তালেবান সরকারের পায়ের তলার মাটি দিনকে দিন সরে যেতে থাকে। বহির্বিশ্বও তালেবানদের জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডে সমর্থন জোগায়নি। তারাও তালেবান সরকারের গদি রক্ষার্থে এগিয়ে আসেনি। ফলে, দেশে-বিদেশে ব্যাপক গণরোষ তালেবান সরকারের পতনকে ত্বরান্বিত করে; ৬. শাসনকার্যে পূর্বের অনভিজ্ঞতা ও অদক্ষতা এবং নেতৃত্বের শূন্যতা তালেবানদের পতনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করেছিল বলে মনে করা হয়; ৭. টুইন টাওয়ার ট্রাজেডির পর বুশ প্রশাসন এক পর্যায়ে বিন লাদেনকে হস্তান্তরের বিনিময়ে তালেবান কর্তৃপক্ষকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান নিয়েও দরকষাকষি করেছিল। ওই সময় বুশ প্রশাসন থেকে বলা হয়, "আমাদের সোনার কার্পেটের প্রস্তাবটি মেনে নাও আর নয়তো বোমার কার্পেটের নিচে তোমাদের কবর রচিত হবে।" পরবর্তীকালে মার্কিনীদের এ হুমকি সত্য হয়ে দেখা দেয় এবং তালেবানদের পতন ঘটে।

উপসংহার

আফগানিস্তানের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হচ্ছে তালেবানদের শাসন। আফগানিস্তান বারবার আক্রান্ত হয়েছে। হামিদ কারজাই-এর নেতৃত্বে সেখানে বর্তমানে একটি সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ সেখানে পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়েছে, এটা বলা যাবে না। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তালেবানরা সেখানে তাদের তৎপরতা চালাচ্ছে। সেখানে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ও ন্যাটোর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু তারা সেখানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, তা বলা যাবে না। একটি রাজনৈতিক কাঠামোর সেখানে জন্ম হয়েছে সত্য, কিন্তু তা আফগানজাতিকে একত্র করতে পারেনি। স্পষ্টতই হামিদ কারজাই সরকার আফগানিস্তানের সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইতোমধ্যে তিনি তালেবানদের সাথে 'সংলাপ'-এর ডাক দিয়েছেন। সুতরাং একুশ শতকে আফগানিস্তান যে আলোচনায় থাকবে, তা বলাই বাহুল্য।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. তারেক শামসুর রেহমান, নয়া বিশ্বব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ঢাকা, ২০০২
২. তারেক শামসুর রেহমান, বিশ্বরাজনীতির চালচিত্র, ঢাকা ২০০৬
৩. ইকবাল কবীর মোহন, মুসলিম বিশ্বে আগ্রাসন, ঢাকা, ২০০৪

ষোড়শ অধ্যায়

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন

Perestroika is also flawed in some aspects. Almost everything done under its banner is new and unprecedented for the Soviet Union. The economic reforms don't seem to have produced any substantial results so far. The agrarian reforms have been diluted. He (Gorbachev) has set into motion a historical process that, although it maybe delayed, amended or slowed down, is nevertheless essentially irreversible.

Baruch A. Hazan
(Gorbachev and his Enemies;
The Struggle for Perestroika, 1990)

বিংশ শতাব্দীর আলোচিত ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের উত্থান ও একই সঙ্গে শতাব্দীর শেষের দিকে সেখানে সমাজতন্ত্রের পতন। সমাজতন্ত্র বিশ্বরাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। সমাজতন্ত্র শ্রেণী বৈষম্যরোধ, পশ্চিমা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাব গড়ে তোলা, রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক সফল উত্থান ঘটায়। জার্মান নাগরিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-'৮৩) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব দ্বারা অন্যান্য দেশকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছিল। সেই রেশ ধরেই চীনে, কিউবাতে সমাজতন্ত্র পূর্ণতা রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তৃতীয় বিশ্বের বেশ কিছু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন দিয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। লেনিনের নেতৃত্বে ওই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বরাজনীতিতে একটি শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক সময় উন্নয়নশীল বিশ্বের জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে ছিল আদর্শ। তাঁরাও একসময় স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁদের স্ব স্ব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার। কালের বিবর্তনে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের মূলমন্ত্রকে ধরে রাখতে পারেনি এবং সমাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় লালিত নায়কের দ্বারাই সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে। পতন ঘটে পূর্ব ইউরোপেও। কিন্তু চীনে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেনি। ঘটেনি ভিয়েতনামেও। চীন সমাজতন্ত্রকে নতুন আঙ্গিকে

উপস্থাপন করেছে। বাজার অর্থনীতির কিছু কিছু উপাদান নিয়ে সমাজতন্ত্রের নতুন একটি ব্যাখ্যা দিয়েছে চীন। কার্ল মার্কস যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চিন্তা করেছিলেন, যেখানে হয়তো তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি যে ওই সমাজব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। গরবাচেভ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এই দুই ক্ষেত্রে সংস্কার আনতে গিয়ে বিপত্তিটা বাধিয়েছিলেন। ভেঙে গিয়েছিল রাষ্ট্রব্যবস্থা, সেইসাথে পতন ঘটেছিল সমাজতন্ত্রের। চীনেও সংস্কার এসেছে। কিন্তু তা সীমাবদ্ধ শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চীন বা ভিয়েতনাম কোথাও সংস্কার হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতনকে বুঝতে হলে আমাদের একটু পেছনে তাকাতে হবে।

মার্কসবাদ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লবের অন্যতম কারণ প্রধানত ছিল দুটি। প্রথমত, রাশিয়ার শাসক ও শোষকশ্রেণীর রাজ্যশাসনে ব্যর্থতা। দ্বিতীয়ত, লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত বলশেভিকদের সুযোগ্য নেতৃত্ব। রাশিয়ার শাসক ও শোষিতশ্রেণীর ভেতরকার ব্যবধান এবং জাপানের সঙ্গে (১৯০৫) যুদ্ধে পরাজয়, পরবর্তীকালে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির সঙ্গেও শোচনীয় পরাজয়, জার শাসকের ভিত্তি দুর্বল করে ফেলে। সেই যুগে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের যে সকল ঘাঁটি ছিল তার মধ্যে জার শাসিত আধা-সাম্রাজ্যবাদী ও আধা সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়া ছিল সর্বাধিক দুর্বল। আর সেই দুর্বল স্থানে আঘাত হেনেছিল শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাধিক সুসংগঠিত বৈপ্লবিক দল-সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির একটি অংশ, যারা বলশেভিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

লেনিন, মার্কসের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং রাশিয়াতে সর্বপ্রথম সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূলত, মার্কসীয় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই লেনিন তাঁর সাম্যবাদী আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ইতিহাস বিশ্লেষণ করে মার্কস লক্ষ করেন যে, মানুষের জীবনের মূলভিত্তি হলো অর্থনৈতিক এবং ইতিহাস হলো বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার জন্য দ্বন্দ্বের বিবরণ মাত্র। তাঁর মতে, কয়েকটি যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ অথবা কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনীসমষ্টির সমবায়ে ইতিহাস রচিত হয় না। তাঁর মতে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎস হলো অর্থনীতি আর সমাজে মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের শোষণ করে। কিন্তু এরূপ অসমব্যবস্থা সমাজে অনেকদিন স্থায়ী হতে পারে না। এর ফলে সমাজজীবনে এক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া অনিবার্যরূপে দেখা দেয়, যার ফলে পুরাতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়ে এক নতুন ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। কার্ল মার্কস এভাবে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কস ১৮৪৮ সালে তার বিখ্যাত 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' (Communist Manifesto) নামক ইশতেহারটি প্রকাশ করেন। ওই ইশতেহারটিই ছিল সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা। ১৮৬৭ সালে লন্ডনে থাকাকালীন মার্কস তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দাস ক্যাপিটাল' (Das Kapital) রচনা করেন তার জীবদ্দশায় প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার মৃত্যুর পর অবশিষ্ট দুই খণ্ড

প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিকে 'সমাজতন্ত্রের বাইবেল' হিসেবে অনেকে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত মার্কসের সাম্যবাদ চারটি সূত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এগুলো হচ্ছে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব ও সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র। মার্কস বলেছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্র বলতে কিছু থাকবে না, রাষ্ট্র বিলীন হয়ে যাবে। তখন কমিউনিজম বা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

মার্কসীয় এই অর্থনৈতিক মতাদর্শকে লেনিন সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন এবং তাঁর চিন্তাধারা ও কর্ম ওই সময় ও পরবর্তী যুগের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে পথ প্রদর্শন করেছে। যদিও গরবাচেভ এবং তাঁর রাজনীতিই সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্তির জন্য দায়ী বলে অনেকে মনে করেন, তথাপি এটা কেউ কেউ স্বীকার করেন সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে বিগত ৭৩ বছরের সমাজতন্ত্রের যে বিকাশ (১৯১৭-১৯৯১), তা বুঝতে হলে আমাদের লেনিন থেকে শুরু করে ব্রেজনেভ এবং গরবাচেভের শাসনামলে সমাজতন্ত্রের যে বিকাশ ঘটেছিল, তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

লেনিন : বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পর লেনিন খুব বেশিদিন (১৯১৭-১৯২২) রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ওই সময়টুকুর আদর্শগত দিক ছাড়াই এটা বলা যায় যে, লেনিনের সময়টুকু রাশিয়ার ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে মুক্ত ও নবদিগন্তের যুগ। কেবল রুশ বলশেভিক পার্টির সংগঠক ও নব্য রাশিয়ার জনক হিসেবেই নয়, বিশ্বের শোষিত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রতীক হিসেবে লেনিন সর্বদেশের ও সর্বকালের জনগণের নমস্য ব্যক্তি ছিলেন। উপনিবেশের শোষিত জনগণের মুক্তিআন্দোলনে তিনি ছিলেন দিশারী। লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রবাদ ও পরিকল্পিত অর্থনীতির ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়া একটি বিশেষ স্থান দখল করে। লেনিন ছিলেন বাস্তববাদী একজন মানুষ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পরই তিনি রাশিয়ার অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের চেষ্টা করেননি। নভেম্বর বিপ্লবের অব্যবহিত পরে যে অর্থনৈতিক নীতি তিনি অনুসরণ করেছিলেন, তাকে বলা হতো 'নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র'। লেনিন মনে করতেন সর্বহারার শাসন কায়েম হবার সাথে সাথে রাতারাতি অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। এই রূপান্তর হবে ধীরে ধীরে। ১৯২১ সালে লেনিন নতুন অর্থনৈতিক নীতি চালু করেছিলেন। তাতে বাজারব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সাথে সাথে সমবায় সমিতিগুলোকে বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। বাজার ব্যবস্থা ও মুদ্রার ব্যবহার পুনঃপ্রচলিত হয়েছিল। কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। এভাবেই পরিস্থিতিকে সামাল দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন লেনিন। লেনিন কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নেই নয়, সারাবিশ্বে সমাজতন্ত্রকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং খুব অল্পসময়ে তাঁর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা তাঁকে তৃতীয় বিশ্বের জনগণের আস্থাভাজন করে তুলেছিল।

স্ট্যালিন : একদেশ একসমাজতন্ত্র

লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনভার স্ট্যালিনের হাতে চলে আসে। তিনি ক্ষমতায় ছিলেন ১৯২২ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত। স্ট্যালিন একটি অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের কথা চিন্তা করেছিলেন এবং আত্মরক্ষার নীতিও সমর্থন করেছিলেন। অভ্যন্তরীণ বিপ্লব তিনি এ কারণে সমর্থন করেছিলেন যে, সেখানে সমাজতান্ত্রিক শাসন ক্রমবর্ধমান সমাজ দ্বারা আক্রান্ত হবার ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হবে। *"একদেশ একসমাজতন্ত্র"* এটাই ছিল স্ট্যালিনের মতবাদ এবং তার মতে, এর মাধ্যমেই নজিরবিহীন পরিবর্তন সম্ভব। সমাজতন্ত্রের দীর্ঘ ৭৩ বছরের শাসনামলে স্ট্যালিন শাসন ক্ষমতায় ছিলেন মোট সময়ের সিকিভাগ। স্ট্যালিনের আমলে রাষ্ট্রউন্নয়ন ও সামাজিক পুনর্গঠনে রাষ্ট্রশক্তির ব্যবহার উচ্চতর স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। *"একদেশ একসমাজতন্ত্র"*-এর সফল প্রয়োগে রাষ্ট্রের মর্যাদা, সমৃদ্ধি, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা সব কিছুই বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্ট্যালিন সেই সময় ব্যাপক শিল্পায়নেরও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের আলোকে পাশ্চাত্য মনোভাব অনুযায়ী স্ট্যালিনবাদ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি দ্ব্যর্থক ঘটনা, যখন মন্দের চেয়ে ভালোর পাল্লা যথেষ্ট ভারী ছিল। স্ট্যালিনের আমলে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপক শিল্পায়ন হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের প্রসার ঘটেছিল এবং বিশ্বরাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি অন্যতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। স্ট্যালিন মনে করতেন, ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখা সম্ভব। আর এভাবেই তিনি একসাথে বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণা পরিত্যাগ করেছিলেন।

ক্রুশ্চেভ : শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর নিকিতা ক্রুশ্চেভ (১৯৫৩-১৯৬৪) ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। নিকিতা ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় আসার পর স্ট্যালিন আমলের হত্যা ও বিচারের নিন্দা করেন এবং এরকম ঘটনা আর না ঘটার প্রতিশ্রুতি দেন। ক্রুশ্চেভ মূলত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী দুই সমাজব্যবস্থা, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সহাবস্থান সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু ক্ষমতার ভেতরে ও বাইরে লড়াই তাতে থামেনি। সেই লড়াইয়ের এক পর্যায়ে অসীম শক্তিধর রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেরিয়া ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছিলেন এবং তার কিছুকাল পরে অপসারিত হয়েছিলেন স্ট্যালিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মলোটভ, মালেনকভ এবং কাগানোভিচ। শেষ পর্যন্ত ক্রুশ্চেভ নিজেও এ লড়াইয়ের শিকার হয়ে ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছিলেন। কিন্তু ক্রুশ্চেভ জামানার বড় অবদান হলো, বিশ্বআসরে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা। ক্রুশ্চেভ একটি বৈরী মনোভাব থেকে 'সহনশীল পার্টনার' হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশ্বসভায় তুলে ধরেছিলেন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে করে যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সকল ধরনের বিবাদমীমাংসার তথা আলাপ-আলোচনার ভিত্তি তিনি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

সারণি : ১৯

সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

১৯০৩	রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিভ পার্টি দুভাগে বিভক্ত—বলশেভিক ও মেনশেভিক।
১৯১৭	রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। লেনিনের ক্ষমতা গ্রহণ। ট্রটস্কি কর্তৃক রেড আর্মির নেতৃত্ব গ্রহণ। বলশেভিকরা ক্ষমতায়।
১৯২২	স্ট্যালিন পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত। সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন নামকরণ ইউনাইটেড সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিক।
১৯২৪	লেনিনের মৃত্যু। স্ট্যালিনের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রক্রিয়া শুরু।
১৯২৮	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।
১৯২৯	স্ট্যালিন কর্তৃক এককভাবে ক্ষমতা করায়ত্ত। ট্রটস্কির দেশত্যাগ।
১৯৫৩-৫৫	ক্রুশ্চেভ-মালেনকভ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। স্ট্যালিনের মৃত্যু।
১৯৫৫	ক্রুশ্চেভ কর্তৃক মালেনকভ বিতাড়িত।
১৯৬৪	ব্রেজনেভ কর্তৃক ক্রুশ্চেভ বিতাড়িত।
১৯৮২	ব্রেজনেভের মৃত্যু। আন্দ্রেপভ ও চেরনেনকোর ক্ষমতা গ্রহণ।
১৯৮৫	চেরনেনকোর মৃত্যু। গরবাচেভের ক্ষমতা গ্রহণ।
১৯৮৭	'গ্লাসনস্ট' ও 'পেরেস্ত্রোইকা'র রাজনীতি শুরু।
১৯৯০	কমিউনিস্ট পার্টির একক ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত। গরবাচেভের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্তি। গরবাচেভের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী লিগাসভের রাজনৈতিক পরাজয় ও রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ।
১৯৯১	ইয়েলৎসিনের উত্থান। সাধারণ ভোটে রুশান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট নিযুক্তি। গরবাচেভের বিরুদ্ধে কনজারভেটিভদের ব্যর্থ অভ্যুত্থান। ইয়েলৎসিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। সোভিয়েত রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে যাওয়া।

ব্রেজনেভ : স্থবিরতার যুগ

ক্রুশ্চেভীয় সংস্কারের মূলকথা ছিল স্ট্যালিনের রাজনীতির বিরোধিতা, রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিজেদের স্থান মজবুত করে নেয়া। নিজেদের স্থান মজবুত করে ফেলার পর নতুন ক্ষমতাশালী শ্রেণীর কাছে ক্রুশ্চেভের আর দরকার রইল না। তারা ক্ষমতায় নিয়ে এলো তাদের পছন্দের ব্রেজনেভকে। এটা উল্লেখ করা দরকার যে, সত্তর দশকের শেষের দিকে এবং আশির দশকের শুরুতে শ্রমিকদের আয় দ্রুত বেড়ে যায় এবং তাদের জীবনযাপনের ধরনেরও রূপান্তর ঘটে। এই আর্থিক উন্নতির ফলে ব্রেজনেভের আমলে বড় ধরনের কোনো শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট বা প্রতিবাদ ঘটেনি। এটা ছিল সেই আমলের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি ব্রেজনেভ আমলে সেনাবাহিনী ও মাথাভারী আমলাতন্ত্রেরও সম্প্রসারণ ঘটেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক মোকাবেলায় সমান সমান হয়ে ওঠে, ফলে বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক আধিপত্যও বেড়ে গিয়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। ব্রেজনেভের সংস্কার কর্মসূচি ১৯৬৫ সাল থেকে শুরু হয়। যদি সেই নীতিকে ব্রেজনেভ টিকিয়ে রাখতেন তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক উন্নতি আরও বহুদূর অগ্রসর হতে পারত। কিন্তু ব্রেজনেভ ও ক্ষমতাসীন চক্র

সেই নীতি অচিরেই পরিত্যাগ করে বসলেন। কারণ পার্টি কাঠামোর সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরোধ দেখা দেয়া শুরু হয়েছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর পার্টির কর্তৃত্ব সবসময় বজায় রাখা যাচ্ছিল না। এই সংঘাত এড়াবার জন্য ব্রেজনেভ তাঁর সংস্কার কর্মসূচি থেকে অতিদ্রুতই আবার আগের জায়গায় ফিরে গিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের মধ্যে সংস্কারের সকল উদ্যোগ ও উদ্যমের দৃশ্যত অবসান ঘটল। উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্রেজনেভীয় সংস্কার মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। কলকারখানাগুলো তাদের মেশিনপত্র নবায়নের কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করত না। কারণ এতে কোনো সুবিধা অর্জিত হচ্ছে বলে মনে হতো না। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি কলকারখানায় বিপুল পরিমাণ কেন্দ্রীয় অর্থ বিনিয়োগ করা হতো এবং লোকবল, অর্থবল ও সয়সম্পদ বিপুল পরিমাণে খাটিয়েও অর্থনীতির দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাচ্ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের বিপুল অর্থব্যয়ের কারণে লোকের হাতে টাকা এসে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু টাকার পরিবর্তে কেনার মতো পর্যাপ্ত ভোগ্যবস্তুর জোগান অর্থনীতি দিতে পারত না। খাদ্যের দাম ছিল নির্দিষ্ট। একদিকে কৃষিশ্রমের উৎপাদনশীলতা ছিল কম অপরদিকে নাগরিকদের চাহিদাও বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৮০ সালের শুরুর দিকে সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই উপলব্ধি গাঢ় হতে থাকল যে ব্রেজনেভীয় সংস্কারের দম ফুরিয়ে আসছে। স্থিতিশীলতার কালপর্বে যে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছিল তারই ফলে জনগণের মধ্যে একটা স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং নাগরিক ও মানবিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়তে লাগল। আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সঙ্গে জনগণের স্বার্থের সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। ব্রেজনেভ আমলের সবচেয়ে খারাপ দিকটি ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে আফ্রিকায় তরুণ দেশ অফিসারদের নেতৃত্বে যেসব সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল, তাদের সমর্থন করা এবং তাদেরকে অস্ত্রসস্ত্র সরবরাহ করা। সোভিয়েত তাত্ত্বিকরা মনে করতেন, ওইসব তরুণ অফিসারদের দিয়ে (ইথিওপিয়া, এঙ্গোলা, মোজাম্বিক, ইয়েমেন ইত্যাদি) সেই সব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্রেজনেভীয় জামানায় নিজেও আফগানিস্তানে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছিল (১৯৭৯)। যে কারণে ব্রেজনেভের শাসনামলের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমাবিশ্বের সাথে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছিল। ব্রেজনেভের আমলে দুই পরাশক্তির মাঝে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বেড়েছিল। তবে এটাও সত্য তার শাসনামলেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ বা স্বল্প আলোচনা শুরু করেছিল ও এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল।

গরবাচেভের সময়কাল

১৯৮৫ সালে মিখাইল গরবাচেভ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তাঁর পূর্বে দীর্ঘ শাসনকালের বিভিন্ন রূপের ও সমাজতন্ত্রের ভিন্ন প্রয়োগের ফলে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই সংকটময় ছিল। গরবাচেভের শাসনআমলের শুরুর পর্যায়ে সেদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে কোনো উন্নত দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। উৎপাদনে চরম স্থবিরতা দেখা গিয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সবাই তাদের মতে অনড় ছিল। এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। গরবাচেভ এ অবস্থা

থেকে মুক্তির জন্য দুটি নীতির কথা ভাবেন। এ দুটি নীতি হলো ১. গ্লাসনস্ত; ২. পেরেস্ত্রোইকা। এ দুটি নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নতুন জটিলতা। এভাবে গরবাচেভের ক্ষমতা গ্রহণের সময়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এবং গরবাচেভের ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রস্তাবিত দুটি নীতি বাস্তবায়ন নিয়ে নতুন করে সৃষ্ট জটিলতার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনীতিতে চরম অরাজকতা বিরাজ করছিল। এই অরাজকতাই শেষ পর্যন্ত গরবাচেভের পতন ডেকে আনে। তিনি ২৫ ডিসেম্বর (১৯৯১) পদত্যাগ করেছিলেন। আগস্টে (১৯৯১) ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান, একই বছর রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইয়েলৎসিনের বিজয় ইত্যাদি সবই ছিল একই সূত্রে গাঁথা। আগস্টের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গরবাচেভের ক্ষমতা খর্ব হয়েছিল। ১৭ ডিসেম্বর (১৯৯১) গরবাচেভ ও ইয়েলৎসিন ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন যে নতুন বছরের শুরুতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘোষিত হবে। গরবাচেভ এজন্য সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশনও ডেকেছিলেন। কথা ছিল সুপ্রিম সোভিয়েতের ওই অধিবেশনেই রাষ্ট্রের বিলুপ্তি কার্যকর হবে। তিনি এর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রিপাবলিকগুলোকে নিয়ে একটি দুর্বল 'কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটস (সিআইএস), গঠন করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল একটি দুর্বল রাষ্ট্র কাঠামো টিকিয়ে রাখা। কিন্তু ইয়েলৎসিন চেয়েছিলেন রিপাবলিকগুলোর স্বাধীনতা এবং শেষপর্যন্ত তাই হয়েছিল। গরবাচেভ যে স্বাধীন রিপাবলিকগুলোর একটি দুর্বল কনফেডারেশন গঠনের দাবি উত্থাপন করেছিলেন, তা শেষপর্যন্ত রিপাবলিকগুলোর নেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। উপরন্তু ডিসেম্বরে ('৯১) ইতালিয়ান একটি সংবাদপত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ইয়েলৎসিন গরবাচেভকে পদত্যাগের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ইয়েলৎসিন এও বলেছিলেন, স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর কমনওয়েলথে গরবাচেভের কোনো ভূমিকা থাকবে না। আগস্টের ('৯১) দুনিয়া কাঁপানো তিনদিনের ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের পর গরবাচেভ ক্ষমতায় ফিরে এসেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি পরিণত হয়েছিলেন দুর্বল ব্যক্তিতে। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই ক্ষমতার পাদপ্রদীপের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন ইয়েলৎসিন। মাত্র ৪ মাসের ব্যবধানে এটাই প্রমাণিত হয়েছিল ইয়েলৎসিন হচ্ছেন নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রের নেতা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটেছিল একটি ইতিহাসের। সেই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা। জড়িয়ে আছে আগ্রাসী ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের কথা। জড়িয়ে আছে তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থনের ইতিহাস। সোভিয়েত রাষ্ট্রের ৭৩ বছরের ইতিহাস কখনো উজ্জ্বল হয়েছে, কখনো বা আবার ম্লান হয়েছে। গত ৭৩ বছরের সোভিয়েত রাজনীতি যেমনি প্রশংসিত হয়েছে (ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন) তেমনি বিতর্কিতও হয়েছে (আফগানিস্তান আগ্রাসন)। তবে বলতে বাধা নেই, প্রভাববলয় বিস্তারের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে দুই বৃহৎশক্তি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে একসময় জন্ম হয়েছিল স্নায়ুযুদ্ধের। গরবাচেভ সেই স্নায়ুযুদ্ধ আর পারস্পরিক দুসমাজ ব্যবস্থার মধ্যে চিরদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন। গরবাচেভ শুরু করেছিলেন নতুন এক বিশ্বব্যবস্থায় পারস্পরিক নির্ভরশীলতার রাজনীতি। ইতিহাসে তিনি যেভাবেই চিহ্নিত হোন না কেন, ইতিহাসে এটাও লেখা থাকবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব বিলুপ্তির জন্য গরবাচেভ ও তাঁর রাজনীতিই দায়ী।

সারণি : ২০
সোভিয়েত ইউনিয়ন : এক নজরে

রিপাবলিক	আয়তন কি.মি.)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	রুশ জনগণের হার (জন)	সোভিয়েত ইউনিয়নে সংযুক্তি
রাশিয়া	১৭০৭৫৪০০	১৪৮	৮২.২	১৯২২
ইউক্রেন	৬০৩৭০০	৫২	১৬.৯	১৯২২
বেলারুশ	২০৭৬০০	১০.৩	৮.২	১৯২২
এস্টোনিয়া	৪৫১০০	১.৪৬	২০.১	১৯৪০
লেটল্যান্ড	৬৩৭০০	২.৫২	২৬.৬	১৯৪০
লিথুনিয়া	৬৫২০০	৩.৩৯	৮.৫	১৯৪০
মলদোভিয়া	৩৩৭০০	৪.৪	১০.২	১৯৪০
আর্মেনিয়া	২৯৭০০	৩.৩	৩.২	১৯২০
জর্জিয়া	৬৯৭০০	৫.৪	১০.১	১৯২১
আজারবাইজান	৮৬৬০০	৭.১	১৩.৬	১৯২০
কাজাকিস্তান	২৭১৫১০০	১৬.৭	৪৩.২	১৯২০
কির্ঘিস্তান	১৯৮৫০০	৪.৪	৩০.২	১৯২১
তাজাকিস্তান	১৪৩১০০	৫.২	১৩.৩	১৯২৪
তুর্কমেনিস্তান	৪৮৮১০০	৩.৬	১৭.৩	১৯২৫
উজবেকিস্তান	৪৪৯৬০০	২০.৩	১৩.৫	১৯২৪

সারণি : ২১
তুলনামূলক চিত্র : সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিশ্ব

দেশ	গাড়ি (প্রতি (১০০০)	টেলিফোন (প্রতি ১০০০)	টিভি সেট (১০০০)	ক্যালরি গ্রহণ (দিনপ্রতি)	ডাক্তার (কত জনে)	শিশুমৃত্যু (১০০০)
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৬৯	৯৮	২৯৬	৩৪২৬	৪৮০	২৫
পোল্যান্ড	১১২	১১৮	৮৫	৩৩৩৬	৪৯০	১৮
চেকোশ্লাভা-কিয়া	১৭৩	২২৬	১২২	৩৪৪৮	২৮০	১৩
জাপান	২৩৫	৫৩৫	২৫০	২৮৬৪	৬৬০	৬
যুক্তরাষ্ট্র	৭০০	৬৫০	৬২১	৩৬৭৪	৪৭০	১০
ব্রাজিল	৮০	৯০	১৮৪	২৬৫৬	১০৮০	৬৩
আয়ারল্যান্ড	২০৬	২৩৫	১৮১	৩৬৩২	৬৮০	৭

সূত্র : ফিনানসিয়াল টাইমস, লন্ডন ১২ মার্চ, ১৯৯০।

সারণি : ২২
রুশ কমনওয়েলথের পারমাণবিক অস্ত্রের উৎস

দেশ	আইসিবিএম	বোমারু বিমান	ওয়ারহেডের সংখ্যা
ইউক্রেন	১৭৬	৩০	৪৩৫৬
রেলারুশ	৭২	০	১২২২
কাজাকিস্তান	১০৪	০	১৬৯০
রাশিয়া	১০৩৫	৭০	১৭৫০৫

সূত্র : টাইমস, ১৬ ডিসেম্বর. ১৯৯১

কেন গরবাচেভ ব্যর্থ হলেন

গরাবচেভ ক্ষমতায় এসেছিলেন ১৯৮৫ সালে। সংস্কার কর্মসূচির কথা তিনি বলেন ১৯৮৭ সালে। গরবাচেভ তার সংস্কার কর্মসূচির কথা বলেছেন দুভাবে— 'গ্লাসনস্ত' যার আভিধানিক অর্থ দুয়ার খোলা নীতি, আর 'পেরেস্ত্রোইকা' যার অর্থ দাঁড়ায় পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন। গরবাচেভ তার সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সবকিছু 'ওপেন' করে দিয়েছিলেন। গরবাচেভ বলেছিলেন ব্যুরোক্রেসিমুক্ত একটি সমাজব্যবস্থার কথা। বলেছিলেন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পার্টির কর্মকর্তা নির্বাচন করার প্রক্রিয়া শুরু করার কথা। বলেছিলেন, সরকার ফ্যাক্টরি প্রশাসক নির্ধারণ করবে না। এরা নিযুক্ত হবেন কর্মচারীদের ভোটে। বলেছিলেন, ফ্যাক্টরিগুলোর প্রশাসন তাদের নিজস্ব উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যাপারে ও বাজারজাতের ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে—এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। তিনি বলেছিলেন, যেসব শিল্প-কারখানা, তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না, তা বন্ধ করে দেয়া হবে। সংবাদপত্রকে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। প্রশাসনের প্রভাব থেকে নিরপেক্ষভাবে অনেক সংবাদপত্র তখন প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বাজার অর্থনীতি চালু করার কথাও বলেছিলেন। ব্যক্তিগত খাত সৃষ্টি করা হয়েছিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি এনেছিলেন বড় ধরনের পরিবর্তন। ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনে গরবাচেভ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে নির্বাহী প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সাথে একই অধিবেশনে সোভিয়েত সংবিধানের ৬ ও ৭ নং ধারা বিলুপ্ত করা হয়েছিল, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টির একক কর্তৃত্বের কথা উল্লেখ ছিল। বাহ্যত ওই ধারা বিলুপ্তির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে বহুদলীয় রাজনীতির জন্ম হবার একটা সম্ভাবনা ছিল। আরো লক্ষ করার ব্যাপার, ভেঙে যাবার আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রিপাবলিকে জনগণের ভোটে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সব নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরা হেরে গিয়েছিলেন ও রিপাবলিকগুলোর ক্ষমতা তখন চলে গিয়েছিল অ-কমিউনিস্টদের হাতে। মস্কো ও লেনিনগ্রাদের মতো শহরের মেয়ররাও (পোপভ ও সাবচেক) কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। জনগণের ভোটে এরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছিলেন।

গরবাচেভ সম্পর্কে বড় অভিযোগ ছিল, তিনি সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করেছিলেন। যদিও গরবাচেভ কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্কিত ছিলেন এবং নিজেকে কমিউনিস্ট বলে মনে করতেন। তবে সনাতন কমিউনিস্ট ডকট্রিন ত্যাগ করে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির উচিত মার্কসীয় দর্শনের উপর এককভাবে বিশ্বাস না রাখা। নির্বাহী প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হবার পর, তাঁর হাতে এত বেশি ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল, যা জারের ক্ষমতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নতুন ক্ষমতাবলে তিনি পার্টির সনাতন কর্তৃত্বের বাইরে নিজেকে পরিচালনা করতে পারতেন। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি দেশের প্রেসিডেন্ট গরবাচেভের উপর সরাসরি প্রভাব খাটাতে পারত না। গরবাচেভ যদিও পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন, তবু প্রয়োজনে তিনি পার্টির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারতেন। থিওরেটিক্যালি পার্টির যে কোনো সিদ্ধান্তে তিনি 'ভেটো' দিতে পারতেন।

তিনি মূলত একটি শক্তিশালী 'প্রেসিডেন্সি' চালু করেছিলেন, যার সাথে খুব সম্ভবত আমেরিকার প্রেসিডেন্সির তুলনা করা চলে। নতুন পরিবর্তনের ফলে গরবাচেভ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র, বা যে কোনো রিপাবলিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারতেন, নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারতেন ও সোভিয়েত পার্লামেন্টের যেকোনো সিদ্ধান্তকে 'ভেটো' দিতে পারতেন। তিনি এককভাবে দ্বিতীয় কোনো দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারতেন। কিছু কিছু লিমিটেশনের ব্যবস্থাও ছিল। বিশেষ করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ব্যাপারে গরবাচেভকে রিপাবলিকগুলোর সাথে আলাপ করে নিতে হতো। যদি তিনি ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি সুপ্রিম সোভিয়েতের সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করতেন এবং এক্ষেত্রে তার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনের প্রয়োজন হতো।

সারণি : ২৩

সোভিয়েত ইউনিয়ন : অর্থনৈতিক চিত্র

জিএনপি (বিলিয়ন ডলার)	১৯৮৯	১৯৮৮	১৯৮০
সেক্টর ভিত্তিতে শিল্প	২১৪৪.৬	২১৫৪.৮	১৮৫২.৬
কৃষি	৭৪৪.৫	৭৫৭.৬	৬৪২.৪
অন্যান্য উৎপাদনশীল সেক্টর	৪১৫.৬	৪১৩.৫	৩৬৪.৮
নন-উৎপাদনশীল সেক্টর	৫৫৭.৮	৫৫৯.৬	৪৫৬.৭
গড় উৎপাদন বৃদ্ধি	৪২৬.৭	৪২৪.১	৩৮৮.৭
জিএনপি	-০.৫	+ ১.৬	+ ২.৯
শিল্প	-১.৭	+ ১.৫	+১.৬
কৃষি	+০.৫	+১.০	+১.৪
উৎপাদনশীল সেক্টর	-০.৩	+২.৭	+২.৩
নন-উৎপাদনশীল সেক্টর	+০.৬	+০.৬	+০.৯

সূত্র : ফিনানসিয়াল টাইমস, ১২ মার্চ, ১৯৯০

১৯৮৫ সালে ক্ষমতা গ্রহণের সময় তিনি প্রথম দিকে অর্থনৈতিক সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বেশি। পরে তিনি রাজনৈতিক সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেন। ১৯৮৮ সালে সরাসরি ভোটে ২২৫০ সদস্যবিশিষ্ট পিপলস ডেপুটিস' (সংসদ)-এর নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। পরে এদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যকে নিয়ে সুপ্রিম সোভিয়েত গঠিত হয়। নির্বাচনে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বীরাও বিজয়ী হয়েছিলেন। রাজনৈতিকভাবে আরেকটি পরিবর্তনের যে প্রস্তাব তিনি করেছিলেন, তা হচ্ছে রিপাবলিকগুলোকে নিয়ে সত্যিকার অর্থে একটি ফেডারেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যে কারণে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম *'ইউনিয়ন অব সোসালিস্ট সোভিয়েত রিপাবলিক'*-এর বদলে *'ইউনিয়ন অব সভরেন সোভিয়েত রিপাবলিক'* রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি রিপাবলিকগুলোকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। যেমন, বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও মুদ্রাব্যবস্থার বাইরে অন্যান্য যে কোনো বিষয়ে রিপাবলিকগুলো এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারত।

গরবাচেভ কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামোতেও পরিবর্তন এনেছিলেন। অতি ক্ষমতাসম্পন্ন পলিটব্যুরোর ক্ষমতা তিনি হ্রাস করেন এবং এর পরিবর্তে ১৫টি

রিপাবলিকের শীর্ষস্থানীয় নেতাকে নিয়ে নতুন একটি সংস্থা গঠন করেছিলেন, যা পলিটব্যুরোর স্থলাভিষিক্ত হয় এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় পরিণত হয়। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের মডেলকে সামনে রেখে তিনি সোভিয়েত আইন বিভাগকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন এবং সেখানে রিপাবলিকগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছিলেন। আইনজীবীদের প্রাইভেট প্রাকটিস করারও সুযোগ দেয়া হয়েছিল।

সোভিয়েত অর্থনীতি

গরবাচেভের 'পেরেস্ত্রোইকা' রাজনীতির একটা দুর্বল জায়গা ছিল তার অর্থনীতি। অর্থনীতিতে তিনি ব্যাপক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরিণতিতে খুব একটা ভালো ফল পাওয়া যায়নি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৯১ সালে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল ১০ ভাগ। খাদ্য সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধি ধরা হয়েছিল শতকরা ১১ ভাগ; অথচ বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২ দশমিক ১ ভাগ। জাতীয় আয় ১৯৮৮ সালের তুলনায় ৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ৯০-৯১ সালে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। দুধ, রুটি, মাংসের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হতো। তারপরও পাওয়া যেত না। সিগারেটের অভাবের কারণে প্রথমদিকে আমেরিকা থেকে প্রায় ১ মিলিয়ন ডলারের সমমূল্যের সিগারেট আমদানি করতে হয়েছিল। জুতা কেনার জন্য স্বয়ং একজন মন্ত্রীকে লন্ডনে যেতে হয়েছিল। এমনকি বাংলাদেশও ওই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে টুথপেস্ট রফতানি করেছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য প্রকাশ্য বাজারই (বেসরকারি) ছিল ভরসা। যদিও দাম ছিল বেশি (সারণী দেখুন), তবু মানুষ এদিকে ঝুঁকেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে। বড় বড় খামার বা সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনব্যবস্থা তখনও পুরোপুরিভাবে চালু ছিল। যে কারণে কৃষকরা উৎপাদনের ব্যাপারে একটা 'দায়সারা' গোছের দায়িত্ব পালন করতেন। উৎপাদনে তাদের উৎসাহ ছিল না। এরা তো সরকারি কর্মচারী। উৎপাদন কম হলে এদের কিছু আসে যায় না। শিল্পে উৎপাদনব্যবস্থায় কোনো উৎসাহের ব্যবস্থা না থাকার কারণে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তুলনায় উৎপাদনব্যবস্থায় পিছিয়ে ছিল। যেমন ১৯৮৩-৮৪ সালে আমেরিকায় গম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল হেক্টর প্রতি ৪২ দশমিক ৩ সেন্টনার। হল্যান্ডে এর পরিমাণ ৬৫ দশমিক ৫ সেন্টনার। অথচ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫ দশমিক ৬ সেন্টনার। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থার হিসেব অনুযায়ী, গম উৎপাদনে ১০৯টি দেশের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান ছিল ৯০তম। উক্ত সংস্থার মতে, গড়ে বিশ্বে গম উৎপাদনের পরিমাণ হেক্টর প্রতি যেখানে ২৪ দশমিক ৪ সেন্টনার, সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল কেনিয়া, জাম্বিয়া, ভারত, পাকিস্তান, মাদাগাস্কার যা উৎপাদন করে তার সমান। লাওস, ভিয়েতনাম বা মালয়েশিয়ায় প্রতি হেক্টরে যে পরিমাণ গম উৎপাদিত হয়, সোভিয়েত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল তার চাইতে কম। অথচ উন্নত বিশ্বের চাইতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি সেক্টরে সবচেয়ে বেশি লোক কাজ করত (কর্মজীবী জনসংখ্যার ১৭ দশমিক ৫ ভাগ, পশ্চিম জার্মানি, জাপান,

হল্যান্ড, সুইডেনে সংখ্যা ২.৫ জন থেকে ৮.৫ জন)। আলু উৎপাদনে মোট ৮৪টি আলু উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান ছিল ৭১। বিশ্বে গড়ে প্রতি হেক্টরে আলু উৎপাদন হয় ১২০ সেন্টনার। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৫ সালে বিশ্বে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৩০ দশমিক ৬ ভাগ (আমেরিকায় ২৭, কানাডায় ৩৯, ব্রাজিলে ৪৬, ভারতে ৪৫, চীনে ৫৮), অথচ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে বেড়েছিল মাত্র ১১ দশমিক ৬ ভাগ। মাথাপিছু কৃষিপণ্য উৎপাদনের হার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল কিংবা পশ্চিম জার্মানিতে বেড়েছে ১৪ ভাগ; অথচ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ১ দশমিক ৩ ভাগ। জীবনযাত্রার মানের একটা তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করলে দেখা যায় প্রতিদিন ৩৬৪৭ ক্যালরি গ্রহণ করেন একজন আমেরিকান। একজন সোভিয়েত নাগরিক গ্রহণ করতেন ৩৪২৬ ক্যালরি। পার্থক্যটা হচ্ছে মাংস থেকে পাওয়া ক্যালরির বেলায়। একজন আমেরিকান মাংস থেকে ক্যালরি পান ১২৮০ (শাক-সবজি থেকে ২৩৬৭ ক্যালরি)। আর সোভিয়েত নাগরিকরা মাংস থেকে গ্রহণ করতেন মাত্র ৮৮.৩ ক্যালরি ও শাক-সবজি থেকে ২২৫৩ ক্যালরি। একজন আমেরিকান বছরে ১১৪ দশমিক ৬ কিলোগ্রাম মাংস ও মাংসজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করেন। অথচ একজন সোভিয়েত নাগরিক গ্রহণ করতেন মাত্র ৫৭ দশমিক ৭ কিলোগ্রাম।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতি ১০ হাজার লোকের জন্য ৮০টি ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছিল (পশ্চিম ইউরোপে এ সংখ্যা বেশি। আমেরিকাতে এ সংখ্যা ৬৭টি)। এখানে আমেরিকানরা অনেক বেশি জায়গার সুবিধা পাচ্ছেন (ফ্ল্যাট প্রতি ১৩৬ বর্গমিটার। সোভিয়েত নাগরিকরা পেতেন ফ্ল্যাট প্রতি ৩৩.৪ বর্গমিটার)। মাথাপিছু আমেরিকাতে ৫৭.৩ বর্গমিটার ও সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৪.৪ বর্গমিটার জমি ব্যবহৃত হতো। ১৯৮৮ সালের হিসেব অনুযায়ী প্রতি হাজার জনসংখ্যার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৬৯ জনের গাড়ি ছিল, যা উন্নত বিশ্বের কিংবা উন্নয়নশীল বিশ্বে ব্যবহৃত গাড়ির চাইতে অনেক কম (আমেরিকাতে প্রতি হাজারে গাড়ির সংখ্যা ৭০০, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি ও ফ্রান্সে এ সংখ্যা ৫৭৪ থেকে ৪০৩)। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সংখ্যা গ্রীস, ভেনিজুয়েলা, আর্জেন্টিনা, পর্তুগাল, এমন কি পোল্যান্ডের প্রতি হাজার অধিবাসীর মধ্যে যে গাড়ি আছে (১৮১ থেকে ১১২টি), তার চাইতেও কম ছিল। ব্রাজিলে প্রতি হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৮০ জন গাড়ি চালান। প্রতি হাজার অধিবাসীর মধ্যে টিভি ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ২৯৬টি। অথচ সুরিনামের মতো ছোট্ট দেশেও এ সংখ্যা ছিল ৬১৩। পশ্চিম ইউরোপে কিংবা আমেরিকাতে এ সংখ্যা এত বেশি যে হিসেব না দেয়াই ভালো। এমন কি টেলিফোন সেট ব্যবহারের দিক দিয়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন পিছিয়ে ছিল (এ সংখ্যা মাত্র ৯৮)। সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র কিংবা জাপানে এ সংখ্যা ৮৯০ থেকে ৫৩৫টি সেট (প্রতি হাজারে)। এ সংখ্যা ছিল আমেরিকাতে ১৯২০ সালে। আমেরিকাতে যে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়, তার মাত্র ১ ভাগ ব্যবহৃত হতো সোভিয়েত ইউনিয়নে। অথচ এখানে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা আমেরিকার প্রায় দ্বিগুণ।

সামগ্রিকভাবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট জাতীয় আয়, যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের চাইতে অনেক কম ছিল। ১৯৮৭ সালে এর পরিমাণ যখন

আমেরিকার ৩৮২০ বিলিয়ন ডলার, তখন সোভিয়েত জিএনপি'র পরিমাণ ছিল ওই বছর ১৯৪৪ বিলিয়ন ডলার (অর্থাৎ আমেরিকার জিএনপির মাত্র অর্ধেক)। ১৯৫০ সালে জাপানের জিএনপি'র পরিমাণ ছিল সোভিয়েত জিএনপির ৩৫ ভাগ। ১৯৭৮ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছিল ৬৬.৫ ভাগে। ১৯৮৭ সালে চীনের জিএনপি'র পরিমাণ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ২৪ ভাগ। ১৯৯৭ সালে এটা ৫০ ভাগের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল।

সারণি : ২৪

গরবাচেভের শাসনামলে জিনিসপত্রের দামের পার্থক্য

[প্রতি কিলো হিসেবে (রুবল)]

দ্রব্য	সরকারি	বেসরকারি
আপেল (সবুজ)	৩.০০	১৫.০০
আপেল (লাল)	৩.০০	৮.০০
গরুর মাংস	২.৫০	১২.০০
বাঁধা কপি	০.১৬	৩.০০
গাঁজর	০.৩২	১.৫০
রসুন	১.৮০	৪.০০
আঙুর	৪.০০	১৫.০০
ভেড়ার মাংস	২.৫০	১৫.০০
কমলা	১.০০	১০.০০
পিঁয়াজ	১.০০	৩.০০
শূকরের মাংস	২.৫০	১৫.০০
আলু	০.৫০	২.০০
টমেটো	৩.০০	১৫.০০
শসা	৮.৫০	১৫.০০

সূত্র : ফিনানসিয়াল টাইমস, মার্চ ১২, ১৯৯০

উপরের উপাত্তগুলো এ কারণেই ব্যবহার করা হয়েছে যে, এতে করে বোঝা সহজ হবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাশূন্যে রকেট ও মানুষ পাঠানোর যোগ্যতা অর্জন করলেও জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে তারা পশ্চিমাদুনিয়া থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। এ কারণেই গরবাচেভ অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওই পরিবর্তন আনতে গিয়েই শেষের দিকে তিনি কনজারভেটিভদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। গরবাচেভ বাজার অর্থনীতিতে নীতিগতভাবে ফিরে যাবার ব্যাপারে অঙ্গিকার করলেও তিনি এগুচ্ছিলেন অত্যন্ত ধীরগতিতে, যে কারণে অর্থনীতি কোনো গতি পাচ্ছিল না এবং অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিদিনই খারাপ থেকে অধিকতর খারাপের দিকে যাচ্ছিল। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ও বাজার অর্থনীতির ব্যাপারে তাঁর এক সময়ের উপদেষ্টা শাটালিন ৫০০ দিনের এক ফর্মুলা উপস্থাপন করেছিলেন। ওই ফর্মুলায় তিন স্তরে তিনি বাজার অর্থনীতি চালু করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু কনজারভেটিভদের চাপের মুখে তিনি শাটালিন ফর্মুলা কার্যকর করতে পারেননি। ফলে এক সময় শাটালিন গরবাচেভকে পরিত্যাগ করেছিলেন। শেষের দিকে গরবাচেভ অত্যন্ত বেশি মাত্রায় কনজারভেটিভদের প্রভাববলয়ে চলে গিয়েছিলেন। খুব সম্ভব তিনি একটা মধ্যপথ অবলম্বন করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু সেই কনজারভেটিভরাই শেষপর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র সংগঠিত করে।

মার্কসীয় দর্শন ও সোভিয়েত রাজনীতি

গরবাচেভের রাজনৈতিক দর্শন মার্কসীয় দর্শনের বিরোধী ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই অভিযোগ খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নেই ওঠেনি, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও উঠেছিল। এমনকি বাংলাদেশ কিংবা ভারত এ অভিযোগের বাইরে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও এর ব্যর্থতার দিকে তাকালে একটা জিনিস স্পষ্ট করে বলা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রচণ্ড এক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছিল। কার্ল মার্কস সমাজের যেকোনো 'সংকটের' বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে। মার্কসের মতে, সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক ও সামাজিক অবস্থা যদি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক না হয় এবং তা যদি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোনো ভূমিকা পালন না করে, তখন 'সংকট' সৃষ্টি হতে বাধ্য (K. Marx & F. Engels Manifesto of German Communist Party, Vol. 10, Part 1, Page 611)। লেনিনের বিশ্লেষণ হচ্ছে– শাসকশ্রেণী কোনো পরিবর্তন আনা ছাড়া ক্ষমতা পরিচালনা করতে যখন ব্যর্থ হয় তখনই 'সংকট' শুরু হয় (লেনিন রচনাবলি, ভল্যুম : ১৮, পাতা ২৪৪)। আর এ ধরনের 'সংকট' একটি বিপ্লবের জন্ম দিতে পারে। লেনিন লিখেছেন, যেকোনো সংকটের দুটো প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এক, কোনো 'বিপ্লবের' জন্ম দিতে পারে। অথবা দুই, তা দীর্ঘস্থায়ী এক অরাজকতার সৃষ্টি করতে পারে (লেনিন রচনাবলি, ভল্যুম : ৭, পাতা ৩৪০)।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সেদিনের পরিস্থিতি কী লেনিনের মূল্যায়নের আওতায় পড়ে? অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন কী কোনো 'বিপ্লবের' (?) জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল? লেনিন বলেছেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট সমাজকে একটা বিপ্লবী সংকটের দিকে ঠেলে দিতে পারে। ১৯১৫ সালের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে যাবার কারণ দেখিয়ে তিনি তিনটি সম্ভাব্য উপসর্গের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যা বিপ্লবের জন্ম দিতে পারে। ওই তিনটি উপসর্গ হচ্ছে, (১) যখন শাসকশ্রেণীর পক্ষে কোনো পরিবর্তন ছাড়া ক্ষমতা পরিচালনা করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তখন একটা সংকট তা যে ধরনের হোক না কেন, শাসকশ্রেণীর মধ্যে বিরাজ করে। বিপ্লব তখনই সংঘটিত হতে পারে বা হয়। সমাজের একটা শ্রেণী তখন পুরনো ধাঁচে গড়া সমাজব্যবস্থায় বসবাস করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে সমাজের শাসকশ্রেণীও প্রচলিত সমাজের প্রতি তাদের অনাস্থা প্রকাশ করে, (২) যখন শোষিত ও নিষ্পেষিতশ্রেণীর চাহিদা প্রকট আকার ধারণ করে এবং (৩) যখন উল্লিখিত কারণগুলোর জন্য জনগণের মাঝে এক ধরনের ম্যুভমেন্ট লক্ষ করা যায় (Ernst Kux Contradicion in Soviet Socialism, Problems of Communism, Nov.—Dec. 1984, p. 5]

মৃত্যুর পূর্বাহ্নে ১৯২৩ সালে লেনিন উল্লেখ করে গেছেন "All great revolutions are born out of the contradictions between the old and which is oriented towards the consumption of the old and the totally abstract striving for the new." (লেনিন রচনাবলি, ভল্যুম ২৭, পাতা ৪১৪)। অর্থাৎ পুরোনো ধ্যান-ধারণার সাথে নতুন চিন্তাধারার দ্বন্দ্বের ফলে একটি 'বিপ্লবকে' অনিবার্য করে তোলে। তবে বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন পরিস্থিতির। লেনিন বলেছেন, বিপ্লবী পরিস্থিতি যতক্ষণ পর্যন্ত না সৃষ্টি হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লব সংঘটিত হবে না। অর্থাৎ একটা Objective Change-এর কথা লেনিন উল্লেখ করে গেছেন। লেনিন এও বলে গেছেন যে, প্রতিটি বিপ্লবী পরিস্থিতিই

যে বিপ্লবের জন্ম দেবে, তা নয়। এজন্য যা দরকার তা হচ্ছে Objective Change-এর সঙ্গে সঙ্গে Subjective Change। অর্থাৎ বিপ্লবী শক্তিকে এই ক্ষমতা রাখতে হবে যে, সে শক্তি পুরোনো ধ্যান-ধারণা ভেঙে এবং পুরোনো সমাজব্যবস্থা ভেঙে দেবার ক্ষমতা রাখে, যে সমাজব্যবস্থা সাধারণ যেকোনো সংকটে ভেঙে পড়ে না, যদি না তাকে পরিপূর্ণভাবে উৎখাত করা যায় (লেনিন রচনাবলি, ভল্যুম ১৮, পাতা ২৪৪)।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সেদিনের পরিস্থিতি যদি মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের নিরিখে বিচার করা যায়, তাহলে কী সেখানকার পরিস্থিতিকে একটি সম্ভাব্য বিপ্লবপূর্ব পরিস্থিতি বলে উল্লেখ করা যায় না? মানুষের মধ্যে অসন্তোষ সেখানে বাড়ছিল। পুরোনো ধ্যান-ধারণার (কঠোর মার্কসীয় দর্শন) প্রতি মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল (যদি বিভিন্ন রিপাবলিকগুলোর নির্বাচনের ফল ধরা যায়)। সাধারণ মানুষের চাহিদা বাড়ছিল, তারা চাচ্ছিলেন জীবনযাত্রার মানের উন্নতি। শাসকশ্রেণী সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি এটা বুঝতে পেরেছিল যে, পরিবর্তন ছাড়া ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব নয় (কমিউনিস্ট পার্টির একক কর্তৃত্ব ছেড়ে দেয়া ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের সূচনা সম্বলিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল একক। এক্ষেত্রে গোপন ভোটে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গরবাচেভকে সমর্থন করেছিল। এমন কি লিগাসভের মতো চরম কনজারভেটিভরাও এই প্রস্তাব দুটোতে গরবাচেভকে সমর্থন করেছিলেন)। নিঃসন্দেহে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে এক 'নীরব বিপ্লব' সম্পন্ন হয়েছিল। গরবাচেভ এক্ষেত্রে ছিলেন একটা প্রতীক। গরবাচেভ নিজেও এটাকে বিপ্লব বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আর এ বিপ্লবটা এসেছে 'ওপর থেকে।' গরবাচেভ লিখেছেন, "পেরেস্ত্রোইকার সাফল্যের ওপরই সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আর আগামী দিনের শান্তি নির্ভর করে আছে। সময় আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে একটা বিকল্প বিপ্লবী পথ নিতে। আমরা তা গ্রহণ করেছি। পেরেস্ত্রোইকা থেকে আমরা পিছু হটব না। আমরা এটিকে বাস্তবে রূপায়িত করবই।" গরবাচেভের আত্মবিশ্বাস ছিল। একটা 'বিপ্লব' যেমন সমাজকে ভেঙে-চুরে দেয়, গরবাচেভ বোধকরি তা চাননি। গরবাচেভের বিপ্লবের একটা মানবিক দিক ছিল। তিনি বর্তমান কাঠামো রেখেই পরিবর্তনটা আনতে চেয়েছিলেন। গ্লাসনস্ত আর পেরেস্ত্রোইকার মতো এই নতুন চিন্তাধারাই (Novoye myshlcniye) ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শন। আর এই দর্শন বাস্তবায়িত করতে গিয়ে কখনো সখনো তিনি লেনিনের আদর্শ থেকে মূল্যবোধ ধার করেছেন। কখনো বা আবার প্রত্যক্ষভাবে হোক আর পরোক্ষভাবে হোক মার্কসীয় দর্শনকে আঘাত করেছেন (ব্যক্তিগত খাত সৃষ্টি, পার্টির একক ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি)। গরবাচেভ সম্পর্কে বড় অভিযোগ তিনি মার্কসীয় দর্শনের মূলভিত্তি শ্রেণী সংগ্রামকে অস্বীকার করেছেন। এই অভিযোগের ভিত্তি কতটুকু সে ব্যাপারে বিতর্ক রয়ে গেছে। কেননা গরবাচেভ সরাসরিভাবে এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য দেননি। তবে তিনি যুদ্ধ বন্ধ, অনেক যুদ্ধের সম্ভাবনা কমিয়ে আনার ও সর্বোপরি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করার (১৯৮৭ সালে জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণ উল্লেখযোগ্য) ব্যাপারে যেসব বক্তব্য দিয়েছিলেন এবং যেসব বক্তব্যে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মাঝে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বের অবসানের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই বক্তব্যের সূত্র ধরেই অভিমত পোষণ করা হয়েছিল যে গরবাচেভ লেনিনের দর্শনকে পরিত্যাগ করেছেন। (Peter Zwick New Thinking and New Foreign Policy under

Gorbachev, PS, June, 1989, P. 216)। আসলে গরবাচেভ যা বোঝাতে চাচ্ছিলেন তা হচ্ছে, এ যুগে বাস করতে হলে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রয়োজন রয়েছে এবং গরবাচেভের মতে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়েই এই নতুন বিশ্ব গড়ে উঠবে। তবে এ ব্যাপারে তাঁর অন্যতম উপদেষ্টা ও সাবেক সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী পরবর্তীকালে জর্জিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড শেভারদনাজে একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন "The struggle between two opposing systems in no longer a determining tendency of the present era"। যদিও শেভারদনাজে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সঙ্গে শ্রেণীর দ্বন্দ্বের বক্তব্যকে এক করে দেখা ঠিক নয়। শেভারদনাজের বক্তব্যের সমালোচনা এসেছিল লিগাসভের কাছ থেকে। লিগাসভ বলেছিলেন "We proceed from the class character of international relations and any other approach only confuse the minds of the Soviet people and our friends abroad"। এই লিগাসইভ পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের জন্য গরবাচেভের রাজনীতিকে দায়ী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সাম্যবাদের মূলদর্শন 'আন্তর্জাতিকতাবাদ' থেকেও গরবাচেভ নিজেকে গুটিয়ে এনেছেন। এ ব্যাপারে গরবাচেভের বক্তব্য কী? গরবাচেভ বলেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার জন্যে (পূর্ব ইউরোপ) ওই সমস্ত দেশগুলো তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এ কারণে গরবাচেভ বারবার বলেছিলেন প্রতিটি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিই সিদ্ধান্ত নেবে, সমাজতন্ত্র তারা কিভাবে বিনির্মাণ করবে। অর্থাৎ কোনো 'মডেল' নয়। সমাজতন্ত্রের কোনো মডেল হতে পারে না। এই কারণে হোনেকার পরবর্তী সাবেক পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান গিজি যখন বলেছিলেন, পূর্ব জার্মানিতে তাদের সিদ্ধান্তের পেছনে (বহুদলীয় রাজনীতি, পার্টির নাম পরিবর্তন, বাজার অর্থনীতি) মস্কোর সমর্থন আছে, তখন গরবাচেভের ওই রাজনৈতিক দর্শনটাই সত্য হয়ে ধরা পড়ে।

তৃতীয় বিশ্বে 'বিপ্লব রফতানির' ব্যাপারে ব্রেজনেভীয় ব্যাখ্যার (আফগানিস্তান, অ্যাঙ্গোলা ও ইথিওপিয়া) গরবাচেভ বিরোধিতা করেছিলেন। গরবাচেভ বলেছিলেন "Today, too we are firmly convinced that pushing revolution from outside. specially by military means, is futile and impermissible"। গরবাচেভের সেই বক্তব্য গভীরভাবে লক্ষ করলে বোঝা যাবে গরবাচেভ মূলত 'পারস্পরিক নির্ভরশীলতার' নীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বেশি। তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিসংগ্রামগুলো যে ঐতিহাসিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে আসছিল, এটা গরবাচেভের আমলে রহিত হয়ে যায়। এমনকি তৃতীয় বিশ্বে যেকোনো ধরনের বিপ্লবের সম্ভাবনা ও সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে অব্যাহত সাহায্য দেয়া থেকেও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন পিছিয়ে যায়। তৃতীয় বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সঠিক অর্থে শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি পার্টি হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে না বলেও গরবাচেভের নতুন দর্শনে আলোকপাত করা হয়েছিল। এর ব্যাখ্যা করলে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের সোভিয়েত সমর্থিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে (বাংলাদেশে সিপিবি, ভারতে সিপিআই প্রভৃতি) আর মস্কোর প্রতি নয় বরং স্থানীয় সূত্রের উপর নির্ভর করে আগামীদিনে রাজনীতি পরিচালিত করতে হবে, এটাই ছিল গরভাচেভের নীতি।

সোভিয়েত সমাজে সংকট

সুইজারল্যান্ডের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জ্যাকব বুরচার্ডের মতে, যেকোনো সংকট হচ্ছে একটা ডায়লেকটিক প্রক্রিয়া। অতীতের বিভিন্ন সংকটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, এই ডায়লেকটিক প্রক্রিয়ার কারণেই ইতিহাসে কখনো কখনো বৃহৎশক্তির উত্থান ঘটেছে। কখনওবা আবার সেই শক্তি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়েছে। তাঁর মতে, ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে কোনো শক্তি যখন উন্নয়ন বা নতুন সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই শক্তির পতন অনিবার্য (Jackob Burchardt, Ueber des Studium der Geschichte, 1982, P. 213 and 228.)। একই ধরনের অভিমত পোষণ করেছিলেন আলেক্সিস ডি. টকিউভিলে, যিনি ফ্রান্সের বিপ্লবের বিশ্লেষণের জন্য আজো চিহ্নিত হয়ে আছেন। টকিউভিলে যেকোনো সংকটের সাথে একটি বিপ্লবের সম্ভাবনাকে এক করে দেখেছেন। তাঁর মতে, সামগ্রিক অবস্থা যখন খারাপ থেকে খারাপের দিকে যেতে থাকে, শুধু তখনই বিপ্লব সংঘটিত হয় না। অনেক সময় এমনও ঘটে যখন জনগণ দীর্ঘদিনের নিষ্পেষিত থাকার পর হঠাৎ করে সরকারের শিথিলতার সুযোগ নিয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। সাধারণভাবে বলা যায়, একটা খারাপ সরকারের দুঃসময় তখনই, যখন সেই সরকার চাপের মুখে নতি স্বীকার করে (Alexis de Tocqueville, The old Regime and the French Revolution 1955, P. 176)। গরবাচেভ চাপের মুখে হোক আর আন্ত রিকতা সহকারেই হোক নতি স্বীকার করেছিলেন। আর এর সুযোগ নিয়েছিলেন পশ্চিমা পণ্ডিতরা। আমেরিকার কনজারভেটিভ পণ্ডিতদের একটা বড় অংশ (ব্রেজেনসকি পল নিতসে, ফুকিয়ামা প্রমুখ) তাই মনে করছিলেন, সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার মৃত্যু ঘটেছে। ব্রেজেনসকি তো লিখেছেন, এ শতাব্দীতে দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। এক, সমাজতন্ত্রের উত্থান (১৯১৭) ও দুই, এ শতাব্দী শেষ হবার আগেই সমাজতন্ত্রের পতন (১৯৮৯)। এই যুক্তি কতটুকু গ্রহণযোগ্য, এটা বিতর্কের ব্যাপার। তবে একজন সমাজতন্ত্রীও বিশ্বাস করেন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এক চরম সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। মার্কস ও লেনিন এই ধরনের সংকটের ব্যাখ্যা দিয়ে গেলেও এটাও বলে গিয়েছিলেন যে আগামীদিনের সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এসব সমস্যার উর্ধ্বে থাকবে। তারা যে সংকটের কথা বলে গিয়েছিলেন, তা শুধু বুর্জোয়াসমাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে যে এই ধরনের সংকট দেখা দিতে পারে সে ব্যাপারে কোনো আভাস তারা দিয়ে যাননি। তবে মাও জে ডং এ ব্যাপারে একটা সম্ভাব্য পরিণতির কথা বলেছিলেন। মাও বলেছিলেন, যদি কমরেডরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়, তাদের মধ্যে যদি ভাঙন দেখা দেয় এবং যদি তাদের মনোবল ভেঙে যায় তাহলে সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, কয়েক বছর কিংবা হতে পারে এক দশকের ব্যবধানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা ক্ষমতা দখল করতে পারে এবং এই অবস্থায় মার্কসবাদী লেনিনবাদী সংগঠন সংশোধনবাদী হতে বাধ্য। যদিও মাও জে ডং চীনের পার্টি সম্পর্কে এই বক্তব্য রেখে গেছেন, তবু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ওই সময় এক ধরনের তাত্ত্বিক সংকটে ভুগছিল। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির নাম পরিবর্তনসহ কাস্তে-হাতুড়ির সিম্বল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ইথিওপিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার কাঠামোর ব্যক্তিগত

খাত ও বাজার অর্থনীতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এক্ষেত্রে তথাকথিত সংশোধনবাদীর যুক্তি কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

গরবাচেভ এক বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছিলেন কিংবা আনতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসে এই ধরনের সংস্কার ও সংস্কারবাদীদের চোখে পড়ে। এমন কি রাশিয়ার ইতিহাসেও এই ধরনের সংস্কার বিরল নয়। গরবাচেভের সংস্কার কর্মসূচি ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় যে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৬০ সালে জার আলেকজান্ডার স্থানীয় সরকারগুলোকে স্বায়ত্তশাসনসহ বিচার বিভাগ ও শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার এনে জার সাম্রাজ্যে বিতর্কের ঝড় তুলেছিলেন। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়ায় শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠনের এক উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লবের পর (১৯১৭) লেনিন যে সংস্কার এনেছিলেন, তার মধ্যে ছিল কৃষকদের জমি ফেরত দেয়া, সেনাবাহিনী নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং প্রতিটি জাতিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেয়া। ক্রুশ্চেভ (১৯৫৬) স্ট্যালিনের সমালোচনা করে লিবারেল সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর আমলেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি প্রণীত হয়েছিল। এমনকি গরবাচেভ যেসব সংস্কারের কথা বলেছিলেন, এর সূচনা কিন্তু করে গিয়েছিলেন প্রয়াত পার্টি প্রধান আন্দ্রেপভ (১৯৮২)। কিন্তু আন্দ্রেপভ সীমিত সময়ের জন্য ক্ষমতায় ছিলেন। গরবাচেভের উত্থান আন্দ্রেপভের শাসনামলেই। যুগে যুগে এভাবেই সংস্কারবাদীরা ক্ষমতায় এসেছেন। গরবাচেভও এসেছিলেন সেই একই প্রক্রিয়ায়। যে সমাজ মহাশূন্যে রকেট পাঠাতে পারে, কিন্তু জনগণের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়, সেই সমাজে সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। এটাই ইতিহাসের নিয়ম।

কিন্তু এই সংস্কারই সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়। গরবাচেভের রাজনৈতিক সংস্কারের সুযোগ নিয়ে সমাজতন্ত্র বিরোধী শক্তি সেখানে শক্তিশালী হয়েছিল। বিদেশি শক্তির প্ররোচনাও ছিল। ফলে একক রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে থাকতে পারেনি। অথচ ইতিহাস প্রমাণ করেছে চীন তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সংস্কার এনে এখনও টিকে আছে। চীনে 'পেরেস্ত্রোইকা' (পরিবর্তন) এসেছে। কিন্তু 'গ্লাসনস্ত' (দুয়ার খোলা নীতি) আসেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব আজ নেই বটে কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা আলোচিত হতে থাকবে বারে বারে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিকাশ', কলিকাতা, ১৯৮৫।

২. জিবিগনিউ ব্রেজেনসকি, 'চরম ব্যর্থতা সমাজতন্ত্রের উত্থান ও পতন' (গাজী শামসুর রহমান অনূদিত), ঢাকা ১৯৯০

৩. তারেক শামসুর রেহমান, 'বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি' ঢাকা, ১৯৯৩

৪. Ronald J Hill. 'Communist Politics under Knife'. London 1990

৫. Vinoy Kumar Malhotra. 'Gorbachevian Revolution in the Soviet Union', New Delhi, 1991

সপ্তদশ অধ্যায়

নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

The Present World economic order is based on domination and inequality.

Indira Gandhi, 1982

Independence is not simply a word created by idealistic world order reformers, but a very real condition of life bonding the fate of the rich to the fate of the poor.

Seyom Brown
(International Relations in a Changing
Global System, 1992)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে মিত্রশক্তি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি বিশ্বসংস্থা গঠনের পাশাপাশি একটি নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলারও উদ্যোগ নিয়েছিল। তখন সিদ্ধান্ত হয়েছিল, বিশ্বব্যাংক ও একটি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গড়ে তোলা হবে। এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যামশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্রেটন উডস (Bretton Woods) শহরে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে ওই সম্মেলন 'ব্রেটন উডস' সম্মেলন নামেই পরিচিতি পেয়েছে। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনের ডুম্বারটন ওকস শীর্ষ সম্মেলনে (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র) গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বসংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত (জাতিসংঘ) অতিদ্রুত কার্যকর হলেও (১৯৪৫ সালের ২৫ অক্টোবর) অন্যান্য সিদ্ধান্ত পুরোপুটি কার্যকর হয়নি। ব্রেটন উডস সম্মেলনের পঞ্চাশ বছর পর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে, যদিও বিশ্বব্যংক আগেই গঠিত হয়েছিল। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা উব্লিউটিও গঠিত হতে সময় নিয়েছে অনেক। কেননা, উন্নয়নশীল দেশগুলো এই সংস্থা গঠনে কতটুকু সুবিধা পাবে, বাণিজ্য উদারিকরণের লক্ষ্যে কতভাগ পণ্যের শুল্ক হ্রাস করবে ইত্যাদি নিয়ে সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই আলোচনা চালিয়ে আসছিল। ১৯৯৪ সালে মারাকাশ শীর্ষ সম্মেলনে এসে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভব হলেও ডব্লিউটিও নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। এই বিতর্কের কথা আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে যতটা না শুনেছি, একুশ শতকে এসে বেশি শুনছি। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থরক্ষা করতে পারছে না এই অভিযোগটি এখন আগের চাইতে অনেক বেশি স্পষ্ট। নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ভূমিকা আলোচনা করলে প্রথমেই আমাদের গ্যাট নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

গ্যাট

১৯৯৫ সাল থেকে গ্যাট বিশ্ববাণিজ্য সংস্থারূপে (ডব্লিউটিও) আত্মপ্রকাশ করে। গ্যাট বলতে আমরা বুঝি, শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি। ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল ১২৪টি দেশ বিশ্বে অবাধ বাণিজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে উরুগুয়ে রাউন্ড গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। ওই চুক্তি একই বছরের ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয় এবং ওই চুক্তির মাধ্যমেই গ্যাট ১৯৯৫ সাল থেকে বিলুপ্ত হয়, আর তার স্থলাভিষিক্ত হয় *'বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা'* নামের একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা। এটি মূলত বিশ্বব্যাংক বা আই,এম.এফ'র মতো আরেকটি প্রতিষ্ঠান। তবে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা নিয়ে সংশয় ছিল। এক সময় খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দ্বিমত দেখা গিয়েছিল। পরে সিনেটে ওই চুক্তি অনুমোদিত হওয়ায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গঠনের বড় বাধা অপসারিত হয়। তবে কিছু কিছু বাধা এখনও রয়ে গেছে। রাশিয়া এই বাণিজ্য সংস্থায় এখনও যোগ দেয়নি। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ১৯৯১ সালে ডাংকেল প্রস্তাব অনুযায়ী গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়িত হয় এবং পিটার সাদারল্যান্ড ছিলেন তখন গ্যাট-এর মহাসচিব। এখানে উন্নতবিশ্ব ও উন্নয়নশীলবিশ্বের মধ্যে এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল মহাসচিবের পদটি নিয়ে। উন্নতবিশ্ব এই পদটির ব্যাপারে যেমন আগ্রহী ছিল, তেমনি উন্নয়নশীলবিশ্বও তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

সারণি : ২৫

দশটি অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের স্তরায়ন* (১৯৮০)	সমন্বিত মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন, ১৯৮৫
১. সোভিয়েত ইউনিয়ন	১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২. জাপান
৩. ব্রাজিল	৩. সোভিয়েত ইউনিয়ন
৪. পশ্চিম জার্মানি	৪. পশ্চিম জার্মানি
৫. জাপান	৫. ইতালি
৬. অস্ট্রেলিয়া	৬. ফ্রান্স
৭. চীন	৭. যুক্তরাজ্য
৮. ফ্রান্স	৮. কানাডা
৯. যুক্তরাজ্য	৯. চীন
১০. কানাডা	১০. স্পেন

রাষ্ট্রের স্তরায়নের ধারণা দেয়া হয়েছে রে ক্লিন-এর ধারণা অনুযায়ী। এই ধারণায় কোনো দেশের আয়তন ও জনসংখ্যাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। দেখুন Ray Cline, World Power Assessment, Boulder, Westview Press, 1980। অন্যদিকে সমন্বিত মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদনের পরিসংখ্যান নেয়া হয়েছে, The World Fact Book, 1988, Washington D. C, Central Intelligence Agency, 1988 থেকে।

সারণি : ২৬
নির্বাচিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা

	মোট মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন (মার্কিন ডলার ১৯৯৩)	আয়তন (প্রতি হাজার বর্গ কি. মি.)	মানব উন্নয়ন সূচক (HDI)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন, ২০০০ সাল)	সামরিক ব্যয় বিলিয়ন ডলার, ১৯৯২
গণতান্ত্রিক					
অস্ট্রেলিয়া	১৭,৫০০	৭,৭১৩	১১	১৯.২	৪,৩৩৫
কানাডা	১৯,৯৭০	৯,৯৭৬	১	৩১.০	৭,৭৯০
জার্মানি	২৩,৫৬০	৩৭৬	১৫	৮১.৮	১৯,২৫২
যুক্তরাষ্ট্র	২৪,৭৪০	৯,৮০৯	২	২৭৫.১	২৪২,৭১৭
সমাজতান্ত্রিক					
চীন	৪৮০	৯,৫৬১	১১১	১২৮৪.৬	২২,৩৬৪
কিউবা	৩১১৫	১১৫	৭২	১১.৪	১,২৭২
উত্তর কোরিয়া	৩১১৫	১২১	৮৩	২৬.০	৫,০৮৭
ভিয়েতনাম	২৯০	৩৩২	১২০	৮২.৬	১,৭৫০
সাবেক সমাজতান্ত্রিক					
চেক রিপাবলিক	২,৭১০	১২,০৭৫	৩৮	১০.৩	তথ্য পাওয়া যায়নি
হাঙ্গেরি	৩,৩৫০	৭৯	৫০	৯.৯	১,১৮০
পোল্যান্ড	২,২৬০	৩১৩	৫১	৩৮.৮	২,২৭৯
রাশিয়া	২,৩৪০	৯৩	৫২	১৪৫.৬	তথ্য পাওয়া যায়নি
তৃতীয় বিশ্ব					
মিশর	৬৬০	৩,২৮৮	১০৭	৬৯.১	৩,৪২৭
ভারত	৩০০	১,৯৫৮	১৩৪	১০২২.০	৭,৫৫০
মেক্সিকো	৩৬১	২৬	৫৩	১০২.৮	৯৫১
রুয়ান্ডা	২১০	১,০০১	১৫৬	৬৭২	১০১
ছোট রাষ্ট্র					
কমোরোস	৫৩০	১.২	১৩৯	০.৮	তথ্য পাওয়া যায়নি
মালদ্বীপ	৭০০	০.৩	১১৮	০.৩	তথ্য পাওয়া যায়নি
কাতার	১৫,৭৬০	১.০	৪৬	০.৬	তথ্য পাওয়া যায়নি
ভানুয়াতু	১,২৬০	১২.২	১১৯	০.২	তথ্য পাওয়া যায়নি

সূত্র World Development Report, 1995, World Bank, Washington D. C. 1995. Der Fishcher Weltalmanach, 1999. Frankfurt am Main, 1998.

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্থাটি এখন বিশ্ববাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। সদস্যভুক্ত যে কোনো দেশ তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যদি অন্য কোনো দেশ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে সেই দেশের বিরুদ্ধে এই সংস্থার কাছে নালিশ করতে পারবে। এই সংস্থা অভিযুক্ত দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এর ফলে তত্ত্বগতভাবে বলা হয়েছে কোনো একটি বৃহৎ দেশ আর এককভাবে বিশ্ববাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

এমনকি বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে এককভাবে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না।

সারনি : ২৭

গ্যাট থেকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা

১৯৪৭	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাণিজ্য উদারীকরণের লক্ষ্যে ২৩টি দেশ জেনেভায় এক বৈঠকে মিলিত হয় এবং কাস্টমস ট্যারিফ হ্রাস করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়। ৩০ অক্টোবর তারা শুল্ক ও বাণিজ্য বিষয়ক সাধারণ চুক্তিতে (গ্যাট) স্বাক্ষর করে। প্রথম বৈঠকের ফল হচ্ছে ৪৫ হাজার পণ্যের ওপর থেকে ট্যারিফ হ্রাস, যা সমগ্র বিশ্ববাণিজ্যের এক-পঞ্চমাংশ। নভেম্বর মাসে ৫৬টি দেশের প্রতিনিধিরা কিউবার রাজধানী হাভানায় মিলিত হন। লক্ষ্য: প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার সনদ প্রণয়নের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করা। ১৯৪৮ সালের মার্চে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারসমূহ চুক্তিটি অনুমোদনের কোনো অঙ্গিকার না করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার একটি হাতিয়ার হিসেবেই থেকে যায় গ্যাট।
১৯৪৮	১ জানুয়ারি গ্যাট কাজ শুরু করল।
১৯৪৯	ফ্রান্সের এনেসি নগরীতে গ্যাট-এর তৃতীয় দফা বৈঠক এবং ২৫ শতাংশ ট্যারিফ হ্রাসে মতৈক্য।
১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬ সালের মে মাসে আলোচনা অনুষ্ঠিত এবং আড়াই শ' কোটি ডলার ট্যারিফ হ্রাসে ঐকমত্য।
১৯৬০-৬২	যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি, গ্যাট-এর অন্যতম উদ্যোক্তা ডগলাস ডিলান-এর সম্মানে তার নামে ৫ম গ্যাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত এবং বিশ্ববাণিজ্যে ট্যারিফ হ্রাসের পরিমাণ ৪৯০ কোটি ডলারে উন্নীত।
১৯৬৪-৬৭	পরলোকগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডির সম্মানে তার নামে অনুষ্ঠিত হলো 'কেনেডি রাউন্ড'। বিশ্ববাণিজ্যে ৪ হাজার কোটি ডলার ট্যারিফ হ্রাসে ঐকমত্য।
১৯৭৩-৭৯	জাপানের রাজধানী টোকিওতে ৭ম রাউন্ড শুরু। এতে এ মর্মে ঐকমত্য হয় যে, শুধুমাত্র শুল্ক হ্রাসই নয়, ভর্তুকি ও আমদানি লাইসেন্সের মতো বাণিজ্য-প্রতিবন্ধকগুলোও অপসারণ করতে হবে। এবারের বৈঠকে শুল্ক হ্রাস ৩০ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত।
১৯৮৬-৯৩	গ্যাট বাণিজ্যমন্ত্রীরা উরুগুয়ের পুন্টা ডেল এস্টে-তে শুরু করেন তথাকথিত উরুগুয়ে রাউন্ড। এটাই এ যাবৎকালের সবচাইতে উচ্চাভিলাষী ও সুদূরপ্রসারী বাণিজ্য আলোচনা।
১৯৯৪	গ্যাট বাণিজ্যমন্ত্রীরা মরক্কোর মারাকেশ-এ চূড়ান্ত পর্যায়ে মিলিত হন এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তারা অন্যান্য চুক্তিতেও সই করেন।
১৯৯৫	জেনেভায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা সৃষ্টি। গ্যাট ও ডব্লিউটিও'র মধ্যে মূল তফাতটা হলো এই যে, গ্যাট ছিল একটা সাময়িক আইনী চুক্তিমাত্র। পক্ষান্তরে ডব্লিউটিও হচ্ছে স্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত একটি সংস্থা। এর আছে নিজস্ব সদস্য। কিন্তু গ্যাট-এর ছিল কেবল চুক্তির পক্ষসমূহ। গ্যাট কেবল পণ্য বাণিজ্য নিয়েই কারবার করত, কিন্তু 'ডব্লিউটিও'র আওতায় সেবা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত।

গ্যাট (GATT) হচ্ছে শুল্ক বাণিজ্য নিয়ে একটি বাণিজ্যচুক্তি। এতে বোঝায় General Agreement on Tariffs and Trade। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউভুক্ত উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য, মুক্তবাজার অর্থনীতি, খোলা বাজার অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে প্রক্রিয়া চলে আসছিল তারই নাম গ্যাট। ১৯৪৭ সালে গ্যাট-এর প্রথম রাউন্ডের আলোচনা শুরু হয়, আর গ্যাটের অষ্টম রাউন্ড শেষ হয় ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে মরক্কোর মারাকাশে সর্বশেষ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে। এই গ্যাট আলোচনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে।

আইটিও বা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা যখন প্রথমদিকে গঠিত হতে পারল না, তখন দেখা গেল ১৯৪৭ সালে 'দি জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস এন্ড ট্রেড' বা গ্যাট আলোচনা শুরু হয়েছে। ১৯৪৭ সালে প্রথম জেনেভায় গ্যাট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২৩টি দেশ মিলে গ্যাট গঠন করে। ওই সময় গ্যাট বিশ্বব্যাপী ৪৫ হাজার পণ্যের উপর থেকে বাণিজ্য কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৯ সালে ফ্রান্সের এনিসিতে গ্যাটের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে ১৩টি দেশ অংশ নেয়। এতে ৫ হাজার পণ্যের উপর থেকে অতিরিক্ত কর হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে গ্যাটের তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ব্রিটেনের টরকুইয়ে। এতে ৩৮টি দেশ ৮৭০০টি পণ্যের উপর থেকে কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয়। গ্যাটের চতুর্থ বৈঠক ১৯৫৫-৫৬ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৬টি দেশ অংশ নেয় এবং অতিরিক্ত ২শ ৫০ কোটি ডলার মূল্যের কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ্যাটের পঞ্চম বৈঠক ডিলন বৈঠক হিসেবে পরিচিত। এটি ১৯৬০-৬২ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। ২৬টি দেশ এতে ৪৪শ আইটেমের উপর থেকে কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয়। গ্যাটের ৬ষ্ঠ বৈঠক কেনেডি বৈঠক হিসেবে পরিচিত। এটি ১৯৬৪-৬৭ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। ৬২টি দেশ এতে সকল শিল্পজাত পণ্যের উপর থেকে কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা খাদ্যশস্য ও রাসায়নিক দ্রব্য সম্পর্কেও চুক্তিতে পৌঁছে। গ্যাটের সপ্তম বৈঠক 'নিয়ন্ত্রণ বৈঠক' নামে পরিচিত। এই বৈঠক ১৯৭৩ সালে জাপানের টোকিওতে শুরু এবং ১৯৭৯ সালে জেনেভায় শেষ হয়। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী ৯৯টি দেশ গড়ে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ শুল্ক হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সরকারি সংগ্রহ, ভর্তুকি, শুল্ক হার এবং বাণিজ্যের জন্য একটি উন্নত রূপরেখা গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গ্যাটের অষ্টম বৈঠক উরুগুয়ে বৈঠক হিসেবে পরিচিত। ১৯৮৬ সালে উরুগুয়েতে ওই বৈঠকে প্রধানত ১০৭টি দেশকে নিয়ে শুরু হয়। ব্যাংকিং, বিমা, টেলিযোগাযোগ, শিল্প এবং বাণিজ্যে বিনিয়োগকৃত পুঁজির নিরাপত্তা বিধান সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো উত্থাপিত হওয়ায়, বৈঠকটি সবচেয়ে জটিল হয়ে ওঠে। উরুগুয়ে বৈঠকের চূড়ান্ত আলোচনায় পৌঁছার জন্য ১৯৯০ সালে ব্রাসেলসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি ভর্তুকি নিয়ে ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়ায় তা ভেঙে যায়। পরে গ্যাট-এর প্রাক্তন মহাসচিব আর্থার ডাংকেল ১৯৯১ সালের ২০ ডিসেম্বরে সভা ডেকে ৪৩৬ পৃষ্ঠার এক খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু ফ্রান্স, জার্মানির মতো ধনী দেশগুলোর বিরোধিতার ফলে সমস্ত উদ্যোগ নস্যাৎ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বরের অষ্টম রাউন্ডের চুক্তি

হিসেবে ডাংকেল প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১২০টি দেশের প্রতিনিধিরা ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল এক সম্মেলনে ডাংকেল প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

সারণি : ২৮

নির্বাচিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অসমতা

	মোট জাতীয় উৎপাদন ডলার, বিলিয়ন	মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (ডলার)	পিপিপি (PPP, ডলার)[ক]	জাতীয় আয়ের শতকরা ভাগ	PQLI বা জীবনযাত্রার বাস্তবসম্মত মান[খ]
উচ্চআয়ের দেশ					
যুক্তরাষ্ট্র	৬,০৮১ (ট্রিলিয়ন)	২৪৭৪০	২৩,৭৬০	৪১.৯	৯৮
জাপান	৩,৫৬৫	২৮,৬৯০	২০,৫২০	৩৭.৫	১০১
জার্মানি	১,৮৭৭	২৩,৫৬০	২১,১২০	৪০.৩	৯৮
ব্রিটেন	১,০৪৬	১৮,১১০	১৭,১৬০	৪৪.৩	৯৮
ফ্রান্স	১,২৯৬	২২,৬৩০	১৯,৫১০	৪১.৯	৯৯
ইতালি	১,১৮৭	১৮,০৯০	১৮,০৯০	৪১.০	৯৮
কানাডা	৬০০	২১,০৭০	২০,৫২০	৪০.২	৯৯
মধ্যমাত্রার আয়ের দেশ					
ব্রাজিল	৪৩২.২	২,৮১০	৫,২৪০	৬৭.৫	৭৯
ভেনিজুয়েলা	৫৯.৭	২,৯২০	৮,৫২০	৪৯,৫	৮৭
ফিলিপাইন	৫০.১	৭৯০	২,৮৫০	৪৭.৮	৮৩
কলম্বিয়া	৪৫.১	১৩.৫০	৫,৪৮০	৫৫.৮	৮৬
পেরু	৩০.৩	১৩৫০	৩,৩০০	৫১.৪	৭৮
আইভরি কোস্ট	৮.৭	৬৮০	১,৭১০	৪৪.১	৫৬
জামাইকা	৩.৩	১,৩৯০	৩,২০০	৪৮.৪	৯৬
নিম্নমাত্রার আয়ের দেশ					
ভারত	২৭৪.২	৩০০	১,২৩০	৪১.৩	৬০
ইন্দোনেশিয়া	১২৮.৩	৬৮০	২,৯৫০	৪২.৩	৭৪
পাকিস্তান	৫৪.৩	৪২০	২,৮৯০	৩৯.৭	৫৪
বাংলাদেশ	২৪.৮	২২০	১,২৩০	৩৮.৬	৪৭
শ্রীলংকা	৯.৯	৫৬০	২,৮৫০	৩৯.৩	৯০
ঘানা	৭.৩	৪৬০	২,১১০	৪৪.১	৬১

ক. PPP-এর অর্থ Purchasing Power Parity। ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী মাথাপিছু আয় নির্ধারণ করার এক ধরনের হিসাব।

খ. PQLI এর অর্থ Physical Quality of Life Index.

সূত্র জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও পিপিপির তথ্যাবলি নেয়া হয়েছে Human Development Report, 1995 (New York Oxford University Press, 1995) থেকে।

গ্যাট চুক্তিতে কি আছে

বাইশ হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী ডাংকেল প্রস্তাবের বহু আলোচিত চারটি চুক্তির মধ্যে প্রথমটি GATS, দ্বিতীয়টি TRIM, তৃতীয়টি TRIP এবং চতুর্থটি MFA। GATS হচ্ছে General Agreement on Trade in Services, TRIM হচ্ছে Trade Related Investment Measures, TRIP হচ্ছে Trade Related Intellectual Property Rights, আর MFA হচ্ছে Multi-Fibre Agreement। GATS-এর আওতায় ব্যাংক, বিমা, পর্যটন, দোকানপাট, পরিবহণ, বিমান, হোটেল, সিনেমা, টেলিভিশন, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি সার্ভিস বা সেবামূলক বাণিজ্যিক সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে আনা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সেবা খাত পরিচালনা করবে বেসরকারি লোক বা সংগঠন এবং এ খাতে অবাধ বাণিজ্যের পাশাপাশি বিদেশিদের বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। TRIM-র আওতায় যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, এখন থেকে বিদেশি কোম্পানিগুলোকে দেশীয় কোম্পানির মতো দেখতে হবে। কোনো আলাদা নিয়ম-কানুন এদের ওপর আরোপ করা যাবে না। TRIP-র অর্থ হলো বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব। এ প্রস্তাবে পণ্যের কপিরাইট, ট্রেডমার্ক এবং পেটেন্ট মালিকানাতে নতুন নতুন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। মালিকের অনুমতি ছাড়া পণ্য ব্যবহার না করার নাম ট্রিপ। এ চুক্তির ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। MFA-র নামের আরেকটি বিধান ডাংকেল প্রস্তাবে উল্লেখ আছে। এ প্রস্তাব অনুযায়ী অবাধ বাণিজ্যের স্বার্থে রফতানিকারক দেশের জন্য বর্তমান বিশ্বের কতিপয় দেশে কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে যে কোটা পদ্ধতি চালু আছে, তা তুলে দেবার শর্ত দেয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ২০০৫ সালের জানুয়ারি থেকে কোনো কোটা থাকবে না। ইতোমধ্যে সেই কোটা তুলে নেয়া হয়েছে। ওই চুক্তির ফলে উন্নয়নশীল বিশ্ব কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তা বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা বুঝতে পারব।

বাংলাদেশ গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন পক্ষ ও বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ অভিমত পোষণ করেছেন যে, এই চুক্তির ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। বাংলাদেশ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সে ব্যাপারে একটা ধারণা নিচে দেয়া হলো

(১) গ্যাট চুক্তির ফলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চুক্তি বাস্তবায়নের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলো পোশাক শিল্পের রফতানি কোটা তুলে নেয়ায় বাজার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এর ফলে বাংলাদেশকে গার্মেন্টস শিল্পে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। গ্যাট চুক্তির ফলে আগামিতে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অনেক শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে। বেকার সমস্যা বাড়বে যা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।

(২) গ্যাট চুক্তিতে শিল্পপণ্যের ৪০ শতাংশ শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। শিল্পজাত পণ্য রফতানিতে সংশ্লিষ্ট দেশ আগের মতো আর ভর্তুকি পাবে না। এজন্য স্বল্পোন্নত দেশ ৮ বছর এবং উন্নত দেশ ২ বছর সময় পাবে। এর ফলে আমদানিনির্ভর দেশে পণ্যমূল্য বেড়ে যাবে। বাড়তি চাপ পড়বে ক্রেতাদের উপর। আবার রফতানিতে ভর্তুকি দেয়ার

ফলে যাদের রফতানি বেড়েছিল, তারা এখন আর সেই সুযোগ পাবে না। এর ফলে এদের রফতানি কমে আসবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কেননা বাংলাদেশ আমদানিনির্ভর দেশ।

(৩) 'ট্রিপ'-এর ফলে 'বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে মেধা এখন বাণিজ্যকরণ হবে। গরিব দেশগুলো এতদিন নিজস্ব 'প্যাটেন্ট' আইনের আওতায় উন্নতবিশ্বের প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছিল। বাংলাদেশ এ থেকে বাইরে ছিল না। এখন আর বাংলাদেশ উন্নতবিশ্বের প্রযুক্তি আগের মতো সহজে ব্যবহার করতে পারবে না। এই সুযোগ গ্যাটের চুক্তি বলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে দেয়া হয়েছে। এভাবে মেধাসম্পদ অধিকার সংরক্ষিত হলে বাংলাদেশের মতো গরিব দেশগুলোকে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে উন্নত প্রযুক্তি খরিদ করতে হবে সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে। এ অবস্থায় আমাদের ওষুধ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এ আইনে আক্রান্ত হবে। ইতোপূর্বে ব্যবহৃত ওষুধ, রসায়ন শিল্প, জৈব প্রযুক্তি, কীটনাশক, নানা গাছপালা ও প্রাণী, কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন, মহাকাশ বিজ্ঞান প্রভৃতি গবেষণা আগের মতো আর স্থানীয়ভাবে করা যাবে না।

(৪) প্যাটেন্ট আইন আন্তর্জাতিকীকরণের ফলে আগামিদিনে উচ্চফলনশীল ধান, গম বীজ, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি এককভাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাবে। তারা চুটিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ পাবে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর কৃষি উৎপাদনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। উৎপাদন হ্রাস পাবার সম্ভাবনা এখানে বেশি। এর সুযোগ নিয়ে উন্নতবিশ্ব আগামিতে বাংলাদেশে তাদের কৃষি বাণিজ্য সম্প্রসারণের একটা সুযোগ পাবে। কৃষিখাতের মতো বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এখন পর্যন্ত প্যাটেন্ট সংগ্রহ করে বাংলাদেশকে ওষুধ উৎপাদনের প্যাটেন্ট যোগাড় করতে হবে। তখন তৈরির চেয়ে আমদানিতে বেশি মুনাফা থাকায় আমদানিকেই ব্যবসায়ীরা প্রাধান্য দেবে বেশি। যখন কোনো বহুজাতিক কোম্পানি নতুন কোনো ওষুধ আবিষ্কার করবে এবং বাংলাদেশের কোনো কোম্পানি তার কাছ থেকে প্যাটেন্ট ক্রয় করবে, তখন পরবর্তী ২০ বছর অন্যান্য কোম্পানি ওই ওষুধ তৈরি করতে পারবে না। তার একক মনোপলি থাকবে ২০ বছর। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখনও সরকারি হাসপাতালগুলোতে কিছুটা হলেও বিনামূল্যে চিকিৎসা পান। এটা বন্ধ হয়ে যাবে। চিকিৎসাব্যবস্থা পরিপূর্ণ বাজার হয়ে উঠবে।

(৫) গ্যাট চুক্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের পরিসেবা খাত। বেসরকারিকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিসেবার অনেক খাত এখন মুনাফাভিত্তিক বাণিজ্যে পরিণত হবে। গ্যাট চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ব্যাংক, বিমা, টেলি কমিউনিকেশন, যোগাযোগ, হোটেল ইত্যাদি পরিসেবা এখন বিদেশি পুঁজির কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এখানে বিদেশি কোম্পানিগুলো পুঁজি বিনিয়োগ করবে এবং পরিসেবায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো খাত তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে।

বাংলাদেশে এই চুক্তির বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই প্রতিবাদ উঠেছে। অধ্যাপক রেহমান সোবহান এক সেমিনারে মন্তব্য করেছেন যে, চুক্তি স্বাক্ষরের পর সার্ভিস সেক্টর বিদেশি

পুঁজির জন্য খুলে দিতে হবে। এর ফলে বিদেশি ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি এসে জেঁকে বসতে পারে। অধ্যাপক আনিসুর রহমান বলেছেন, গ্যাট চুক্তির ফলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আরো খর্ব হলো (জনকণ্ঠ, ১৩ এপ্রিল, ৯৪)। তবে বিআইডিএস-এর সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক এস.এম. রেজার মতে, গ্যাট চুক্তির ফলে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা ১০ থেকে ১৫ বছরের সময় পাচ্ছি। এর মধ্যে বাংলাদেশকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। তাঁর মতে, গার্মেন্টসে কোটা সিসটেম তুলে দেয়ায় বাংলাদেশ এখনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এখনই বাংলাদেশের প্রস্তুতি নেয়া উচিত। তিনি শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছিলেন (বাংলাবাজার, ২৫ ডিসেম্বর, '৯৩)।

'ডব্লিউটিও' : গ্যাটের উত্তরসূরি

১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা হচ্ছে বহুপক্ষীয় বাণিজ্য পদ্ধতির আইনগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। বিভিন্ন সরকার কিভাবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আইন ও বিধিসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে 'ডব্লিউটিও' (WTO) তার মুখ্য চুক্তিবিষয়ক বাধ্যবাধকতাসমূহ নির্ধারণ করে। এই সংস্থাই হচ্ছে সেই মঞ্চ, যার ওপর ভিত্তি করে সমষ্টিগত বিতর্ক, আলোচনা এবং মীমাংসার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'ডব্লিউটিও' হচ্ছে উরুগুয়ে রাউন্ড বাণিজ্য আলোচনার প্রতিফলন এবং গ্যাটের উত্তরসূরি সংস্থা।

ডব্লিউটিও-র লক্ষ্য 'সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতির' প্রস্তাবনার একটি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সদস্য দেশগুলো অন্য কোনো দেশের পণ্যসামগ্রীকে অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় অনুরূপ সুবিধা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। "জাতীয় আচরণ" শীর্ষক শর্তে বলা হয়েছে যে, একবার কোনো বাজারে পণ্যসামগ্রী প্রবেশ করলে সেই বাজারের অভ্যন্তরীণ পণ্যের তুলনায় বাইরের পণ্যসামগ্রীকে কোনোভাবেই কম সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

বাজারগুলোতে ক্রমবর্ধমান এবং সম্ভাব্য প্রবেশাধিকার কোটা পদ্ধতিকে অবৈধ ঘোষণা করা হলেও 'ডব্লিউটিও'র আওতায় শুল্ক এবং কাস্টম শুল্ক বৈধ। উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনার মাধ্যমে একশ বিশটি দেশ যে শুল্ক হ্রাস করেছে, সেটা প্রায় ২২,৫০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত জাতীয় শুল্ক তফসিলগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলো এখন 'ডব্লিউটিও-র অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিচিত। শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে পাঁচ বছরে সম্পন্ন হবে। এর ফলে শিল্পায়িত দেশগুলো কর্তৃক উৎপাদিত শিল্পসামগ্রীর ওপর আরোপিত শুল্ক চল্লিশ শতাংশ কর্তন করা হবে। গড়পড়তা ছয় দশমিক তিন শতাংশ থেকে তিন দশমিক আট শতাংশ শুল্ক হ্রাস পাবে। এই শুল্ক হ্রাসের আওতায় উরুগুয়ে রাউন্ড সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহের পরিমাণ উন্নতদেশ এবং উত্তরণ প্রক্রিয়াধীন দেশগুলোর জন্য প্রায় একশ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রায় তিয়াত্তর শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। সদস্য দেশসমূহ বিভিন্ন সেবাখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় বিধিমালা কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রাথমিক কিছু অঙ্গিকার করেছে। এসব অঙ্গিকারের মধ্যে রয়েছে শুল্ক হ্রাসের মতো কিছু বিষয়, যেগুলো বাধ্যতামূলক জাতীয় তফসিলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতার বিকাশ : ভূতপূর্ব গ্যাটের আওতায় যেসব নিয়মকে বিভিন্ন সরকার দুই ধরনের "অন্যায়" প্রতিযোগিতার ওপর ক্ষতিপূরণমূলক শুল্ক আরোপ করার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারত, 'ডব্লিউটিও' সেই নিয়মাবলির ব্যাখ্যা প্রদান করেছে এবং সেগুলো সম্প্রসারণ করেছে। এই দুটো "অন্যায়" প্রতিযোগিতা হচ্ছে 'ডাম্পিং' (বাজারমূল্যের চেয়ে কম দামে পণ্য রফতানি) এবং ভর্তুকি। কৃষি সম্পর্কে ডব্লিউটিও চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, কৃষিখামার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত আচরণ নিশ্চিত করা। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ক্ষেত্রে এটা প্রতিযোগিতার শর্তসমূহের বিকাশ ঘটাবে যেখানে নতুন ধ্যান-ধারণা ও নতুন ধারা সংশ্লিষ্ট। অন্য একটি ক্ষেত্রে 'ডব্লিউটিও' সেবা খাতে সংশ্লিষ্ট শর্তাদির উন্নয়ন ঘটাবে।

উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সংস্কারকে উৎসাহ প্রদান উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত গ্যাট বিধিমালাগুলো 'ডব্লিউটিও'তে অব্যাহত রয়েছে, বিশেষ করে সেই শর্তগুলোর আওতায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বাণিজ্য ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য উন্নত দেশগুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছে। 'ডব্লিউটিও'র অপেক্ষাকৃত দুরূহ শর্তগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উত্তরণের সময় প্রদান করা হয়েছে। সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলোকে আরও অধিক নমনীয়তা এবং সুবিধা দেয়া হয়েছে যাতে করে তারা বাজারে প্রবেশের সুবিধাজনক শর্ত দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে।

প্রধান দায়িত্বসমূহ 'ডব্লিউটিও'র মূল দায়িত্বগুলো হচ্ছে, বহুপক্ষীয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিসমূহ পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন করা, যেগুলো একত্রে 'ডব্লিউটিও'-র সৃষ্টি করেছে। সংস্থার অপরাপর দায়িত্বগুলোর মধ্যে রয়েছে বহুপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনার ফোরাম হিসেবে কাজ করা, বাণিজ্য সম্পর্কিত বিরোধের নিষ্পত্তি করা, জাতীয় বাণিজ্য নীতিসমূহ তদারক করা এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের কাজে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সহযোগিতা করা।

'ডব্লিউটিও'-র কাঠামো : 'ডব্লিউটিও'র সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাখা হচ্ছে মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন, যা প্রতি দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সংস্থার দৈনন্দিন কাজ অবশ্য কিছু সাবসিডিয়ারি শাখার উপর ন্যস্ত, যেমন সাধারণ পরিষদ (জেনারেল কাউন্সিল), যা বিরোধ নিষ্পত্তি শাখা (ডিসপিউট সেটেলমেন্ট বডি) এবং বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা শাখা (ট্রেড পলিসি রিভিউ বডি) হিসেবেও কাজ করে থাকে। সাধারণ পরিষদ তিনটি প্রধান বিভাগের ওপরে দায়িত্ব ন্যস্ত করে থাকে। এগুলো ইচ্ছে, "কাউন্সিল ফর ট্রেড ইন গুডস", "ট্রেড ইন সার্ভিসেস", এবং 'ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্টর অব ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস।" বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা শাখা "কাউন্সিল ফর ট্রেড ইন গুডস", "ট্রেড ইন সার্ভিসেস", এবং 'ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্টস অব ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস।" মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অন্য তিনটি বিভাগও প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলো হচ্ছে, "কমিটি অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট", "কমিটি অন ব্যালেন্স অব পেমেন্টেস" এবং 'কমিটি অন বাজেট, ফিন্যান্স এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।" ডব্লিউটিও'-র আওতাভুক্ত প্রতিটি বহুপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির নিজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ রয়েছে, যেগুলো জেনারেল

কাউন্সিলের কাছে দায়ী থাকে। এ সবের মধ্যে রয়েছে অসামরিক বিমান, সরকারি ক্রয়, দুগ্ধজাত পণ্য এবং গবাদি পশুর গোশত বিষয়ক চুক্তি।

সচিবালয় এবং বাজেট 'ডব্লিডিটিও'-র সচিবালয় জেনেভায় অবস্থিত। এই সচিবালয়ে কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৪৫০ জন। মহাপরিচালক এর প্রধান। এছাড়া রয়েছে আরও চারজন উপমহাপরিচালক। এই সচিবালয়ের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে চুক্তিভিত্তিক আলোচনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে 'ডব্লিউটিও' এর ডেলিগেটদেরকে সেবা প্রদান। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিশেষ করে সর্বাপেক্ষা কম উন্নত দেশগুলোকে টেকনিক্যাল সমর্থন প্রদান করা 'ডব্লিউটিও' সচিবালয়ের একটি বিশেষ দায়িত্ব। সংস্থার অর্থনীতিবিদ এবং পরিসংখ্যানবিদরা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অগ্রগতি এবং বাণিজ্য নীতির বিশ্লেষণ প্রদান করে থাকেন। 'ডব্লিউটিও'-র আইন বিষয়ক কমকর্তারা বাণিজ্য নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সংস্থার নিয়মাবলির ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। নতুন যেসব দেশ সদস্য হতে আগ্রহী তাদেরকে সচিবালয় সহায়তা করে থাকে।

'ডব্লিউটিও'-র বার্ষিক বাজেট প্রায় ৮ কোটি ৩০ লাখ ডলার। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সম্পাদিত মোট বাণিজ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি সদস্য দেশের চাঁদা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই বাজেটের অংশবিশেষ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রও পেয়ে থাকে।

গ্যাট উদ্যোক্তাদের মতে, এই চুক্তির মাধ্যমে বছরে বিশ্বে ২০ হাজার কোটি ডলারের নতুন সম্পদ সৃষ্টি হবে। বাণিজ্য বাড়বে ৭০ হাজার কোটি ডলারের। এর ফলে বাংলাদেশ কতটুকু লাভবান হবে, তা সত্যি সত্যিই একটা চিন্তার ব্যাপার। কৃষি, বস্ত্র, স্বাস্থ্যসেবা, বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ ইত্যাদি নিয়ে যে সব কথা উঠেছে, তা ফেলে দেবার নয়। বস্ত্রখাতে কোটা সিসটেম বিলোপ হয়েছে ইতোমধ্যে। ব্রুকিংস ইন্সটিটিউটের বিশেষজ্ঞ বিল ফ্রেনজেল বিশ্বাস করেন, কৃষি সম্পর্কিত চুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দুভাবে সহায়তা করবে; উৎপাদন ভর্তুকি হ্রাসের ফলে উন্নয়নশীল দেশের কৃষিপণ্যের রফতানিকারকদের পক্ষে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করা সহজ হবে। শুধু শিল্পায়িত দেশে নয়; বিশ্বব্যাপী বাজার প্রবেশের বর্ধিত সুবিধার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রফতানির সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পাবে। বলা হচ্ছে, জাপান ও কোরিয়ার চাপে বাজার উন্মুক্ত হবার ফলে থাইল্যান্ড লাভবান হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রে গম ও ভুট্টার জন্য হ্রাসকৃত ভর্তুকির ফলে আর্জেন্টিনাসহ অন্যান্য দেশ অধিক পরিমাণ দানাদার শস্য রফতানি করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদের ব্যাপারে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে এগারো বছর সময় দেয়া হয়েছে।

গ্যাট চুক্তির ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো ঠিক এই মুহূর্তেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, এটা সত্য। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছে। ভারতে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছে। এছাড়া চুক্তিভুক্ত দেশ জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সসহ বিশ্বের অনেক দেশ আগে থেকেই গ্যাট চুক্তির কৃষিনীতি সম্পর্কে প্রতিবাদ করে আসছে। এসব দেশের মতে কৃষিক্ষেত্রে মুক্তবাজার কোটি কোটি ছোট কৃষিফার্মকে ধ্বংস করে দেবে ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক বেকারত্ব বাড়াবে। তবে এটা সত্য উন্নতবিশ্ব এই গ্যাট চুক্তি নিয়ে যতটা না চিন্তি ত, তার চাইতে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর চিন্তা ও উদ্বেগ অনেক বেশি। জানুয়ারি ('৯৫) মাসে দিল্লিতে সমাপ্ত ৮২টি উন্নয়নশীল দেশের শ্রমমন্ত্রীদের ৫ দিনব্যাপী সম্মেলনে

ওই উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছিল। সম্মেলন শেষে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ধনী দেশগুলোর সংরক্ষণবাদী নীতি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার অগ্রযাত্রা ব্যাহত করবে। প্রস্তাবে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সসহ শিল্পোন্নত দেশগুলো শ্রমের মান বজায় রাখতে আগ্রহী দেশগুলোকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে। এর ফলে শিশুশ্রম এবং অন্যান্য সামাজিক মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশুশ্রমের ব্যবহার রোধকল্পে ধনী দেশগুলো এসব দেশের পণ্য আমদানির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ঘোষণায় গরিব দেশগুলোর রফতানির ওপর থেকে কোটা পদ্ধতি এবং শুল্ক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারে ধনী দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ধনী দেশগুলো বিশ্ব বাণিজ্যের ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতার কারণে বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে গরিব দেশগুলো তাদের ন্যায্য-সুবিধা থেকে বঞ্চিত বলে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন।

সুতরাং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা তথাকথিত বাণিজ্য উদারীকরণের নামে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোকে কতটুকু সাহায্য করছে, এ সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়। ইতোমধ্যে সেটা আরো প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে, সেখানে বিক্ষোভ হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় একজন কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। সব মিলিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গঠিত হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত নাও হতে পারে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার এই ভূমিকা বিংশ শতাব্দীর শেষ দিনগুলোতে তেমন একটা বড় বিতর্কের সৃষ্টি করেনি। কিন্তু একুশ শতকে এই সংস্থার কর্মকাণ্ড শুধু বিতর্কিত নয়, সংস্থাটি আদৌ টিকে থাকতে পারবে কী না, সেই প্রশ্নটি দেখা দিতে পারে।

নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ভূমিকা যেমন বিতর্কিত হয়েছে, ঠিক তেমনি প্রশ্ন উঠেছে গরিব দেশগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি নিয়ে। গরিব দেশগুলো বা উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কীভাবে টিকে থাকবে, সেই প্রশ্নটি আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, নতুন যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠছে, তাতে করে গরিব দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর 'এক ধরনের অর্থনৈতিক উপনিবেশে' পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে এম এন সি বা 'মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন'গুলো পালন করছে একটি বড় ভূমিকা। এম এন সি উন্নয়নশীল বিশ্বে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে তাদের এক ধরনের আধিপত্য কায়েম করেছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ (তেল, গ্যাস, কপার ইত্যাদি) রয়েছে। দেখা যাচ্ছে ওই প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের নামে আই ও সি বা 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়েল কোম্পানিজ' উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার কাঠামোয় প্রভাব বিস্তার করছে। তাদের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করছে ওইসব সরকারকে। কোথাও কোথাও তারা সরকারও পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ

নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান কমে আসবে—এই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু দেখা গেল ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান দিন দিন বাড়ছেই। এ কারণে উত্তর-দক্ষিণ সংলাপের ব্যাপারটি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বরাজনীতিতে

আলোচিত হয়ে আসছে। উত্তর-দক্ষিণ সংলাপের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, উত্তরের ধনী দেশগুলো থেকে দক্ষিণের গরিব দেশগুলোতে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দক্ষিণের দেশগুলোকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা। শুধু অর্থনৈতিক সাহায্যই নয়, প্রযুক্তিহস্তান্তর ও সেখানে জীবনধারার মানের উন্নতির ব্যাপারটিও এর সাথে জড়িত। সাধারণ অর্থে তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে দক্ষিণের দেশ হিসেবে, অন্যদিকে শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোকে বলা হয় উত্তরের দেশ হিসেবে। তবে ঢালাওভাবে তৃতীয় বিশ্বের বা উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোকে দক্ষিণের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে কিনা, এ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। যেমন বাংলাদেশ আর কুয়েতকে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না। এমনকি কম্পুচিয়া কিংবা আলজেরিয়াকেও এই পর্যায়ে ধরা যায় না–যদিও এই চারটি দেশ তৃতীয় বিশ্বের বা উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭৪ সালে সাংবাদিক ও সমাজবিজ্ঞানী ক্লার স্টারলিং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে চতুর্থ বিশ্বের একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, কিছু গরিব দেশ আছে, যারা পরিপূর্ণভাবে বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং বিদেশি সাহায্যের সঞ্চালনের মাধ্যমেই এ দেশগুলো টিকে আছে। মূলত, তৃতীয় বিশ্বের মাঝে এলডিসিভুক্ত দেশগুলোকেই দক্ষিণের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মোট ৪৪ থেকে ৫০টি দেশ এলডিসি'র প্রতিনিধিত্ব করে। দক্ষিণের দেশগুলোর একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই দেশগুলোতে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকায় দেশগুলো গরিব। এই দেশগুলো দীর্ঘদিন পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলোর, বিশেষ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও স্পেনের কলোনী ছিল। দীর্ঘদিন এদেরকে কলোনিয়াল প্রভুরা শাসন করেছে। দীর্ঘদিন এদের শাসনে থাকার ফলে এদের সম্পদের একটা বড় অংশ বিদেশে, বিশেষ করে ইউরোপে পাচার হয়ে গেছে। ফলে নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে দাঁড়াতে পারেনি। অর্থনৈতিক অবকাঠামো এখানে গড়ে তোলা হয়নি। উপরন্তু প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে দেশগুলোকে পরিপূর্ণভাবে পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বলি কেন, উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোও তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ ও মূল্য নির্ধারণের উপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। পশ্চিমাবিশ্ব তথা বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো এ কারণেই দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে উত্তরের ধনী দেশগুলোর কিছু সম্পদ দক্ষিণের গরিব দেশগুলোতে ট্রান্সফার করার। উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনীতিবিদদের ধারণা এতে করে গরিব দেশগুলোর অর্থনৈতিক চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে। পশ্চিম জার্মানির প্রয়াত চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ট গরিব ও ধনী দেশগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের জন্য নর্থ-সাউথ কমিশন গঠন করেছিলেন। কমিশন দীর্ঘদিন এ লক্ষ্যে কাজ করে গেছে এবং তারা কিছু কিছু প্রস্তাবও রেখেছে। কিন্তু সে ব্যাপারে অতীতে ধনী দেশগুলোর কোনো আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে একটা প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ করা যাচ্ছে। আর সেটি হচ্ছে সেখানে সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি। দেখা গেছে, দুর্ভিক্ষ ও অনাহার সেখানে মানুষের মৃত্যুর কারণ ডেকে

আনলেও ওইসব দেশ সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে চলেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে পশ্চিমা ধনী দেশগুলো, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক খাতে ঋণ দিয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বে অস্ত্রসম্ভার গড়ে তুলেছিল। বিভিন্ন সারণি থেকে এ ব্যাপারে একটা চিত্র পাওয়া যাবে। তাতে দেখা যাবে উন্নয়নশীল বিশ্বে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাত কিভাবে অবহেলিত। মানুষের জীবনধারণ, উন্নয়ন ও জ্ঞানের বিকাশের জন্য এই খাত দুটো সরাসরি জড়িত। অথচ দেখা গেছে, এ দুটো খাতের চাইতে সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বেশি রাখা হয়েছিল। স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর সাহায্যদাতা ধনী দেশগুলো এখন সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমানোর কথা বলছে। জাপান এটাকে অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচনা করছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে গত কয়েক বছর যাবৎ শিক্ষাখাতে বেশি বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। ১৯৯৩-৯৪ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষিখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ২৭২৭ কোটি টাকা, অথচ সামরিক খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ১৬২৪ কোটি টাকা। ১৯৯২-৯৩ সালে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৩৭৯ কোটি টাকা।

এক পৃথিবী, দুই চিত্র

বিংশ শতাব্দীর শেষে বিশ্বের প্রায় ছয়শত কোটি মানুষের ('৯৮ সালের হিসাব অনুযায়ী) মধ্যে মাত্র ২৫ ভাগ মানুষ বাস করে উত্তরের ধনী দেশগুলোতে। অথচ শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ থাকেন দক্ষিণের গরিব দেশগুলোতে। ধনী দেশগুলোতে ৫০ কোটি মানুষের নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে বার্ষিক আয় ছিল ২০ হাজার ডলার, আর দরিদ্র দেশগুলোর মানুষের গড় আয় ছিল ৫শ' ডলারের নিচে। বিশ্বে যত শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে, তার ৮৬ ভাগ ধনী দেশগুলোতে, গরিব দেশগুলোতে এই সংখ্যা মাত্র ১৪ ভাগ। ধনী দেশগুলোর মধ্যে আবার শিল্পোন্নত ৫টি দেশ নিয়ন্ত্রণ করে ৬০ ভাগ শিল্প। অন্যদিকে সর্বাধিক অনুন্নত ৪৪টি দেশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মাত্র ০.২১ ভাগ শিল্প। বিশ্বজনসংখ্যার মাত্র ২০ ভাগ বিশ্বসম্পদের মাত্র ১.৪ ভাগ সম্পদ ভোগ করে। কিন্তু একই সংখ্যক ধনী ভোগ করে ৮২.৭ শতাংশ সম্পদ। উত্তরের ধনী দেশগুলোর জনগণ বিশ্বপণ্য সামগ্রীর ৫০-৯০ শতাংশ ভোগ করে। বিশ্বজ্বালানি সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যবহৃত হয় উন্নতবিশ্বে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক বছরে গড়ে ১২ হাজার টন কয়লার সমপরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করে। অথচ ইথিওপিয়ার একজন নাগরিক খরচ করে মাত্র ৫৫ পাউন্ড পরিমাণ জ্বালানি। বিশ্বের মোট মোটর গাড়ির ৯০ ভাগ ব্যবহৃত হয় উন্নতবিশ্বে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রতি ১০ হাজার লোকের জন্য রয়েছে একটি গাড়ি। বিশ্ববাণিজ্যের শতকরা ৮৭.১ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে উন্নতবিশ্ব, বাকি ১২.৯ ভাগ দরিদ্রবিশ্বের। দরিদ্র বিশ্বের শতকরা ৭০ ভাগ লোক বেকার, অথচ উন্নতবিশ্বের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত। একুশ শতকে এসে এই ব্যাবধান আরো বেড়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নের ব্যাপারেও উত্তর ও দক্ষিণের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উত্তরের দেশগুলোতে জন্মকালীন মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১৩, আর দক্ষিণের মধ্যে এই

সংখ্যা ৭৪। শিশুমৃত্যুর হার উত্তরে প্রতি হাজারে ১৮, আর দক্ষিণে ১১২। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা উত্তরে শতকরা ১০০ ভাগ, আর দক্ষিণে মাত্র ৬৮ ভাগ। উন্নতবিশ্বে প্রতি হাজারে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা ৮১ জন, আর দরিদ্র বিশ্বে মাত্র ৯ জন। ধনী দেশগুলো বৈদেশিক ঋণের সুদ দেয় শতকরা ৪ ভাগ, অথচ দরিদ্র দেশগুলো সুদ দেয় ১৭ ভাগ। উন্নত বিশ্বে নিরক্ষর নেই বললেই চলে, অথচ গরিব দেশগুলোতে শতকরা ৮০ জন লোক নিরক্ষর। তৃতীয় বিশ্বের ঋণের পরিমাণ শতাব্দীর শেষের দিকে ছিল প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলার (১০০০ বিলিয়নে ১ ট্রিলিয়ন)। এই পরিমাণ তাদের জিএনপি'র শতকরা ৪৪ ভাগ। এরা উন্নত দেশগুলোকে ঋণের সুদ দিয়েছে ৭৭০০ কোটি ডলার, আর ঋণ পরিশোধ করেছে ৮৫০০ কোটি ডলার। ওই সময় দরিদ্র বিশ্ব থেকে ধনী বিশ্বে নীট সম্পদ চলে গেছে ৫০০০ কোটি ডলার। বিশ্ব অসম বাণিজ্য ও সীমিত সুযোগের কারণে গরিব দেশগুলো বছরে ৫০ হাজার কোটি ডলার লোকসান দেয়। ১৯৬৯-৭০ সালে ধনী ও দরিদ্র বিশ্বের জিএনপি'র অনুপাত যেখানে ছিল ৩০ ঃ ১, সেখানে ১৯৮৯ সালে এই অনুপাত এসে দাঁড়িয়েছে ৫৯ ঃ ১। বাণিজ্যের অনুপাত ছিল ৬২ ঃ ১ ('৬৯-৭০), আর বিংশ শতাব্দী শেষে এর পরিমাণ ৮৬ ঃ ১। জনসংখ্যা একটি সমস্যা হবে উন্নয়নশীল বিশ্বে। জনসংখ্যা কোটির অঙ্ককে ছাড়িয়ে যাবে যেসব শহরে, সেগুলো হচ্ছে—জাকার্তা, ম্যানিলা, ব্যাংকক, ঢাকা, কোলকাতা, মুম্বাই, করাচি, তেহরান, কায়রো, রিও ডি জেনিরো, মেক্সিকো সিটি ইত্যাদি। লোকসংখ্যা উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলোতে যেভাবে বাড়ছে, তার একটা পরিসংখ্যান সারণি ২৯ থেকে পাওয়া যাবে।

সারণি : ২৯

বিশ্ব জনসংখ্যা (মিলিয়ন হিসেবে)

অঞ্চল	১৯৭০	১৯৮৮	২০১০
উত্তর আমেরিকা	২২৬	২৭২	৩১০
পশ্চিম ইউরোপ	৩৩৫	৩৫৫	৩৬৪
দক্ষিণ এশিয়া	৭০১	১০৬২	১৬৯৮
সাহারা সংলগ্ন আফ্রিকা	২৯১	৪৮৮	৯৬৫
ল্যাটিন আমেরিকা	২৮১	৪২৫	৬২৮

ধনী দেশগুলো কৃষিখাতে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে তাদের কৃষকদের উৎসাহিত করছে সত্য, একই সাথে উদ্বৃত্ত শস্য পানির দামে বিশ্ববাজারে ছেড়ে দেয়। ফলে উন্নয়নগামী যেসব দেশ কৃষিপণ্য রফতানি করে, তারা মার খাচ্ছে। তারা তাদের পণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না। বিশ্ববাজার দখল করে আছে উন্নত দেশের বিপুল উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য। অন্যদিকে ভর্তুকিহীন তৃতীয় বিশ্বের কৃষকদের পক্ষে তাদের খরচ পুষিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। তারা উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ফলে তৃতীয় বিশ্বে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয় না। প্রসঙ্গক্রমেই এখানে একটা তথ্য দেয়া প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থাভুক্ত ২৪টি দেশ ১৯৯০ সালে কৃষিখাতে ৩২০০০ কোটি ডলার ভর্তুকি দিয়েছিল। ইইউভুক্ত দেশগুলোর ভর্তুকির পরিমাণ ওই সময় ছিল ৮০০০ কোটি পাউন্ড।

অর্থাৎ এসব দেশের প্রতিটি নারী, পুরুষ ও শিশু কৃষিতে ভর্তুকি দিয়েছিল জনপ্রতি ২৫৩ ব্রিটিশ পাউন্ড স্টার্লিং। ১৯৯০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষিখাতে যে পরিমাণ ভর্তুকি দিয়েছিল তার পরিমাণ নাইজেরিয়ার গোটা অর্থনীতির মূল্যের চেয়ে বেশি।

সারণি : ৩০

ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য

ধনী বিশ্ব	গরিব বিশ্ব
বিশ্ব জনসংখ্যার ২৫%	বিশ্ব জনসংখ্যার ৭৫%
৮০% জ্বালানি ব্যবহার	২০% জ্বালানি ব্যবহার
বিশ্বের মোট শিল্পের ৮৬%	বিশ্বের মোট শিল্পের ১৪%
পাঁচটি শিল্পোন্নত দেশের নিয়ন্ত্রণাধীনে ৬০% শিল্প	সবচেয়ে অনুন্নত ৪৪টি দেশের নিয়ন্ত্রণে ০.২১ ভাগ শিল্প
দৈনিক পানি খরচ ৩৫০-১০০০ লিটার	দৈনিক পানি খরচ ২০-৪০ লিটার
শিল্পে পানি ব্যবহার ৪০%	কৃষিতে পানি ব্যবহার ৯৩%
৫০ কোটি লোকের বার্ষিক আয় ২০ হাজার ডলারের ওপরে	৩০০ কোটি লোকের বার্ষিক আয় ৫শ' ডলারের নিচে
১৯৯১ সালে সামরিক ব্যয় ৭৬২০০ কোটি ডলার	১৯৯১ সালে সামরিক ব্যয় ১২৩০০ কোটি ডলার
বৈদেশিক ঋণের সুদ দেয় ৪%	বৈদেশিক ঋণের সুদ দেয় ১৭%
বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু আড়াই লাখ, আহত ১ কোটি	৮০ কোটি লোক নিরক্ষর
৮৫% রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে	ডায়রিয়ায় বছরে ৪৬ লাখ শিশুর মৃত্যু
৮% শ্রম শক্তি কৃষিতে	গাড়ি ও লোকের অনুপাত ১ ঃ ১০০০০
প্রতি হাজারে বিজ্ঞানী ৮০'র উপরে	৭০ কোটি লোক বেকার
	১৯৯০- ১০ কোটি লোক দুর্ভিক্ষের শিকার
	বিশ্ব বাণিজ্যের ১২.৯% নিয়ন্ত্রণে

সূত্র আর্থ পত্রিকার সৌজন্যে দৈনিক বাংলা, ৯ শ্রাবণ ১৩৯৯।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনার কথা বলা হলেও, বাস্তবক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে অতি সামান্যই। এর মূল কারণ মূলত, ধনী দেশগুলোর 'অসহযোগিতা। ধনী দেশগুলো যে তৃতীয় বিশ্বে ঋণ দেয়, তা তাদের জাতীয় আয়ের এক ভাগেরও নিচে। ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর (শতকরা ০.৭ ভাগ) দাবি উঠলেও পরিমাণ বাড়েনি। সুতরাং উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ তখনই কার্যকর হবে, যদি উত্তরের ধনী দেশগুলো সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে গরিব দেশগুলোর সাহায্যার্থে আসে। না হলে, কমিশন গঠন করেও ধনী ও গরিব দেশগুলোর ব্যবধান কমানো যাবে না। উত্তর-দক্ষিণ সংলাপের জন্য চাই বাস্তবমুখী উদ্যোগ। আর উদ্যোগটা গ্রহণ করতে হবে ধনী দেশগুলোকেই।

সারণি : ৩১
মাথাপিছু সামরিক ব্যয় ও জাতীয় আয়ের তুলনামূলক চিত্র
(ডলার হিসেবে)

এলাকা	বছর	মাথাপিছু সামরিক ব্যয়	মাথাপিছু জাতীয় আয়
বিশ্ব	১৯৮৪	২৬৩	৪৭৮৫
	১৯৮৯	২৩৯	৫১৮৩
	১৯৯৪	১৪৯	৫০০৩
আফ্রিকা	১৯৮৪	৩৯	৭০৬
	১৯৮৯	২৯	৬৬৬
	১৯৯৪	১৭	৬১১
পূর্ব এশিয়া	১৯৮৪	৭৪	২৯৭৩
	১৯৮৯	৭৫	৩৬৬৩
	১৯৯৪	৭৬	৪২৫৪
ন্যাটো (ইউরোপ)	১৯৮৪	৪৯৯	১৪১১০
	১৯৮৯	৪৯২	১৫৯৭০
	১৯৯৪	৪১৫	১৬৯৩০
ওয়ারশ	১৯৮৪	৪১০	৯১৮৩
	১৯৮৯	১০৩৫	৯৬৩৪
	১৯৯৪	২৮৪	৪৩২৪
ল্যাতিন আমেরিকা	১৯৮৪	৬৪	৩০৮৭
	১৯৮৯	৫৩	৩১৭৭
	১৯৯৪	৪১	৩৩৬২
মধ্যপ্রাচ্য	১৯৮৯	৬৪০	৩৫৮৩
	১৯৮৯	৩৬২	৩৮২৮
	১৯৯৪	২১২	২৭৪৪
যুক্তরাষ্ট্র	১৯৮৪	১৩৮৮	২২৬০
	১৯৮৯	১৪২৮	২৪৭৩০
	১৯৯৪	১১০৫	২৫৮১০
সোভিয়েত ইউনিয়ন	১৯৮৪	১৩২১	১০১৬০
	১৯৮৯	১২১৯	১০৬৪০
সি আই এস	১৯৯৪	৩৪৫	৪০৭১

সূত্র Richard Goff, Wather Moss, et al, the Twentieth Century, A Brief Global History, Boston, 1994. P. 570.

অর্থনৈতিক জোট

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়েছে, তা নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি দিক। এপেক এই অর্থনৈতিক জোটের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম। নয়াবিশ্ব ব্যবস্থায় এপেকের গুরুত্ব দিনে দিনে বাড়ছে। যে ২১টি দেশ নিয়ে এপেক গঠিত,

সেগুলো হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, তাইওয়ান, হংকং, মেক্সিকো, পাপুয়া নিউগিনি, চিলি, রাশিয়া, ভিয়েতনাম ও পেরু। ১৯৮৯ সালে মাত্র ১২টি দেশ নিয়ে এপেক যাত্রা শুরু করেছিল। এপেক পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। এই ফোরামে বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিধর জি-৭-এর সদস্যভুক্ত দেশগুলো যেমন রয়েছে (যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা), ঠিক তেমনি রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোও (মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন)। একই সাথে হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উঠতি অর্থনৈতিক শক্তির দেশও রয়েছে। পৃথিবীর তিনটি বড় অর্থনৈতিক শক্তির একটি হচ্ছে এপেক। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর সাথে উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার দেশগুলোর একটা সম্মেলন ঘটেছে এই ফোরামে। এপেক মূলত একটি বাণিজ্য জোট। জোটভুক্ত এই অঞ্চলগুলোর লোকসংখ্যা ২শ' কোটিরও বেশি। সারা বিশ্বের উৎপাদিত পণ্যের প্রায় ৫৫ ভাগ জোটভুক্ত দেশে উৎপাদিত হয়। এ অঞ্চলের জিডিপি'র পরিমাণ ১৬ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার। আর এদের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৫ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলার। বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অধিকারী প্রতিটি দেশ এই জোটের অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কর্মকর্তাদের মতে, প্যাসিফিক রিম হচ্ছে এখন এক ট্রিলিয়ন (১ হাজার বিলিয়ন) ডলার মূল্যের বাণিজ্য বাজার। এ এলাকায় দ্রুত ব্যবসার প্রসার ঘটছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানি ও মাইক্রোসফ্‌ট কর্পোরেশন দুটোর ধারণা তাদের ব্যবসা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এ অঞ্চল, বিশেষ করে এশিয়ায় প্রসার লাভ করবে। বোয়িং প্রজেক্টগুলোর মধ্যে ২০১০ সালের মধ্যে শুধু চীনেরই প্রয়োজন হবে ৪০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ৮শটি নতুন বিমান। আর মাইক্রোসফ্‌ট জানিয়েছে যে, এপেকের এশীয় সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া তার রাজস্বের পরিমাণ প্রতিবছর শতকরা ৬০ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। চীন দ্রুত অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে জাপানের সাথে যোগ দিতে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জাপানের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল ৫০ বিলিয়ন ডলার। ১৯৯৪ সালে এর পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ৭০ বিলিয়ন ডলারে। আর চীনের দ্বি-পাক্ষিক উদ্বৃত্ত ছিল ১৮ বিলিয়ন ডলার, যা এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম। প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯২ সালে এই অঞ্চলে রফতানি করেছে ১৩ হাজার কোটি ডলার। এর ফলে ২৪ লাখ মার্কিনির কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এই কারণেই এই এলাকার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা শক্তিগুলোর আগ্রহ বাড়ছে।

ইতোমধ্যে এপেক সম্মেলনে এমন সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যা বিশ্ববাণিজ্য তথা শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে ফিলিপাইনের 'সুবিক বে'তে যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে 'ম্যানিলা অ্যাকশন' প্ল্যান গৃহীত হয়। এতে ২০২০ সালের মধ্যে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মুক্তবাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার করা হয়। তবে জোটভুক্ত উন্নত দেশগুলোর জন্য এই সময়সীমা ধরা হয়েছিল ২০১০, আর অনুন্নত দেশগুলোর জন্য ধরা হয়েছে ২০২০। যদিও ওই সময়সীমার ব্যাপারে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির

মোহাম্মদ আপত্তি তুলেছিলেন। 'ম্যানিলা অ্যাকশন' প্ল্যানে ২০০০ সালের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির ওপর ট্যারিফ বিলুপ্ত করার মার্কিন পরিকল্পনাটি গ্রহণ করার জন্য বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। এই ব্যাপারেও আপত্তি ছিল অনেক রাষ্ট্রের। বিশেষ করে কম্পিউটার, সেমিকন্ডাক্টর, সফ্টওয়ার ও টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামের ক্ষেত্রে এখন ট্যারিফ হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে বৃহৎ উৎপাদক যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পণ্যে এই অঞ্চলের বাজার ভরে যাবে। ফলে এই অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে হারিয়ে যাবে। এপেক ফোরামে অংশ নিয়ে চীন একুশ শতক শুরু হবার আগেই বেশকিছু আইটেমের উপর ১৫ থেকে ২৩ ভাগ হারে ট্যারিফ বা শুল্ক হ্রাস করেছে। কেননা যুক্তরাষ্ট্র বারে বারে বলে আসছিল চীন যদি শুল্ক হ্রাস না করে, তা হলে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় চীনের অন্তর্ভুক্তিকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করবে না।

সারণি : ৩২

এপেকভুক্ত দেশগুলোর সামাজিক চিত্র

দেশ	মোট জাতীয় উৎপাদন (১৯৯২, ডলার)	মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (১৯৯২, ডলার)	জনসংখ্যা মিলিয়ন (২০০০)	PQLI বা জীবনযাত্রার বাস্তবসম্মত মান
যুক্তরাষ্ট্র	৬,০৮১ (ট্রিলিয়ন)	২৩,৮৩০	২৭৫.১	৯৮
জাপান	৩,৫৬৫	২৮,৬৯০	১২৬.০	১০১
কানাডা	৬০০ (বিলিয়ন)	২১,০৭০	৩১.০	৯৯
চীন	৫৬৮	৪৮০	১,২৮৪.৬	৮৪
দক্ষিণ কোরিয়া	৩১৫	৭,২২০	৪৭.১	৯২
মেক্সিকো	৩১০	৩,৫১০	১০২.৪	৮৭
অস্ট্রেলিয়া	৩০৮	১৭,৭৩০	১৯.২	৯৯
তাইওয়ান	২০৯	১০,০০০	২১.৩	৯৫
হংকং	৯১	১৫,৭১০	৬.০	৯২
নিউজিল্যান্ড	৪৪	১২,৬৬০	৩.৮	৯৮
চিলি	৩৮	২,৭৮০	১৫.৩	৯২
পাপুয়া নিউগিনি	৪	৯৯০	৪.০	৬১
আসিয়ান ভুক্ত দেশগুলো				
ইন্দোনেশিয়া	১২৮	৬৮০	২১২.৭	৭৪
থাইল্যান্ড	১০৫	১,৮৪০	৬১.৯	৮৭
মালয়েশিয়া	৫৩	২,৮৩০	২২.৩	৮৬
ফিলিপাইন	৫০	৭৯০	৭৪.৬	৮৩
সিঙ্গাপুর	৪৭	১৬,৯৭০	৩.০	৯৩
ব্রুনাই	৩.৫	৮,৮০০	০.৩	৭৯

সূত্র : Human Development Report 1995, The World Almanac, 1994.

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এশিয়ার অর্থনৈতিক মন্দা এপেক রাজনীতিতেও বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে এপেক নেতৃবৃন্দ যখন ভ্যাংকুভারে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন, তখন এশিয়াতে অর্থনৈতিক সংকট শুরু

হয়। কিন্তু এপেক নেতৃবৃন্দ ওই সম্মেলনে কোনো কর্মসূচি নেননি। এমনকি কিভাবে এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট কাটানো যায়, সে ব্যাপারেও কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। শীর্ষ সম্মেলন শেষে গৃহীত প্রস্তাবে তখন বলা হয়েছিল এপেক এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেবে না। বরং তারা আই এম এফ-এর প্রচেষ্টা জোরদার করার সুপারিশ করেছিলেন। অন্য বিষয়গুলো এবার কম আলোচিত হয়েছে। তবে এপেকভুক্ত দেশগুলো যাতে মুক্তবাজার তথা মুক্তবাণিজ্যের পথ থেকে সরে না দাঁড়ায়, তেমন আহ্বানও জানানো হয়েছিল। সম্মেলনে জাপান এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে ৩ হাজার কোটি ডলারের একটি প্যাকেজ প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিল।

এপেকের বয়স আঠারো বছর। ১৯৮৯ সালের ক্যানবেরা সম্মেলনে মাত্র ১২টি দেশ নিয়ে এপেক যাত্রা শুরু করেছিল। এখন সদস্যসংখ্যা ২১ দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের দেশ এই এপেক ফোরামে প্রতিনিধিত্ব করছে। তবে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যে নেই, তা নয়। এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকটের জন্য মুক্তবাজার নীতি দায়ী বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই এলাকায় একটি অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে উঠবে কিনা, তা নিয়েও রয়ে গেছে সন্দেহের অবকাশ। এই অঞ্চলে প্রচণ্ড মার্কিন-বিরোধিতাকেও অস্বীকার করা যায় না। উপরন্তু এই অঞ্চলে যেসব অর্থনৈতিক জোট রয়েছে, বিশেষ করে আফটা (Asian Free Trade Area) কিংবা নাফটার (North American Free Trade Association) সাথে এপেকের সম্পর্ক কী হবে সেটিও স্পষ্ট নয়। এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান মার্কিন উপস্থিতির ব্যাপারে মাহাথির মোহাম্মদের প্রবল আপত্তি ছিল। এপেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণে তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি মূলত এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়েই একটি অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেন মার্কিন নীতি এ অঞ্চলের উন্নয়নের জোটকে বিপন্ন করতে পারে।

প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ ফ্রেড বার্গস্টেইন-এর নেতৃত্বাধীন 'প্রখ্যাত ব্যক্তিদের' একটি কমিটি একটি উন্মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যে এপেক ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব দ্রুত এগুতে চাইছে। শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্যের যে কথা বলা হয়েছে, তাতে সদস্যভুক্ত অনুন্নত দেশগুলোর স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হবে, তার কোনো দিক্‌নির্দেশনা নেই। রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট সমাধানে এপেক দেশগুলো থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। এপেকভুক্ত এশিয়ার দেশগুলোতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে সত্য কিন্তু সেখানকার বেকারত্বের অবসান ঘটেনি। প্রকৃত আয় আর আগের জায়গায় ফিরে আসেনি। এমনকি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছিল তাও থেমে গেছে। ফলে অস্থিরতা এখনও রয়ে গেছে। সুতরাং বড় অর্থনৈতিক জোট হিসেবে এপেকের আজ বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। এটা না করে এপেক যদি প্রতিবছর শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয় তা হলে প্রতিষ্ঠানটি একটি কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে বাধ্য।

নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাণিজ্যিক জোট। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এখন আঞ্চলিকভাবে জোট গঠিত হচ্ছে। একদিকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা অন্যদিকে একাধিক আঞ্চলিক জোট এখন নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। মুক্তবাজার অর্থনীতি

ও শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গড়ার লক্ষ্যেই গড়ে তোলা হচ্ছে এইসব অর্থনৈতিক জোট। ইউরোপে ইউরোপীয়ান কমিউনিটি, যা কিনা ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, ইতোমধ্যে বিশ্বঅর্থনীতিতে অন্যতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ঠিক তেমনি এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন ফোরাম বা এপেক পৃথিবীর তিনটি বড় অর্থনৈতিক জোটের একটি।

উপসংহার

নতুন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে উচ্চারিত হলেও, এ ব্যাপারে তেমন একটা অগ্রগতি হয়নি। বিশ্বব্যাংক ও আই এম এফ নিয়ে বিতর্ক এখন আগের চাইতে অনেক বেশি। এমনকি একুশ শতকের প্রথম দিকে এসে বাংলাদেশেও এ দাবি জোরালো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে এই সংস্থা দুটোর আদৌ প্রয়োজন নেই। একই কথা উঠেছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা নিয়েও। অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা ধনী দেশ তথা এমএনসির পক্ষে কাজ করছে। বিশ্ব এখন বিশ্বায়নের যুগে প্রবেশ করেছে। বাণিজ্য এখন উন্মুক্ত। কিন্তু তথাকথিত উদারনীতি, কিংবা বাজার উন্মুক্ত করার মধ্য দিয়ে যদি উন্নয়নশীল বিশ্ব উন্নত বিশ্বের বাজারে পরিণত হয়, তাহলে তা আগামিতে বিশ্বঅর্থনীতিতে একটি বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হবে, তা প্রাধান্য পাওয়া উচিত। অর্থনৈতিক জোটে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, সেখানে ধনী দেশগুলোর কর্তৃত্ব বেশি। সুতরাং নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি পরিবর্তন আসা বাঞ্ছনীয়।

সহায়ক গ্রন্থ

১. তারেক শামসুর রেহমান, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ঢাকা ২০০২।
২. মোঃ আবদুল হালিম, ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, ঢাকা, ২০০৩
৩. Jaon E. Spero and Jeffrey A. Hart, 'The Politics of International Economic Relation', New York. 1997.
৪. Mahbub ul Haq, 'The Poverty Curtain : Choices for the Third World', New York. 1976.
৫. Jeffrey J. Schott, 'The Uruguay Round : An Assessment', Washington, D.C. 1994.
৬. Vinod K. Aggarwal, Debt Games 'Strategic Interaction in International Debt Rescheduling', New York, 1996.
৭. The Challenge to the South, 'The Report of the South Commision', New York, 1990.
৮. Robert Gilpin, 'The Political Economy of International Relations', New Jersey, 1987.
৯. Susan George, 'The debt Bomerang How Third World Debt Harms us All', London, 1992.

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যা

...from the down of consciousness until August 6, 1945 man had to live with the prospects of his death as an individual, since that day when the first bomb outshore the sun over Hiroshima, mankind as a whole has had to live with the prospect of its extinction as a species.

Arthur Koestler
(Quoted in Jeremy Rifkin's Biosphere Politics)

পরিবেশগত সমস্যা একুশ শতকে এসে বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে দেখা দিলেও মূলত বিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই এই সমস্যাটি বিশ্বনেতৃবৃন্দকে ভাবিয়ে তোলে। নানাবিধ কারণে বিশ্ব পরিবেশ আজ হুমকির মুখে। একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে। গত নভেম্বরে (২০০৭) বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস 'সিডরের' আঘাতে বড় ধরনের পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। বলা হচ্ছে, বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণেই এমনটি ঘটেছে। ১৯৯২ সালের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন। ওই সম্মেলনের মধ্য দিয়েই পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে শতাব্দী শেষ হবার আগেই একাধিক পরিবেশগত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সম্মেলনেই বিশ্ব যে বড় ধরনের পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, সে ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয় এবং পরিবেশ বিপর্যয় রোধে করণীয় নির্ধারণ করা হয়। ইতোমধ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে *ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)*। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আইপিসিসির সাথে জড়িত। গত নভেম্বরে ('০৭) আইপিসিসির এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, বিশ্বে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে পরিণতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। মহাসচিব বান কি মুন স্পেনের ভ্যালেনসিয়া থেকে এ রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছিল, এক দশক আগে যে হারে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ হতো, এখন তার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে যে

পরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হয় তার ৯০ ভাগই মানুষের সৃষ্টি। এর প্রভাবে উভয় মেরুর বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে এবং বহু প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যদি দেড় থেকে আড়াই ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায় তাহলে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ প্রজাতি বিলুপ্তির মুখে পড়বে। পৃথিবীতে বিশুদ্ধ পানির সংকটও বাড়বে। সংকট বর্তমানের তুলনায় ৭৫ থেকে আড়াইশ' গুণ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সমুদ্রে যেসব প্রবাল প্রাচীর রয়েছে সেগুলোও এর ফলে ধ্বংসের মুখে পড়বে। একইসাথে অ্যান্টার্কটিকায় প্রাগৈতিহাসিক কালের বরফ স্তর গলতে শুরু করেছে এবং বর্তমান পৃথিবীর অন্য যে কোনো এলাকা থেকে দ্রুতগতিতে উষ্ণ হচ্ছে অ্যান্টার্কটিকা। এখানকার বর্তমান তাপমাত্রা গত ১৮০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ৮০ হাজার অস্থায়ী বাসিন্দার এই মহাদেশের আয়তন ইউরোপের চেয়ে ২৫ গুণ বড়। আর এখানকার বরফে জমে আছে ভূস্তরের ৯০ শতাংশ বিশুদ্ধ পানি। অ্যান্টার্কটিকার বরফ স্তর এখন পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার পুরু থাকলেও বিজ্ঞানীরা বলছেন, সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতোমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে। সুতরাং বিশ্বের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি এখন আর ধারণাগত কোনো বিষয় নয় বরং এটি বাস্তব।

কিয়োটো প্রটোকল

পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা বললে আমাদের প্রথমেই কিয়োটো প্রটোকলের কথা বলতে হবে। কিন্তু গত ২৯ মার্চ (২০০১) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশ কিয়োটো প্রটোকল প্রত্যাখ্যান করায় ওই চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি বড় ধরনের অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়োটোতে বিশ্ব তাপমাত্রা রোধ-সম্পর্কিত একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্বের ১৬০টি দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিরা এই শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বুশের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী আল গোর। শীর্ষ সম্মেলনে কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ওই চুক্তিতে বেশকিছু সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছিল, যা উন্নত তথা উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো পালন করবে এবং যা কি না ভবিষ্যতে বিশ্বের তাপমাত্রা রোধ করতে সাহায্য করবে। জাতিসংঘের উদ্যোগেই এই শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।

কিয়োটো চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার তিন বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বড় দেশ এই চুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করায় ওই চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছে, ঠিক তেমনি প্রশ্ন উঠেছে বিশ্বের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা, তা নিয়ে। এখানে বলা ভালো বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য গ্রিন হাউজ গ্যাসকে দায়ী করা হয়। এ কারণেই কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর মাত্রা হ্রাস করার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসা জরুরি ছিল। কিয়োটোতে বিশ্বনেতারা দীর্ঘ ১১ দিন সময় নিয়েছিলেন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে। কিয়োটোতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিঃসারণের মাত্রা ১৯৯০

সালের মাত্রার চেয়ে ৮ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্র ৭ শতাংশ, জাপান ৬ শতাংশ হ্রাস করবে। তা ছাড়া সার্বিকভাবে ৫.২ শতাংশ গ্যাস নিঃসারণ হ্রাসের আইনগত বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সবগুলো দেশকে ২০০৮-১২ সালের মধ্যে গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবার পর দেশগুলো গ্যাস নিঃসারণের মাত্রা আরো হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই কিয়োটো চুক্তি নিয়ে শঙ্কা ছিল। বিশেষ করে মার্কিন তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলো প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিল তারা কিয়োটো চুক্তির বাধ্যবাধকতা মানবে না। পরিবেশবাদী সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর মার্কিন তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিলেও প্রেসিডেন্ট বুশের সিদ্ধান্তের পর মনে হচ্ছে, বুশ মার্কিন তেল, গ্যাস কোম্পানিগুলোর স্বার্থরক্ষা করছেন। কিয়োটো প্রটোকল নিয়ে যখন বড় ধরনের অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল, তখন গেল নভেম্বরে (২০০৭) বালিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জলবায়ু সংক্রান্ত আরেকটি শীর্ষ সম্মেলন।

বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্যে শিল্পোন্নত দেশগুলো মূলত দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলা যেতে পারে। বিশ্বে যত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিঃসারণ হয়, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রেই নিঃসারণ হয় শতকরা ২৫ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্রের তেল ও গ্যাস খনিগুলো এর জন্যে দায়ী। ওয়াশিংটনভিত্তিক বিশ্বপরিবেশ গবেষণা সংস্থা ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউট তাদের ১৯৯৭ সালের বিশ্বপরিবেশ পরিস্থিতি-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বিশ্বের ৮টি দেশের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছিল যেখানে পরিবেশ দূষণ পরিস্থিতি অত্যন্ত মারাত্মক। এই দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, রাশিয়া, জাপান, জার্মানি ইত্যাদি। এই দেশগুলোর নামকরণ করা হয়েছে ই-৮ হিসেবে। এই দেশগুলোতে বিশ্বের ৫৬ ভাগ লোক বাস করে। বিশ্বের মোট বনভূমির শতকরা ৫৩ ভাগ রয়েছে এখানে। আর গোটা বিশ্বে সর্বমোট যত কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়, তার শতকরা ৫৮ ভাগ নির্গত হয় এই দেশগুলোতে। ইতোমধ্যে ধরিত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশমালা বাস্তবায়নের অগ্রগতি তদারকির জন্য গঠিত হয়েছে ধরিত্রী পরিষদ। এই পরিষদ তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে, ১৯৯০ সালের পর পৃথিবীর অনেক দেশেই কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসারণের পরিমাণ শতকরা ২০ থেকে ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ১শ' ৫০ কোটি লোক বিশুদ্ধ বাতাস থেকে বঞ্চিত। ১৯৮৭ সালে মনট্রিলে পরিবেশ সংক্রান্ত যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ওজোন স্তর বিনষ্টকারী দূষিত রাসায়নিক পদার্থের নিঃসারণ পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ওই সিদ্ধান্ত কাগজ-কলমেই থেকে গেছে।

বিশ্বে এখন নানাভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর চেয়ে উন্নত বিশ্বেই পরিবেশ দূষণের মাত্রা বেশি। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা গ্রিনহাউজ গ্যাসের যে কথা বলেছেন, সেই গ্রিন হাউজ গ্যাস পৃথিবীর উত্তাপ বাড়ার অন্যতম কারণ। বায়ুমণ্ডলে বিরাজমান এই গ্যাসের কারণে বহির্গামী তাপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসছে। আর তাতে করে বাড়ছে পৃথিবীর উত্তাপ। এসব গ্রিনহাউজ গ্যাসের মধ্যে রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো-কার্বন, মিথেন,

নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি। জ্বালানি, বন উজাড়, মানুষের অন্যান্য কার্যক্রমের কারণে কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ বাড়ছে। বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাস দীর্ঘকাল অবস্থান করে, প্রায় ৫০ থেকে ২০০ বছর পর্যন্ত। আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন 'গ্রিন পিস'-এর এ ্ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার বছরে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ যত বেড়েছে, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বেড়েছে গত তিনশ পঁচিশ বছরে। এক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের পাল্লা ভারী।

UNEP (United Nations Environment Programme)-এর প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, ১৮০০-১৯৮৮ সময়সীমায় উন্নত দেশসমূহে কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর নির্গমনের হার শতকরা ৮৩ দশমিক ৭ ভাগ, আর স্বল্পোন্নত দেশসমূহে এর হার মাত্র ১৬ দশমিক ৩ ভাগ। গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, উন্নত দেশসমূহের নির্গমনকৃত ৮৫ শতাংশ ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (যা শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হয়) ও ৫০ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকেই ওজোন স্তরে ক্ষয় ও ভূমণ্ডলীয় উত্তাপের মতো পরিবেশ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। গত একশ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৩ ডিগ্রি থেকে ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ১০ হাজার বছরের ইতিহাসে তাপবৃদ্ধি এই মাত্রাটাই সর্বোচ্চ। এটা আগামি ২০৩০ সাল নাগাদ ১ ডিগ্রি থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাড়বে সমুদ্রতলের উচ্চতা। গত শতাব্দীতে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১-২ সেন্টিমিটার। ভূমণ্ডলীয় উত্তাপের ফলে ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়বে ৩০-৫০ সেন্টিমিটার। এর ফলে সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলগুলো নিমজ্জিত হবে। নদ-নদীতে লোনা পানির পরিমাণ বাড়বে, বাড়বে শরণার্থীর সংখ্যা। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবার ফলে গ্রীষ্মকালীন রোগ বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে হেপাটাইটিস বি, সংক্রামক সেরিব্রাল, মেনিনজাইটি রোগ বৃদ্ধি পাবে এবং একই সঙ্গে সূর্যের বিকিরণকৃত আলট্রাভায়োলেট রশ্মির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির কারণে চামড়ার ক্যান্সার ও চোখের ছানিপড়া রোগ বৃদ্ধি পাবে। এমনকি খাদ্যশস্যে তেজস্ক্রিয়তাও বেড়ে যেতে পারে।

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবার আরেকটি কারণ হচ্ছে, ব্যাপকভাবে গাছপালা কেটে ফেলা। অথচ এই গাছপালা আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পৃথিবীতে মোট বনের পরিমাণ ৪ কোটি ৩০ লাখ বর্গ কিলোমিটার। অথচ প্রতি মিনিটে বিশ্বে প্রায় একশ' একর বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ যাবৎ বিশ্বের প্রায় অর্ধেক রেইন ফরেস্ট উৎপাটিত হয়েছে। অথচ এই রেইন ফরেস্টে রয়েছে প্রায় ১৪ হাজার ৫শ জাতের ফুলগাছ, ২শ প্রজাতির স্তন্যপায়ী জন্তু, ৬শ প্রজাতির পাখি, ১৪০ প্রজাতির সাপ, ১শ প্রজাতির ব্যাঙ ও হাজার হাজার প্রজাতির পোকামাকড়ের বাস— যা এ পৃথিবীর পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশ্বে এখন এই রেইন ফরেস্টের পরিমাণ মাত্র শতকরা ৬ ভাগ, আগে যা ছিল ১৪ ভাগ। বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাবার কারণে বিশ্বে মরুকরণ প্রবণতা বাড়ছে। বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ ভূমি ও এক-ষষ্ঠাংশ জনগোষ্ঠী আজ এর প্রতিক্রিয়ার শিকার। ১৯৭৭ সালে মরুকরণের ফলে বিশ্বে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা ছিল ৫৭ মিলিয়ন। আর ১৯৮৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩৫ মিলিয়নে। এশিয়াতে মরুকরণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতির পরিমাণ বেশি। বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ এখানে ২০ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলার।

প্যারিস সমঝোতা

কিয়োটো প্রটোকলের ব্যর্থতার পর প্যারিসে একটি জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে, যা কিনা বিশ্বের উষ্ণতা হ্রাস করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য।

প্যারিসে গেল ডিসেম্বরে (২০১৫) বিশ্বের উষ্ণতা হ্রাস করার লক্ষ্যে সমঝোতা হয়েছিল, তার প্রায় চার মাস পর বিশ্বের ১৭১ দেশ জাতিসংঘের সদর দফতরে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করল। চুক্তিতে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে বিশ্ব। ৩৫টি দেশ এখনও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। সমঝোতা অনুযায়ী আগামি এপ্রিলের (২০১৭) মাসে তারা চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে। এই চুক্তিটি এখনই কার্যকর হবে না। প্রতিটি দেশের সংসদ তা অনুমোদন করবে এবং ২০২০ সালের পর এই চুক্তি একটি আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হবে। কিন্তু ইতোমধ্যে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। ১৭১টি দেশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও, বায়ুমণ্ডলে কার্বন নির্গমনের হার এক এক দেশের এক এক রকম। বিশ্বের দেশগুলো এখন বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে আছে। বিশ্বের উষ্ণতারোধ কল্পে এক এক গ্রুপের এক এক এজেন্ডা রয়েছে। উন্নত বিশ্ব কিংবা উন্নয়নশীল বিশ্বের যে দাবি, তার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আবার উন্নয়নশীল বিশ্বও এক-এক গ্রুপে বিভক্ত। ধনী দেশগুলো এনেক্স-১-এ অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের জিডিপির শতকরা ৭৫ ভাগ এই দেশগুলোর। অথচ লোকসংখ্যা মাত্র বিশ্বের ১৯ ভাগ। কিন্তু কার্বন নিঃসরণ করে সবচেয়ে বেশি, শতকরা ৫১ ভাগ। অন্যদিকে গ্রুপ ৭৭ এর দেশগুলো (মোট ১৩০টি দেশ) বিশ্বের জনসংখ্যার ৭৫ ভাগ, জিডিপির মাত্র ১৯ ভাগ। কিন্তু কার্বন উদগিরণ করে ৪২ ভাগ। আবার সাগর পাড়ের দেশগুলো, যারা বিশ্বের জনসংখ্যা, জিডিপি ও কার্বন নিঃসরণ করে মাত্র ১ ভাগ, তাদের দাবি ছিল ২০২০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বর্তমান অবস্থার চেয়ে শতকরা ৮৫ ভাগ কমিয়ে আনার। বনাঞ্চলভুক্ত দেশগুলো, যারা 'রেইন ফরেস্ট কোয়ালিশ হিসেবে পরিচিত, তারা, বিশ্ব জনগোষ্ঠীর ১৯ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে। জিডিপির মাত্র ৩ ভাগ তাদের। তারা মাত্র ৪ ভাগ কার্বন নিঃসরণ করে। যুক্তরাষ্ট্র একা কার্বন নিঃসরণ করে ২০ ভাগ, জিডিপির ৩০ ভাগ তাদের। অথচ জনসংখ্যা মাত্র বিশ্বের ৫ ভাগ। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো বিশ্বজিডিপির ২ ভাগ ও জনসংখ্যার ৮ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু কার্বন নিঃসরণ করে ১৫ ভাগ। চীনকে নিয়ে সমস্যা এখন অনেক। চীন একা কার্বন নিঃসরণ করে ২১ ভাগ। বিশ্বজনসংখ্যার ২০ ভাগই চীনা নাগরিক। জিডিপির ৬ ভাগ তাদের। প্রতিটি গ্রুপের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন। সবাই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কার্বন নিঃসরণের হার কমাতে চায়। জাতিসংঘ এটাকে বলছে কার্বন ঘনত্ব। অর্থাৎ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা মোট আয়ের (জিডিপি) অনুপাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড উদগিরণের হারকে কার্বন ঘনত্ব বা গ্রিন হাউজ গ্যাসের ঘনত্ব বলা হয়। উন্নয়নশীল বিশ্ব মনে করে এটা মাথাপিছু জনসংখ্যা ধরে করা উচিত। কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের হার কমানো উচিত, এটা মোটামুটিভাবে সবাই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কে কতটুকু কমাবে, সে প্রশ্নের কোনো সমাধান হয়নি। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র ও চীন (এবং সেই সাথে ভারতও) বিশ্বে সবচেয়ে বেশি দূষণ ছড়ায়, সে কারণে এই দুটো

দেশের কাছ থেকে 'কমিটমেন্ট' আশা করেছিল বিশ্ব। কিন্তু তা হয়নি। চীন প্রস্তাব করেছিল ২০০৫ সালের কার্বন ঘনত্বের চাইতে দেশটি ২০২০ সালে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ কমাবে। আর যুক্তরাষ্ট্রের দাবি ছিল তারা ১৭ ভাগ কমাবে। কিন্তু চীন ও ভারত যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। এখানে বলা ভালো, চীনের কার্বন ঘনত্ব ২.৮৫ টন, আর ভারতের ১.৮ টন। চীন ও ভারত দুটো দেশই বড় অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে এই শতাব্দীতেই। বিশ্বব্যাংকের উপদেষ্টা হরিন্দর কোহলীর মতে, আগামি ৩০ বছরে ভারত বিশ্বের অন্যতম বড় অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। মাথাপিছু আয় তখন ৯৪০ ডলার থেকে বেড়ে ২২ হাজার ডলারে উন্নীত হবে। ২০০৭ সালে বিশ্বঅর্থনীতিতে ভারত অবদান রাখত মাত্র ২ ভাগ, ৩০ বছর পর অবদান রাখবে ১৭ ভাগ। তবে এটা ধরে রাখতে হলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হতে হবে ৮ থেকে ৯ ভাগ। এ কারণেই ভারতকে নিয়ে ভয়, তাদের কার্বন ঘনত্ব বাড়বে। কেননা প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হলে শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে হবে। আর তাতে করে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বাড়বে। পাঠকদের এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, প্যারিসে একটি সমঝোতা হয়েছে বটে। কিন্তু চুক্তির কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় বিশ্বের উষ্ণতা রোধকল্পে এই চুক্তি কতটুকু কার্যকর হয়, তা নিয়ে একটা বড় ধরনের অনিশ্চয়তা থেকেই গেল।

এখন যে প্রশ্নটি বড়, অন্তত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, তা হচ্ছে এখন কার্বন নিঃসরণের কৌশলপত্র প্রতিটি দেশকে তৈরি করতে হবে এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এই কৌশলগত তৈরি করেছে। এখন এটি কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারবে, সেটাই বড় প্রশ্ন। ইতোমধ্যে সুন্দরবনের কাছাকাছি রামপালে একটি কয়লানির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। অথচ পরিবেশবাদীদের বড় আপত্তি রয়েছে এ ক্ষেত্রে। কেননা সবাই জানে কয়লা পোড়ালে দূষণ বাড়ে। অন্যদিকে ইটভাটাগুলোতে যে কয়লা পোড়ানো হয়, তাতেও বায়ুমণ্ডলে কার্বন নিঃসরণ হয়। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ইটভাটাগুলোতে কোনো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেনি। ফলে বাংলাদেশ ২০২০ সালের পর কার্বন নিঃসরণ কতটুকু কমাতে পারবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেল। আসলে কার্বন নিঃসরণের ব্যাপারে সরকারের যেমন উদাসীনতা রয়েছে, ঠিক তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যেও সচেতনতা তৈরি হয়নি। পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা ইতিবাচক নয়। তারা বিদেশ ভ্রমণ পছন্দ করেন। কিন্তু পরিবেশ আইনের বাধ্যবাধকতা কিংবা জনসচেতনতা সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাদের উদ্যোগ কম।

এখন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলো। বিশ্ব একটি চুক্তি পেল বটে। কিন্তু একটি চুক্তি বিশ্বের উষ্ণতা কমানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

বাংলাদেশে এর প্রতিক্রিয়া

বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাংলাদেশ নানা ধরনের পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন হবে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরোতে বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পানির উচ্চতা বাড়লে পৃথিবীর যেসব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার মধ্যে বাংলাদেশকে অধিকতর ঝুঁকিসম্পন্ন দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে এর প্রভাব কি হবে, তা নিচের একটি সারণি থেকে বোঝা

যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের উডহোল ওসানোগ্রাফিক ইনস্টিটিউটের গবেষক জন. ডি. মিলিম্যানের গবেষণা থেকে এই সারণিটি তৈরি করা হয়েছে।

সারণি : ৩৩

সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে এর প্রভাব

সাল	বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি	ভূমিতলের অধঃগমন	স্থানীয় সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি	ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ	ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা
বাংলাদেশ ২০৫০ সাল (ক) ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা	৭৯ সে.মি.	৬৫ সে.মি.	১৪৪ সে.মি.	১৬ ভাগ	১৩ ভাগ
(খ) বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা	৭৯ সে.মি.	১৩০ সে.মি.	২০৯ সে.মি.	১৮ ভাগ	১৫ ভাগ
বাংলাদেশে ২১০০ সাল : (ক) ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা	২১৭ সে.মি.	১১৫ সে.মি.	৩৩২ সে.মি.	২৬ ভাগ	২৭ ভাগ
(গ) বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা	২১৭ সে.মি.	২০০ সে.মি.	৪৪৭ সে.মি.	৩৪ ভাগ	৩৫ ভাগ

উৎস : World Watch Paper, 86, November 1992, P. 34

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, ২০৫০ সালে বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের পানি যখন গ্রিন হাউজ প্রভাবে ৭৯ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে, বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে পানি তখন বাড়বে ১৪৪ থেকে ২০৯ সেন্টিমিটার। এতে ১৬ থেকে ১৮ ভাগ জমি তলিয়ে যাবে এবং ১৩-১৫ ভাগ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অপরদিকে, ২১০০ সালে গ্রিন হাউস প্রভাবে বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের পানি যখন ২১৭ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে, বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের পানি তখন ৩৩২ থেকে ৪৪৭ সেন্টিমিটার বেড়ে যাবে। শতকরা ২৬ থেকে ৩৪ ভাগ লোকের বসতবাড়ি জলমগ্ন হবে এবং ২৭ থেকে ৩৫ ভাগ লোক বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অপর একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ফসিহউদ্দিন মাহতাব। তাঁর মতে, বাংলাদেশে সমুদ্রতল বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিমাণ ৩০ সেন্টেমিটার থেকে ১.৫ মিটার হতে পারে। তাঁর গবেষণা অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরে পানির উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৩.৭৪% আবাদি জমি, ২৮.২৯ শতাংশ বনভূমি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাতে করে প্রায় ১ কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে।

এ ছাড়াও তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টির মওসুম পাল্টে যাবে। সুন্দরবনের ১০টি প্রজাতির গাছের মধ্যে সুন্দরী ও গেওয়া গাছ বিনষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমানে প্রায় ১৪ লক্ষ হেক্টর জমি লবণাক্ত পানির জোয়ার-ভাটায় বছরের বেশি সময় বা সর্বক্ষণ ডুবে থাকে। আগামিতে লবণাক্ত জমির পরিমাণ আরো বাড়বে। শস্য উৎপণ্যের ক্ষেত্রেও দেখা দেবে অনিশ্চয়তা। শস্যের স্বাভাবিক ফলন কমে যাবে। পরিবর্তন আসবে ইকোসিসটেমেও।

সারণি : ৩৪

পরিবেশ সম্পর্কিত সম্মেলনসমূহ

১৯৪৬	আন্তর্জাতিক তিমি শিকার সম্মেলনে ৫০টি দল অংশ নেয়। তিমি শিকার নিষিদ্ধ করা হয়। বাণিজ্যিকভাবে সকল তিমি শিকার বন্ধ করা হয় ১৯৮২ সালে।
১৯৫৯	অ্যান্টার্টিকা চুক্তি, ৪২টি দল অংশ নেয়। অ্যান্টার্টিকাতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সীমিত করা হয়। ১৯৯১ সালে খনিজ এবং এর উন্নয়নে খসড়া চুক্তি বাতিল করা হয় ৫০ বছরের জন্য।
১৯৭২	লন্ডন ডাম্পিং সম্মেলন, ৭৫টি দল অংশ নেয়। মূলত সাগরে উচ্চমাত্রার পারমাণবিক বর্জ্য ফেলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি নিম্নপর্যায়ের পারমাণবিক বর্জ্য এবং অন্যান্য শিল্পের বর্জ্য আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
১৯৭৩	আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন প্রকার বিলুপ্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের বাণিজ্য সংক্রান্ত ওয়াশিংটন সম্মেলন। ১২৮টি দল অংশ নেয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চুক্তিতে হাতির দাঁতের ব্যবসাকে নিষিদ্ধ করা হয়।
১৯৭৩	জাহাজের দূষণ থেকে প্রতিরোধ সংক্রান্ত সম্মেলন, ৯৫টি দল অংশ নেয়। জাহাজ থেকে পরিকল্পিতভাবে তেল, আবর্জনা নিক্ষেপ সীমিত করা হয়। নির্দিষ্টভাবে সাগরের তীরে তরল পদার্থ নিক্ষেপ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা হয়।
১৯৮২	সমুদ্র আইন সংক্রান্ত সম্মেলন, ৭৫টি দল অংশ নেয়। চুক্তিতে সাগরের ভেতরে ২০০ মাইল অর্থনৈতিক জোন, সাগরকে দূষণ থেকে রক্ষা করা ও সাগরে বসবাসরত সকল জীবিত প্রাণীকুলের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা হয়।
১৯৮৭	ওজোন (Ozone) স্তর সংক্রান্ত মন্ট্রিল প্রটোকল। ১৪৯টি দল অংশ নেয়। ১৯৯৬ সালের মধ্যে CFC গ্যাসের ব্যবহার হ্রাস করার সিদ্ধান্ত হয়। একই সাথে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী প্রতিটি কেমিক্যালের উৎপাদন হ্রাস করারও সিদ্ধান্ত হয়।
১৯৮৯	ব্যাসেল সম্মেলন, ৮৮টি দল অংশ নেয়। বিষাক্ত বর্জ্য পরিবহন সীমিত করা হয় এবং ১৯৯৩ সালে সকল ধরনের বিষাক্ত বর্জ্য শিল্পোন্নত নয় এমন সব দেশে রফতানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
১৯৯২	আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত সম্মেলন, ১৩৬টি দল অংশ নেয়। ২০০০ সালের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসারণের মাত্রা ১৯৯০ সালের পর্যায়ে হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৯৯২	জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত সম্মেলন, ১১৮টি দল অংশ নেয়। জেনেটিক সম্পদের সংরক্ষণ ও অংশদারত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৯৯৪	মরুকরণ সংক্রান্ত সম্মেলন, ১০৭টি দল অংশ নেয়। মাটি ও পানি সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত হয়।

সুতরাং যে-কোনো বিবেচনায় কিয়োটো প্রটোকলের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিয়োটো চুক্তির গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট। বুশ প্রশাসন বড় বড় গ্যাস ও তেল কোম্পানিগুলোর স্বার্থে কিয়োটো চুক্তি প্রত্যাখ্যান করায় স্বাভাবিক কারণেই বিশ্বে উষ্ণতা রোধকল্পে যে সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়েছিল, তাতে এখন অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। বুশ প্রশাসনের সিদ্ধান্তের ফলে এটা এখন প্রমাণিত হয়ে গেল যে, উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থ ধনী তথা উন্নত বিশ্বের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে না। পরিবেশ রক্ষা ও একটি

ভারসাম্যমূলক পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলোর পরস্পরবিরোধী অবস্থানের কারণে দক্ষিণের গরিব দেশগুলোতে হতাশা আসতে বাধ্য। উন্নত বিশ্বের ওপর আজ অনেক কিছু নির্ভর করে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও উন্নত বিশ্ব যদি আজ এগিয়ে না আসে, তা হলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করা যাবে না। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো জাতিসংঘে একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করতে পারে। বিশ্বফোরামে বুশ প্রশাসনের এই ভূমিকা যদি সমালোচিত না হয় এবং বিশ্বের সর্বত্র এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে না ওঠে, তা হলে আগামিতে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর জন্যে এক কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। তবে আশার কথা অস্ট্রেলিয়ার নব নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তার দেশ কিয়োটো চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে।

কিয়োটা সম্মেলনের আগে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন ও ১৯৯৭ সালের জুন মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব ধরিত্রী (বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন +৫) সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথম বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনে বিশ্বের ১৭০টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা যোগ দিয়েছিলেন। বলা প্রয়োজন, ১৯৭২ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে মানবিক পরিবেশ সংরক্ষণ সম্মেলনের ২০ বছর পর রিও ডি জেনিরোতে ১৯৯২ সালে প্রথম বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনে (১৯৯৭) উন্নয়ন সাহায্যের ব্যাপারে উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা, বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বনভূমি রক্ষার মতো জরুরি পরিবেশগত বিষয়ে কোনো ঐকমত্য না হওয়ায় সম্মেলনটি ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছিল। তবে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো এই মর্মে একমত হয়েছিল যে, বিশ্বের সমুদ্র, বনভূমি, আবহাওয়ামণ্ডলের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। সম্মেলনে উন্নত দেশগুলো ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী গ্রুপ-৭৭'র দেশগুলো ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। উন্নয়নশীল বিশ্বের পরিবেশ উন্নয়নে উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুত সাহায্য (জিএনপির শূন্য দশমিক ৭ ভাগ) রক্ষিত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সম্মেলন জরুরি উদ্যোগের আহ্বান জানিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা হিসেবে ১০০ কোটি মার্কিন ডলার দান ও যুক্তরাস্ট্রে ১০ লাখ বাড়ি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে সৌর ইউনিট বসানোর উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছিল।

পরিবেশ সংক্রান্ত নিউইয়র্কের শীর্ষ সম্মেলনেরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কেননা রিও সম্মেলনে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তা নিউইয়র্ক সম্মেলনে পর্যালোচনা করা হয়েছিল। রিও সম্মেলনে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তার একটি হচ্ছে আবহাওয়া পরিবর্তন কনভেনশন বা Framework Convention on Climate Change এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে জীব বৈচিত্র্য কনভেনশন বা Biological Diversity Convention। বাংলাদেশ উভয় চুক্তিতেই স্বাক্ষর করেছে এবং ১৯৯৪ সালে তা আবার অনুমোদিতও হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর করাই যথেষ্ট ছিল না, এর অনুমোদনেরও প্রয়োজন ছিল। কেননা ওই চুক্তিটি কার্যকর ও একটি আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত করতে হলে ন্যূনতম কয়েকটি দেশের আবার অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। আবহাওয়া পরিবর্তনের

জন্য প্রয়োজন ছিল ৫০টি দেশের অনুমোদনের, আর জীব বৈচিত্র্য কনভেনশনের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩০টি দেশের অনুমোদনের।

আবহাওয়া পরিবর্তন কনভেনশনের প্রধান দিকগুলো হলো- (১) বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ এমন একটি স্তরে স্থির রাখা, যার ফলে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া এড়ানো সম্ভব হয়। এর ফলে টেকসই উন্নয়নও নিশ্চিত হবে, (২) গ্রিন হাউজ গ্যাসের উদ্‌গিরণ ১৯৯০ সালের মাত্রায় স্থির রাখতে হবে, (৩) উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পরিবেশের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য কারিগরি জ্ঞান সরবরাহ করবে। অন্যদিকে, জীববৈচিত্র্য কনভেনশন চুক্তিতে রয়েছে– (১) জীব প্রজাতির আবাস এবং ইকো সিসটেমের বিনাশ কমাবার জন্য প্রত্যেক দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় কার্যকর ব্যবস্থা রাখা, (২) অগ্রাধিকার ও বিশেষ সুবিধার ভিত্তিতে কারিগরি জ্ঞান হস্তান্তর করা, যা Intellectual Property Right'কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, (৩) প্রত্যেক দেশ তার নিজের ভৌগোলিক এলাকায় বেশ কিছু সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টি করবে, (৪) বন্যপ্রাণী ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনায় প্রাধান্য পাবে গ্রামীণ ও আদিবাসীরা, যারা তাদের সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ করে শত শত বছর ধরে এ সকল মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করে আসছে। এ দুটো কনভেনশন ছাড়াও রিও সম্মেলনে এজেন্ডা-২১ গৃহীত হয়েছিল, যা ছিল আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এজেন্ডা ২১- গরিব দেশগুলোকে দারিদ্রতা বিমোচনে সহায়তার জন্য ১২৫ বিলিয়ন ডলার দেয়ার কথা বলা হয়েছিল।

দুঃখজনক হচ্ছে, পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে উন্নত বিশ্বের কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। ফলে বিংশ শতাব্দীতে পরিবেশ বিপর্যয় বেড়েছিল। একুশ শতকে এসে পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে জনসচেতনতা বেড়েছে। বিশ্বের উষ্ণতা আরো বেড়েছে। পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে উন্নত বিশ্ব যদি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে হয়তো আগামি কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই বিশ্ব বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এই আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছেন। একুশ শতকে পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টি হবে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের অন্যতম ভাবনা। তবে পরিবেশ দূষণ রোধ করা কতটুকু সম্ভব হবে, কিংবা আদৌ সম্ভব হবে কিনা, সেটাই বড় প্রশ্ন এখন।

সহায়ক গ্রন্থ

১. Nazli Choucri, ed. 'Global Accord Environmental Challenges and International Responses'. Cambridge. 1993.

২. Julie Fisher, 'The Road from Rio Sustainable Development and the Non governmental Movement in the Third World'. Westport. 1993.

৩. Al Gore. 'Earth in the Balance : Ecology and the Human Spirit' New York. 1992.

উনবিংশ অধ্যায়

সভ্যতার সংকট ও নয়া বিশ্বব্যবস্থার স্বরূপ

It is the spirit of cooperativeness, not confrontation, that makes the World go round.

John Keegan
(A History of Warfare)

Everything that is done in international affairs must be done from the viewpoint of whether it will advance or hinder the establishment of world government.

Albert Einstein, 1946

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক একটি ধারণা বিশ্বব্যাপী বড় ধরনের একটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। হার্ভাডের শিক্ষক প্রফেসর হানটিংটন যে ধারণাটি উপস্থাপন করেছিলেন, তাতে তিনি বলতে চেয়েছিলেন মুসলমানদের সাথে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের দ্বন্দ্বই একুশ শতকে প্রাধান্য পাবে। তার এই বক্তব্য মুসলিম বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং অনেক বিশেষজ্ঞই এর বিরুদ্ধে মতামত দেন। প্রথম যে প্রবন্ধটি হানটিংটন লেখেন তাতে তিনি স্পষ্ট করে মুসলমানদের সাথে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ না করলেও ২০০১ সালে যে প্রবন্ধটি লেখেন, তাতে তিনি স্পষ্ট করে ওই দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক স্যামুয়েল পি. হানটিংটন ১৯৯৩ সালে প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর তার লিখিত সেই প্রবন্ধটি (The Clash of Civilizations? The Next Pattern of Conflict) ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। হানটিংটন মন্তব্য করেছিলেন, কোনো আদর্শিক দ্বন্দ্ব বা অর্থনীতি আগামি দিনে নতুন করে সঙ্কটের জন্ম দেবে না। বরং সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব এই সংকটের জন্ম দেবে। তবে সংস্কৃতি বলতে হানটিংটন বিভিন্ন সভ্যতা ও একে অপরের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কথাই বলতে চেয়েছেন। হানটিংটনের ভাষায়, "...the fundamental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural"। হানটিংটন আরো লিখেছেন, "Nation States will remain the most powerful actors in world affairs, but the principal conflicts of global politics

will occur between nations and groups of different civilizations. The clash of civilizations will dominate global politics"। হানটিংটন তার বিখ্যাত প্রবন্ধে ৮টি সভ্যতার কথা বলেছিলেন, যাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বেই একুশ শতকের বিশ্বরাজনীতি নির্ধারিত হবে। যেসব সভ্যতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমা সভ্যতা, কনফুসিয়াস, জাপানিজ, ইসলাম, হিন্দু, স্লাভিক-অর্থোডক্স, ল্যাতিন আমেরিকান এবং আফ্রিকান সভ্যতা (বিস্তারিত দেখুন হানটিংটনের প্রবন্ধ, Foreign Affairs, Summer, 1993, Vol. 72, Issue 3, P. 22-28)। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আরনল্ড টয়োনবি একসময় বিশ্বে বিরাজমান ২১টি সভ্যতাকে চিহ্নিত করেছিলেন। আজ তার অধিকাংশই বিলীন হয়ে গেছে। অধ্যাপক হানটিংটন মনে করেন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নৈকট্যের কারণে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোকে উপরে উল্লিখিত ৮টি সভ্যতার ছত্রছায়ায় একত্র করবে এবং এদের মধ্যকার দ্বন্দ্বই বিশ্বরাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তবে সভ্যতার এই দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হানটিংটন অর্থনৈতিক জোট ও আঞ্চলিক শক্তিকে একেবারে অস্বীকার করেননি। তিনি মন্তব্য করেছেন, "...economic regionalism may succeed only when it is rooted in a common civilization"। অর্থাৎ অর্থনৈতিক জোটগুলো সাফল্য লাভ করবে, যদি সাংস্কৃতিক বন্ধনটা অটুট থাকে।

হানটিংটনের ওই প্রবন্ধটি নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিতর্ক হয়েছে। ২০০১ সালের ডিসেম্বরে যে প্রবন্ধটি তিনি Newsweek সাময়িকীতে লেখেন, তা ছিল স্পষ্ট। প্রবন্ধটির নাম The Age of Muslim Wars (Newsweek, Vol. 138, No. 25. December 17, 2001, PP. 9-14)। ওই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, সমসাময়িক বিশ্বের রাজনীতি হচ্ছে মুসলিম যুদ্ধকে ঘিরে। মুসলমানরা যেমন একে অন্যের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে, তেমনি বিশ্বসভ্যতায় অমুসলমানদের বিরুদ্ধেও তারা যুদ্ধ করেছে। এই যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে সন্ত্রাসবাদের যুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ, সিভিল ওয়ার এবং আন্তরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব। এই ধরনের মুসলিম দ্বন্দ্বগুলো বৃহৎ সংঘাতের রূপ নিয়ে ইসলাম বনাম পশ্চিম--এই দুয়ের মধ্যে সভ্যতার সংঘাত হিসেবে পরিণত হতে পারে। হানটিংটন মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধকে 'মুসলিম যুদ্ধ' (Muslim Wars) হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। বিশ্বরাজনীতির বিকাশে তার তত্ত্বটি একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়; একসময় ছিল যখন আদর্শিক দ্বন্দ্বটাই ছিল প্রবল। এই আদর্শিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বিশ্ব আবর্তিত হয়েছে। এখন সেই আদর্শিক দ্বন্দ্বের কোনো উপস্থিতি নেই বিশ্বরাজনীতিতে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বে যে কটি বড় সংকটের জন্ম হয়েছে, সেখানে সাংস্কৃতিক তথা ধর্মীয় বিরোধই প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন বলা যেতে পারে, বসনিয়া সংকটের কথা। কিংবা চেচনিয়া ও কসোভো সংকটের কথা। এসব জায়গায় সংকটটা ছিল কোথায়? বসনিয়ায় দ্বন্দ্ব ছিল মুসলমানদের সাথে সার্বদের। ১৯৯২ সালের মার্চে বসনিয়া-হারজেগোভিনায় (সাবেক যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রের একটি স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক) স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে স্বাধীনতার পক্ষে রায় পড়ে। এপ্রিলে ('৯২) দেশটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু সার্বরা, যারা ধর্মীয়ভাবে অর্থোডক্স খ্রিস্টান ও স্লাভিক বংশোদ্ভূত, তারা এই স্বাধীনতা মানল না। বসনিয়ার জনসংখ্যার মাত্র ৩১ ভাগ ছিল সার্ব। এই সার্বরা ৪৩ ভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বিরুদ্ধে জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান শুরু করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ প্রত্যক্ষ করল বড় ধরনের সংকটের মুসলমানরা হাজারে

হাজারে, লাখে লাখে তাদের আবাসভূমি থেকে উৎখাত হলেন। মুসলমান মেয়েরা গণধর্ষণের শিকার হলেন। দেশ ত্যাগে বাধ্য হলো মানুষ। সারা বসনিয়া পরিণত হলো বধ্যভূমিতে। এই সংকটে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নৈকট্যের কারণে রাশিয়া সমর্থন করল সার্বদের। জাতিসংঘে রাশিয়া সার্বদের ভূমিকাকে সমর্থন করল। সেদিন বসনিয়ার মুসলমানদের সমর্থন করার কেউ ছিল না। ডেটন চুক্তির (নভেম্বর, ১৯৯৫) মধ্য দিয়ে বসনিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু দেশটি কার্যত দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। একভাগে রয়েছে মুসলমান-ক্রোট ফেডারেশন, আর অপরভাগে রয়েছে সার্বদের নিয়ে গঠিত রিপাবলিক স্প্রসকা। রাষ্ট্রের শতকরা ৪৯ ভাগ থাকছে রিপাবলিক স্প্রসকার নিয়ন্ত্রণে। এখানে ধর্মীয় আনুগত্যের বিবেচনায় রাষ্ট্রকে অলিখিতভাবে ভাগ করে দেয়া হলো। সভ্যতার সংকটটা শুরু হলো এখান থেকেই। কসভোর পরিস্থিতিও এ থেকে পৃথক ছিল না। কসভো ছিল সাবেক যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের একটি। জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭৭ জন হচ্ছেন আলবেনীয় মুসলমান, সার্ব শতকরা মাত্র ১৫ জন। বসনিয়া সংকট শেষ হতে না হতেই ১৯৯৮ সালের প্রথমদিকে সার্বরা সার্বীয় (যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রের একটি রিপাবলিক) নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতায় এখানে গণহত্যা চালায়। গণহত্যার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলে জাতিসংঘকে এখানে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এমনকি ন্যাটোর বিমানবাহিনীকে সার্বীয় অবস্থানের উপর বোমাবর্ষণ পর্যন্ত করতে হয়েছে। আপাতত যুদ্ধ সেখানে থেমে গেছে সত্য কিন্তু কসভো সমস্যার সমাধান ২০০৮ সালে এসেও হয়নি। একজন 'প্রধানমন্ত্রী' কসভোতে আছে সত্য, কিন্তু পুরো শাসনভার ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণাধীনে। স্বাধীন একটি মুসলমান দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে রাশিয়ার। হয়তো এমনও হতে পারে ধর্মীয় নৈক্যটের কারণে কসভো ও আলবেনিয়ার সমন্বয়ে আগামিতে একটি গ্রেটার আলবেনিয়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে এ অঞ্চলে। চেচনিয়ার ঘটনাবলির সাথেও বাসনিয়ার ঘটনাবলির কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চেচনিয়া হচ্ছে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাশিয়ার ২১টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের একটি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার আগেই ১৯৯১ সালে চেচনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। এখানে দ্বন্দ্বটা ছিল মুসলমানদের সাথে অর্থোডক্স খ্রিস্টানের। এই দ্বন্দ্বের রেশ ধরে চেচনিয়ায় রাশিয়ার স্বার্থ বজায় রাখতে সাবেক রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন সেখানে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। আর আজ পুতিনের অবস্থানও এ থেকে পৃথক নয়। বাহ্যত রাশিয়া চেচনিয়া দখল করে নিয়েছে।

আজ আফগানিস্তানে যা ঘটল, তা কী বসনিয়া, কসোভো কিংবা চেচনিয়ার ঘটনাবলি থেকে পৃথক করা যাবে? সভ্যতার যে দ্বন্দ্বের কথা হানটিংটন উল্লেখ করেছেন, তা কী আফগানিস্তানে প্রতিফলিত হয়নি? মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ আফগানিস্তানে ২০০১ সালে ইঙ্গ-মার্কিন বোমাহামলা চালানো হলো। কারণ সন্ত্রাসী হিসেবে অভিহিত ওসামা বিন লাদেনকে গ্রেফতার ও সেইসাথে লাদেনকে আশ্রয়দাতা মোল্লাহ ওমর তথা তালেবানদের কাবুলের ক্ষমতা থেকে উৎখাত। লাদেন অভিযুক্ত হয়েছেন ১১ অক্টোবর (২০০১) নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার ভবনে আত্মঘাতী বোমাহামলার জন্য। সন্দেহ নেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ এই মুহূর্তে বিশ্বব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ। সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে লাদেন ও তার সংগঠন আল কায়দা জড়িত থাকলেও একজন ব্যক্তির জন্য একটি দেশে সামরিক আগ্রাসন চালানো কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? এখানে কী পরোক্ষভাবে মুসলমানদের

সাথে খ্রিস্টানদের দ্বন্দ্বের কথা প্রকাশ পায় না? আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের পেছনে কাসপিয়ান সাগরের তেল/গ্যাস আহরণের ও বাজারজাতকরণের ভূমিকা যাই থাকুক না কেন, নিরীহ আফগান জনগোষ্ঠীর উপর নির্বিচার বোমাবর্ষণ কখনও কাম্য হতে পারে না। সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। এবং এর সাথে যদি ওসামা বিন লাদেন জড়িত থাকেন, তাহলে অবশ্যই তার বিচার হওয়া উচিত। এজন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয় রয়েছে। জাতিসংঘ রয়েছে। জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের বাইরে এককভাবে বুশের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে ইঙ্গ-মার্কিন বিমানহামলা চালানো হলো। সূক্ষ্মভাবে দেখলে দেখা যাবে এখানে পশ্চিমা সভ্যতার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপ) স্বার্থের সাথে অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের (রাশিয়া) স্বার্থ এক হয়েছে। এই যৌথ স্বার্থ এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে। এই দুয়ের দ্বন্দ্বে সাময়িকভাবে পশ্চিমা সভ্যতা বিজয়ী হয়েছে সত্য, কিন্তু আফগান যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সূচনা হলো মাত্র। আর দুই সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব এখন প্রলম্বিত হবে। ধারণা করছি, এই দ্বন্দ্বে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান প্রধান দেশগুলোও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়বে আগামি দিনগুলোতে। একুশ শতকের শুরুতে যে দ্বন্দ্ব আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, আগামিতে তা বিস্তৃত হতে পারে কনফুসিয়াস (চীন, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি) বনাম জাপানিজ (জাপান) দের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। আর এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠতে পারে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা। এই নয়া বিশ্বব্যবস্থার স্বরূপ কী হবে, তা এই মুহূর্তে বলা না গেলেও, এটা বলা যায় সেখানে পশ্চিমা সভ্যতার একটা প্রভাব থাকবে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম একটি নির্ধারকরূপে আবির্ভূত হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক কী হবে, কিংবা যুক্তরাষ্ট্র-চীন-জাপান সম্পর্ক কোন পর্যায়ে উন্নীত হবে, তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন। স্পষ্টতই বাজার নিয়ে বিতর্ক বাড়বে। সৃষ্টি হবে সঙ্কটের। বিশ্বের সর্বত্র বিশ্বায়ন বিরোধী যে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এটা তার বড় প্রমাণ। বাজার নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে যদি যুক্তরাষ্ট্র-চীন কিংবা যুক্তরাষ্ট্র-জাপান কোনো বড় ধরনের সংকটে জড়িয়ে যায়– তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। হানটিংটন এই দ্বন্দ্বকেই সভ্যতার দ্বন্দ্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে আমরা মূলত তিনটি বড় ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের উত্থান। প্রতিটি ঘটনায় বিশ্বব্যবস্থা প্রভাবিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই, আর শেষ হয়েছিল ১৯১৮ সালের ১ নভেম্বর। জার্মানি ও ইতালিতে উগ্রজাতীয়তাবাদী রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ জুন (১৯১৪) বসনিয়া-হারজেগোভিনার রাজধানী সারায়েভোতে নিহত হন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কিডিউক ফার্ডিল্যান্ড। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই যুদ্ধের সূচনা হয়। যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান পরিস্থিতিকে বদলে দেয়। জার্মানির সম্রাট কাইজার হল্যান্ডে পালিয়ে যান এবং ১১ নভেম্বর (১৯১৮) জার্মানি যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিশ্বরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বাড়তে থাকে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের রাজনীতির ব্যাপারে কোনো নাক গলায়নি। ইউরোপের রাজনীতির ব্যাপারে তাদের এই নির্লিপ্ত থাকাকে বৈদেশিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা Isolationism বা নিঃসঙ্গবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৮৯-১৭৯৭) ও তৃতীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন (১৮০১-১৮০৯) এই নিঃসঙ্গবাদের

জন্মদাতা হলেও, ৫ম প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো (১৮১৭-১৮২৫) ও ৬ষ্ঠ প্রেসিডেন্ট কুইন্সি এডামস (১৮২৫-১৮২৯) নিঃসঙ্গবাদের বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে হস্তক্ষেপ না করার এই যে নীতি (এবং অন্য কোনো শক্তি যুক্তরাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করবে না), এই নীতি 'মনরো ডকট্রিন' নামে পরিচিত। এই 'মনরো ডকট্রিনের' কারণেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলেও যুক্তরাষ্ট্র বৃহৎশক্তি হিসেবে শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু ২৮তম প্রেসিডেন্ট উডরো উইলসন (১৯১৩-১৯২১) 'মনরো ডকট্রিন' পরিত্যাগ করে মিত্রশক্তি জোটে যোগ দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের এই ভূমিকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে Active Neutrality বা সক্রিয় নিরপেক্ষতা হিসেবে। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাববলয় বিস্তার লাভ করে। এই প্রভাববলয় আরো শক্তিশালী হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। একটি সামরিক জোট গঠনের (ন্যাটো) মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে তার অবস্থান শক্তিশালী করেছিল। ওই সময় কার্যত বিশ্ব দুভাগে (পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক) বিভক্ত হয়ে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা করেছিল। সেই 'যুদ্ধের' অবসান ঘটেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আদর্শিক যে দ্বন্দ্ব ছিল (একদিকে গণতন্ত্র অন্যদিকে সমাজতন্ত্র), সেই দ্বন্দ্ব এখন আর নেই। এখন নতুন আঙ্গিকে বিশ্বরাজনীতি বিকশিত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এখানে জাতীয়তাবাদ একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। রাশিয়ায় পুতিনের উত্থান, কিংবা ভারতে হিন্দুত্ববাদের পেছনে এই জাতীয়তাবাদী রাজনীতি কাজ করছে। হানটিংটন এই জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে দেখেছেন ভিন্ন আঙ্গিকে। তিনি এটাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যে ৭/৮টি সভ্যতার উত্থানের কথা বলেছেন, তা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ভারতে প্রথমবারের মতো হিন্দুত্ববাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যারা গ্রেটার ভারতের স্বপ্ন দেখছে। এই হিন্দুত্ববাদের কাছে কংগ্রেসী মডারেটরা কিংবা বামরা আজ পরাজিত। ইরানে ইসলামি বিপ্লব (১৯৭৯) ইসলামি বিশ্বে গণজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। এর রেশ ধরে আফগানিস্তানে তালেবানী বিপ্লব (১৯৯৬) এই গণজাগরণের একটি নতুন মাত্রা এনে দেয়। পরবর্তীকালে যোগ হয় ওসামা বিন লাদেনের কর্মকাণ্ড, যা বিশ্বব্যাপী নিন্দিত হলেও, এটা অস্বীকার করা যাবে না যে বাংলাদেশ থেকে চেচনিয়া পর্যন্ত সর্বত্র লাদেনের একটি সমর্থক শ্রেণী তৈরি হয়েছে। আফগানিস্তানে মার্কিনী ভূমিকা ইসলামি কট্টরপন্থীদের আরো শক্তিশালী করেছে। সবচেয়ে বড় ভয় পাকিস্তানকে নিয়ে। সেই সাথে তুরস্ক, আজারবাইজান, কাজাকিস্তান, কির্ঘিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজাকিস্তান ও উজবেকিস্তানের আগামিদিনের ঘটনাবলিও লক্ষ্য করার মতো। এসব দেশে মডারেটরা ক্ষমতায় রয়েছেন বটে, কিন্তু ইসলামি কট্টরপন্থীরা এসব দেশে শক্তিশালী হচ্ছে। বর্তমান শতাব্দীতেও বিশ্ব জুড়ে ইসলামি কট্টরপন্থীরা সর্বত্র আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। সেই সাথে ইউরোপ জুড়ে সর্বত্র স্লাভিক জাতিভুক্ত অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা জোটবদ্ধ হয়ে চলমান রাজনীতির প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে।

স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর নয়া বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে প্রথম দিকে তেমন ধারণা পাওয়া যায়নি। কিন্তু একুশ শতকে এসে নয়া বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া গেল। স্পষ্টতই এই বিশ্বব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে অন্যতম একটি শক্তি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব করার প্রবণতা বিশ্বব্যবস্থায় বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। কাঁচামালের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। বাষট্টি বছর পর বাজার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ও সেই সাথে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার স্বার্থে (কাস্পিয়ান অঞ্চলের

তেল/গ্যাস) বিশ্ব আর একটি সংকট প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছে। একুশ শতকের শুরুতে আফগানিস্তানের যুদ্ধ নিয়ে যে সংকটের শুরু, তা বিশ্বকে কোথায় নিয়ে যায় সেটাই দেখার বিষয় এখন।

তবে স্পষ্টতই সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন ও রাষ্ট্রটি বিলুপ্ত হয়ে যাবার পর বিশ্বরাজনীতিতে সংকট বাড়ছে। এই সংকটকে সভ্যতার সংকট হিসেবে চিহ্নিত করা না গেলেও, এটা স্পষ্ট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা আজ আক্রান্ত হচ্ছেন। আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, সোমালিয়া সর্বত্রই আজ মুসলমানরা আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু। মুসলমানরাই আজ টার্গেট হচ্ছেন। এর কারণ অনুসন্ধান করেছেন হানটিংটন নিজেও। তার মতে প্রথমত, মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে, বিশেষত আরবদের মধ্যে পশ্চিমাদের প্রতি এক ধরনের ক্রোধ, বিতৃষ্ণা ও শত্রুতার মনোভাবের জন্ম হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে পশ্চিমা নীতি। এই পশ্চিমা নীতিই তাদেরকে পশ্চিমা বিদ্বেষী করে তুলেছে। দ্বিতীয়ত, ট্রাইবাল, ধর্মীয়, এথনিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিভাজন থাকার ফলে মুসলমান বিশ্বে একে অন্যের বিরুদ্ধে সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে। এসব বিষয় মুসলমান ও অমুসলমানদের সহিংসতার প্রভাবক হিসেবেও কাজ করে। তৃতীয়ত, বিভিন্নস্থানের অধিকাংশ মুসলমানসমাজে ইসলামিক অভ্যুত্থানের সাথে যুক্ত হয়েছে উচ্চজন্মহার, যার পরিণতি দাঁড়ায় এক ধরনের "যুব বিস্ফোরণ"। এরা বেকার থাকে। ফলে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এদেরকে খুব সহজেই রিক্রুট করে। চতুর্থত, রাজতন্ত্র কিংবা সুলতান শাসিত প্রায় প্রতিটি ইসলামিক দেশে ইসলামপন্থীরাই প্রধান বিরোধীদল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ইসলামিক এই অভ্যুত্থান সেখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্ম দিয়েছে, যা অমুসলিম বিশ্বেও ছড়িয়ে গেছে। হানটিংটনের এই মূল্যায়নের ব্যাপারে কারো কারো দ্বিমত থাকতে পারে। তবে এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে (বিশেষ করে ফিলিস্তিনিদের সমস্যা) পশ্চিমা বিশ্বের এক ধরনের উদাসীনতা এই অঞ্চলের জনগণকে যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমাবিশ্বের উপর খেপিয়ে তুলেছিল। যার পরিণতি ছিল ৯/১১-এর ঘটনা। আর ৯/১১-এর ঘটনা পুরো দৃশ্যপটকে বদলে দিয়েছে। একুশ শতকে এটাই হবে একটি প্রধান সমস্যা। এই দ্বন্দ্বকে সভ্যতার সংকট না বলে অন্য যেকোনোভাবে হলেও চিহ্নিত করা যায়।

নয়া বিশ্বব্যবস্থার স্বরূপ

দ্বি-মেরুভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে যাবার ফলে, এখন কোন ধরনের বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠছে এ ব্যাপারে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে বিশ্বরাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং দ্বিতীয় কোনো বৃহৎশক্তি না থাকায়, বিশ্বরাজনীতিকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী পরিচালনা করবে। সাময়িকভাবে হয়তো এর পেছনে সভ্যতা আছে। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন আর এককভাবে বিশ্বরাজনীতির নিয়ন্ত্রক নয়। বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করছে সত্য, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ইউ এবং জাপানের ভূমিকাও বাড়ছে। ১৯৯৪ সাল থেকে ইউরোপে অভিন্ন ইউরোপের ধারণা কার্যকর হতে শুরু করেছে। ম্যাসট্রিচট চুক্তির ফলে ১৯৯৭ সালে ইউরোপ রাজনৈতিকভাবে এক হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে একক ইউরোপীয় মুদ্রা চালু হয়েছে। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থনৈতিক একটা শক্তি হিসেবে বিশ্বরাজনীতিতে আবির্ভূত হচ্ছে। পর্যবেক্ষকদের ধারণা

নতুন বিশ্বব্যবস্থায় ইউরোপের উন্নয়নের দায়িত্বভার ইউরোপীয়দের হাতেই থেকে যাবে। এমনকি রাশিয়ার উন্নয়নেও এরা একটা গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। যার অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শুধু উত্তর আমেরিকা ও ল্যাতিন আমেরিকায় তার ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করে রাখবে। দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও ইউরোপ তথা যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা হবে সীমিত। এক্ষেত্রে এ অঞ্চলে জাপানের ও চীনের ভূমিকা বাড়বে। জাপান এখন বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি। বিভিন্ন দেশে জাপানি পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে জাপানের ভূমিকা বাড়ছে। জাপান নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতেও চায়। ফলে নয়া বিশ্বব্যবস্থায় জাপান হবে অন্যতম একটি শক্তি। অন্যদিকে চীন আগামি শতাব্দীর আগেই অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। তাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার এখন অনেক বেশি। উপরন্তু জনবলের কারণে চীন একটি শক্তি হিসেবেই গণ্য হবে। তবে বিশ্বরাজনীতিতে চীনের অভিজ্ঞতা কম। চীন যে ধ্রুপদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে থাকছে না, এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। চীনে যতদিন সেনাবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির পেছনে তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখবে, ততদিন পার্টি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে। সেনাবাহিনী সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে চীনের অবস্থা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মতোও হতে পারে। তবে চীন একটা উঠতি শক্তি। বিশ্বব্যবস্থায় তাকে অস্বীকার করা যাবে না। চীনের পরে আসে ভারতের প্রশ্নটি। ভারত এ অঞ্চলের অন্যতম আঞ্চলিক শক্তি। উপরন্তু ভারত পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। শিল্প উৎপাদনের দিক দিয়ে ভারতের অবস্থান সপ্তম। প্রযুক্তির দিক দিয়েও ভারত অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এক ধরনের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও রয়েছে সেখানে। ভারত আগামি দিনে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর উপর তার প্রভাব অব্যাহত রাখবে। ভারত নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদের জন্যও দাবি করছে। ভারতের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমিকা আগামিদিনে লক্ষ করার মতো। একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে যা যা দরকার দক্ষিণ আফ্রিকার সব রয়েছে। দীর্ঘদিন দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল বিশ্বরাজনীতিতে একরকম 'বহিস্কৃত'। এখন বর্ণবাদের সেখানে অবসান হয়েছে। এপ্রিল ('৯৪) সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ দেখিয়েছে। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা আগামি দিনে একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

জাতিসংঘের ভূমিকা

নতুন বিশ্বব্যবস্থায় জাতিসংঘের ভূমিকা এখন বিভিন্ন মহলে আলোচিত হচ্ছে। বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাতে করে জাতিসংঘের একটি গ্রহণযোগ্য ভূমিকা এখন আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। নতুন বিশ্বব্যবস্থার আলোকে জাতিসংঘের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, কিংবা বৃহৎশক্তির প্রভাব-বলয়ের বাইরে থেকে জাতিসংঘ তার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারবে কিনা, এ নিয়ে পর্যবেক্ষকদের মধ্যে রয়েছে সন্দেহের অবকাশ। পর্যবেক্ষকদের কারো কারো মতে, জাতিসংঘ দীর্ঘদিন যাবৎ বৃহৎশক্তির স্বার্থে, বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের অভিমত যেহেতু দুই বৃহৎশক্তির মাঝে আর কোনো দ্বন্দ্বের সুযোগ নেই, সেহেতু জাতিসংঘের জন্য নিরপেক্ষভাবে কাজ করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

সারণি : ৩৫

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ২০০টি এমএনসির (MNCs) ভূমিকা, ১৯৬০-১৯৮০

দেশ	সংখ্যা			বিক্রিয় পরিমাণ (বিলিয়ন ডলার)				বিক্রয় হার (শতকরা)	
	১৯৬০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৬০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৬০	১৯৭০	১৯৮০
যুক্তরাষ্ট্র	১২৭	১২৩	৯১	১৪৪.৬	৩১৩.৫	১০৮০.৪	৭২.৭	৬৬.০	৫০.১
পশ্চিম জার্মানি	২০	১৫	২১	১৩.৪	৩৪.৬	২০৯.০	৬.৮	৭.৩	৯.৭
যুক্তরাজ্য	২৪	১৭	১৬ ১/২ক	১৯.৬	৩৯.২	১৯৯.৫	৯.৯	৮.২	৯.২
ফ্রান্স	৭	১৩	১৫	৩.৫	১৯.৮	১৬১.০	১.৮	৪.২	৭.৫
জাপান	৫	১৩	২০	২.৯	২৮.১	১৫৫.২	১.৫	৫.৯	৭.২
হল্যান্ড	৩	৩	৫	৬.৪	১৫.০	৮৯.৬	৩.২	৩.২	৪.২
ইতালি	৩	৫	৪ ১/২ক	১.৯	৯.৬	৬৯.৫	০.৯	২.০	৩.২
কানাডা	৫	২	৫	২.৬	২.৪	৩২.৫	১.৩	০.৫	১.৫
সুইজারল্যান্ড	২	৪	৪	২.০	৬.৪	৩১.৯	১.০	১.৩	১.৫
বেলজিয়াম	১	১	২	০.৫	১.৩	১৪.৫	০.২	০.৩	০.৭
সুইডেন	১	১	২	০.৪	১.০	১১.০	-	০.২	০.৫
দক্ষিণ কোরিয়া	-	-	২	-	-	১০.০	-	-	০.৫
অন্যান্য	২	৩	১২	১.১	৪.৪	৯১.১	০.৫	০.৯	৪.২
মোট (যুক্তরাজ্য বাদে)	৭৩	৭৭	১০৯	৫৪.৪	১৬১.৭	১০৭৪.৮	২৭.৩	৩৪.০	৪৯.৯
সর্বমোট	২০০	২০০	২০০	১৯৯.০	৪৭৫.২	২১৫৫.২	১০০.০	১০০.০	১০০.০
বিশ্ব জিডিপি খ				১১২৬.২	২৪৮৯.০	৭৫৪৮.০			
বিশ্ব জিডিপির ২০০ এমএনসির অংশ				১৭.৭	১৯.১	২৮.৬			

ক : মালিকানা দুই দেশের এমএনসির মাঝে অর্ধেক ভাগ করে দেখানো হয়েছে

খ : জিডিপিতে সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে ধরা হয়নি।

সূত্র : Frederick F. Clairmonte and John H. Covanagh, Transnational Corporations and Global Market : Changing Power Relations, *Trade and Development*. 4, winter, 1982.

ইদানিংকালে জাতিসংঘের ভূমিকা আলোচিত হলেও অতীতেও জাতিসংঘের ভূমিকা কম বিতর্কের জন্ম দেয়নি। জাতিসংঘ উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থরক্ষা করতে পারছে না– এ ধরনের অভিযোগ তো হরহামেশাই শোনা গিয়েছিল। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে নয়া বিশ্বব্যবস্থায় জাতিসংঘের ভূমিকা হবে অনেক বড় ও ব্যাপক। বৃহৎশক্তির প্রভাব বলয়ের বাইরে যদি জাতিসংঘ না দাঁড়াতে পারে, তাহলে এই শতাব্দীতে জাতিসংঘ অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন হবে।

উপসংহার

অধ্যাপক হানটিংটন 'সভ্যতার সংকট'-এর কথা বলেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব সেই 'সংকট' প্রত্যক্ষ করেছে। সারা বিশ্বব্যাপীই একটা মুসলমান বিরোধী প্রচারণা লক্ষ্য করা গেছে। একুশ শতকের প্রথম দশকে এসেও সেই 'সংকট'-এর খুব যে একটা সমাধান হয়েছে, তা বলা যাবে না। ইরাক তথা আফগান সমস্যার সমাধান হয়নি। বিশ্বায়নের কারণে খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে বিশ্ব। আদর্শিক দ্বন্দ্বের বদলে এখন স্থান পাবে বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব। বিশ্বায়নের নামে একটি নতুন ধরনের 'উপনিবেশবাদ'-এর জন্ম হচ্ছে, যেখানে রাষ্ট্রের বদলে এখন স্থান করে নিয়েছে পুঁজি। রাষ্ট্রের তথাকথিত সার্বভৌমত্বের ধারণা খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক জোট ও মুক্তবাজারের নামে এক ধরনের অর্থনৈতিক আধিপত্য চেপে বসছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর। এই যে নয়া বিশ্বব্যবস্থা, এই নয়া বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ এবং সেই সাথে IGO (International Government Organizations) ও INGO'র (International Nongovernment Organization) ভূমিকা হবে অনেক বড়। MNC-দের (Multinational Corporation) ভূমিকাও হবে বিস্তৃত। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো এই IGO, INGO কিংবা MNC'র 'চাপিয়ে দেয়া' নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং তাদের মতামত নিয়েই জাতীয় নীতি প্রণয়ন করবে। আর এভাবেই সৃষ্টি হবে নতুন এক ধরনের 'সংকট', যা কিনা অধ্যাপক হানটিংটন তার 'থিসিসে' উল্লেখ করেননি।

খুব দ্রুত বিশ্ব বদলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই সনাতন ধারণা আর থাকছে না। আদর্শিক দ্বন্দ্বের কারণেই স্নায়ুযুদ্ধের জন্ম হয়েছিল। নয়া বিশ্বব্যবস্থায় নয়া পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে আবারও স্নায়ুযুদ্ধের জন্ম হতে পারে। তবে নিঃসন্দেহে এর পরিপ্রেক্ষিত হবে ভিন্ন।

সহায়ক গ্রন্থ

১. তারেক শামসুর রেহমান, 'ইরাক যুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনীতি', ঢাকা, ২০০৪

২. Global Terrorism 'Genesis, Implications, Remedial and Countermeasures'. Published by Institute of Regional Studies, Islamabad, 2005.